উত্তম পুরুষ

রশীদ করীম

উত্তম পুরুষ

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬১

উৎসর্গ

কথাশিল্পী আবু রুশ্‌দ ও
কবি আবুল হোসেনকে

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'উত্তম পুরুষ' পুস্তক আকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে এবং আশা করি এ-কথা বলা অতিশয়োক্তি হবে না যে উপন্যাসটি পাঠক-পাঠিকা ও সমালোচকদের কাছে আশাতীত সমাদর লাভ করে।

'উত্তম পুরুষ'-এর প্রথম প্রকাশের সময় এখনকার যেসব পাঠক-পাঠিকা জন্মগ্রহণও করেন নি, বা করে থাকলেও যাঁদের বর্ণ-পরিচয়ও হয় নি, বা হয়ে থাকলেও যাঁদের গল্প-উপন্যাস ও কবিতা পাঠের বয়স হয় নি, তাঁদের অনেককেই কোনো কোনো উপলক্ষে হঠাৎ এই প্রশ্ন করতে শুনি : 'উত্তম পুরুষ' সম্পর্কে এতো শুনেছি, কতো বইয়ের দোকানে খুঁজেছি, কিন্তু কোথাও দেখি না কেন?

প্রশ্নটা তাঁরা করতেই পারেন। কারণ প্রথম মুদ্রণগুলো দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যাবার পর, প্রায় পনেরো বছর হতে চললো, উপন্যাসটি আর পুনর্মুদ্রিত হয় নি। আজকেব পাঠক-পাঠিকাদের এই বিশেষ কৌতূহলের একটি কারণ বোধ করি এই যে, উপন্যাসটি ১৯৬১ সালে 'আদমজী পুরস্কার'ও লাভ করে। এই সুদীর্ঘকাল পর 'মুক্তধারা'-র উদ্যোগে বইটি আবার আজকের পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমিও আবার সেই দিনের আনন্দ লাভ করছি।

একটি কথা বোধ হয় বলা দরকার। ইংরেজিতে যাকে বলে পিরিয়ড-নভেল 'উত্তম পুরুষ' হচ্ছে তাই। একটি বিশেষ সময়কে এই উপন্যাসে ধরে রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সময় স্থির হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না, তবু বইয়ের পাতায় থাকে।

রশীদ করীম

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

এবারো দীর্ঘকাল পর 'উত্তম পুরুষ' আবার প্রকাশিত হলো বিউটি বুক হাউসের প্রতিষ্ঠাতা হামিদুল ইসলাম-এর আন্তরিক প্রচেষ্টায়। আজকের পাঠকদের কাছেও বইটি আগের মতোই সমাদৃত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

রশীদ করীম

আমি সবসময়েই উত্তম পুরুষ। কিন্তু কাহিনীকার স্বয়ং যখন 'আমি'—তখন তাঁকে অধমও হতে হয়। তা না হলে হয়তো তাঁর নিজের মর্যাদা থাকে, কিন্তু সত্যের থাকে না।

একজন উত্তম পুরুষ প্রথম বচনে এই কাহিনী লিখছেন। উপন্যাসের আঙ্গিক হিসেবে এই কৌশলটি অভিনব বা মৌলিক নয়—এমনকি বাংলা সাহিত্যেও নয়। শুরুতেই বলে রাখা ভালো, সাধারণত গল্পের 'আমি' পাঠক-মনে যে আদর্শ পুরুষের ছবি তুলে ধরে, বর্তমান আমি সে ধারণা অনুসারে খাটো।

আমি আদর্শ পুরুষ নই। আদর্শ পুরুষের জীবন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সবটুকুই এক নিরবচ্ছিন্ন সূত্রে গাঁথা। সবটাই চির পরিচিত রেলগাড়ির লাইন; কোন স্টেশনে গাড়ি কতক্ষণ দাঁড়াবে তাও আগে থেকেই জানা। কোথাও অপ্রত্যাশিত বিস্ময় বা অজ্ঞতার চমক নেই। সুতরাং আমি আদর্শ পুরুষ নই। চরিত্র যথেষ্ট বলীয়ান নয় বলেও বটে, মনের স্বাভাবিক প্রবণতাও কিছুটা অন্যদিকে প্রবহমান বলেও বটে।

আমি লোকটি মোটের ওপর নিরিবিলি একাকী থাকতে ভালোবাসি। আড্ডা বা উত্তেজনা যে আমার রুচির খেলাফ তা নয়, এমনকি সৎসঙ্গেও আমার অরুচি নেই। বরঞ্চ গুটিকয়েক অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সন্ধ্যার অলস মুহূর্তগুলোকে চা আর সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে ফুঁকে দেওয়া আমার জীবনের একটা বড় বিলাস। কিন্তু এই ভালোলাগাটুকু প্রাকৃতিক নিয়মের মতো অলঙ্ঘ্য বা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার নয়। এই ভালোলাগাটুকু একান্তভাবেই আমার নিজের মর্জির ওপর নির্ভরশীল।

পূর্ব সন্ধ্যায় যে-লোকটি আমার অতি প্রিয় ছিল, হয়তো পরদিন সকালে তারই সঙ্গ আমাকে পীড়া দেয়। তার চলন-বলন আমার স্নায়ুর ওপর জুলুম করতে থাকে।

অথচ বিনয়ী ও সামাজিক প্রকৃতির বলে আমার একটা খ্যাতি আছে। লোকটাও আমি, দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও, এমন আর মন্দ কি!

এই সংসারে এক শ্রেণীর লোক আছেন। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-পরিজন সম্বন্ধে তাঁরা তাঁদের সত্য ধারণাটা মনের চারিটি দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ রাখেন না। এমনকি ধারণাটা অপ্রিয় হলেও নয়। এই লোকগুলোকে কেউ বলে দুর্মুখ, কেউ বলে সৎসাহসী। আমি তাঁদের দলে নই। মতামত বস্তুটিকে বিস্ফোরক পদার্থের মতোই সাবধানে সঙ্গোপনে সন্তর্পণে রাখি।

নতুন জুতোর কামড় খেয়ে এরা মুখব্যাদান করেন। আমার মুখের সৌম্য ভাবটুকু অবিকৃত থাকে। বোধ করি এইখানেই ভব্যজীবনের ট্রাজেডি।

যাকে বলে আত্মকেন্দ্রিক, আমি সেই বহু নিন্দিত জীব। সমাজে যদি চলাফেরা করি তো সে পরার্থপরতায় অনুপ্রাণিত হয়ে নয়; বরঞ্চ নিজেরই কোনো প্রয়োজন, সঙ্গের বা অন্য কিছুর, পূরণের জন্য। বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য সুখী হওয়া, এই আমার জীবনাদর্শ। যদি কখনো কারো উপকার করি—পারতপক্ষে করি না—তো সে গ্রহীতা উপকৃত হবে বলে নয়, দাতা স্বয়ং এক সূক্ষ্ম অনির্বচনীয় সুখলাভ করে বলে। এখানে আমি নিজেকে আর দশজনের মতো ফাঁকি দিই না।

কোনো বন্ধু ঋণপ্রার্থী হলে তৎক্ষণাৎ তাঁকে বাধিত করি, নিতান্ত অনন্যোপায় হয়েই করি। উসুলের জন্য তাগাদা দিই না। কারণ আমি দেখেছি, বন্ধু-বান্ধব যখন ঋণ পরিশোধ করে, তখন আরো মোটা অঙ্কের ঋণের পথ প্রশস্ত করবার জন্যই করে। আমি এই পথটুকু রুখে দাঁড়াতে চাই।

ঋণী বন্ধু হয়তো দামি আসনে বসে সিনেমা দেখছেন। দীর্ঘকাল পর তাঁর সঙ্গে এই সাক্ষাৎ। অপ্রত্যাশিত, এবং বলা বাহুল্য, অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে আমাকে দেখে চকিতে তাঁর মুখভাবের যে পরিবর্তন ঘটে, আমার পোড়া চোখে তা বড়ই দর্শনীয় মনে হয়। আমি সজ্জনের মতো অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিই না, বরঞ্চ তাঁরই কাছাকাছি আলগোছে দাঁড়িয়ে থাকি। বন্ধুর বিব্রত ভাব দেখে আমার মনের মধ্যে এক প্রকার রস সঞ্চারিত হয়। এ রসকে কিছুতেই বীর-রস বলা চলে না। তবু এতেও আমার অরুচি নেই।

আত্মপরিচয় হিসেবে এই পূর্বলেখটুকু অসম্পূর্ণ। পরের পৃষ্ঠাগুলোতে যে কাহিনীর ক্রমবিকাশ হবে, সেখানে পরিচয়ের পরিপূরক থাকবে। হয়তো তবু পরিচয় সম্পূর্ণ হবে না!

কোনো ব্যক্তিকেই পুরোপুরি জানা বা বোঝা যায় না।

দুই

কাহিনীতে পরের কথা আগে, এবং আগের কথা পরেও বলা হবে। এটাকে রচনার আদর্শ বলা যায় না। কিন্তু সব লেখকই তাঁর নিজস্ব রচনারীতির সীমাবদ্ধতার মধ্যে বন্দি। তিনি নিজের মতো করে নিজের কথাটি বলতে পারলেই নিজের মনের মতো করে বলতে পারেন। তা সত্ত্বেও যদি রচনা পাঠকের মনের মতো না হয়, তাহলে এই প্রমাণিত হয়, অন্যভাবে লিখলে তা আরো অমনোনীত হতো।

গল্প পড়তে বসে পাঠকের একটাই গরজ থাকে। তিনি গল্পই পড়তে চান। তাঁর কাছে বহু কথাই বাহুল্য, বহু ঘটনাই অনাবশ্যক মনে হয়। মূল গল্পাংশের দিকে লেখক কিভাবে অগ্রসর হন, বিজ্ঞ পাঠকের কাছে সেই ভঙ্গিটুকু সুপরিচিত। তাই বহু পাঠকই কাহিনীর প্রথম পৃষ্ঠাগুলোর ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেন। তারপর ঝাঁপ দেন একেবারে কাহিনী সরোবরের মাঝখানে।

লেখক কেবল লেখকই নন। তিনি পাঠকও। তাই পাঠকের রুচি-অরুচির কথা তিনি জানেন। গল্পের মধ্যগগনে পৌঁছবার জন্য যে সোপানগুলো অতিক্রম করতে হয় সেগুলো যদি-বা ক্লান্তিকর হয়, তবু অপরিহার্য।

পূর্ণচন্দ্রের যে-রূপ তা ধীরে ধীরেই গড়ে ওঠে। সাহিত্য-রসের পূর্ণিমাও সেইভাবেই সৃষ্টি হয়। সাহিত্যের প্রথমা আর দ্বিতীয়াও বৈশিষ্ট্যহীন নয়। তারো একান্ত নিজস্ব একটি রূপ আছে।

এই কাহিনীতে অনেক কথা আছে, যা সোজা গল্পাংশের দিকে এগিয়ে যায় না; দক্ষিণে-

বামে বিপথগামী হয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে অযথা বিলম্ব করে দেয়।

এর একটি মাত্র কৈফিয়ত আছে।

মানব জীবনের ঘটনাপ্রবাহ একটানাভাবে একটি গল্পই বলে না। তার সব ঘটনাই একটি মাত্র গল্পের বিভিন্ন স্তম্ভ নয়।

গল্প বলাই গল্পলেখকের একমাত্র কাজ নয়। তাঁকে কিছু কিছু জীবনের কথাও বলতে হয়।

তিন

বালীগঞ্জ ময়দানে ফুটবল ম্যাচ ছিল : পার্ক ইউনাইটেড ক্লাব বনাম রেইনবো ক্লাব। রেইনবো ক্লাব বালীগঞ্জ পাড়ার ছেলেদের দল আর পার্ক ইউনাইটেড ক্লাব পার্ক সার্কাস পাড়ার। কণিকা মেমোরিয়াল কাপ টুর্নামেন্টের সেমি-ফাইনাল খেলা।

টুর্নামেন্টে প্রবেশের একটা শর্ত, খেলোয়াড়দের উচ্চতা চার ফুট দশ ইঞ্চির বেশি হলে চলবে না। সিদ্ধ দৈর্ঘ্যের চাইতে আমি ইঞ্চি দেড়েক লম্বা ছিলাম। তবু ক্লাব কর্তৃপক্ষ নাছোড়বান্দা, আমাকে খেলতেই হবে, 'লেফট-ইনে' দলের স্টার খেলোয়াড়।

সরল পাঠকের মনে হতে পারে এটা কি করে সম্ভব? আমার দৈর্ঘ্য থেকে রাতারাতি দেড় ইঞ্চি প্রমাণ বাহুল্যটুকু ছেঁটে ফেলা কি করে সম্ভব? কিন্তু যাঁরা ফুটবল খেলেন তাঁদের কাছে এ বাঁ-হাতের খেলা। অবশ্য যে খেলোয়াড়ের ওপর হঠাৎ শরীর সংস্কার করবার আদেশ জারি হয়, তার নাজেহালের সীমা থাকে না। আমার দুর্ভোগটাই কি কিছু কম হয়েছিল।

দৈর্ঘ্য-সঙ্কোচের জন্য আমাদের জানা এক অভিনব কৌশল ছিল, শক্ত করে কোমরে দড়ি বাঁধা। আমাকেও এতো শক্ত করে কোমরে দড়ি বাঁধতে হয়েছিল যে, কোমরের চারপাশে প্রায় ইঞ্চিখানেক গর্ত হয়ে গিয়েছিল। ফলে শারীরিক পরিধির সঙ্কোচ কেবল দৈর্ঘ্যেই নয়, প্রস্থেও সাধিত হয়েছিল।

আমি ছিলাম রেইনবো ক্লাবের 'লেফট-ইন'—দলের একমাত্র মুসলমান খেলোয়াড়। সেদিন বৃষ্টির পর মাঠ ছিল ভেজা। ভেজা মাঠে বরাবরই আমার খেলা যায় খুলে। অথচ খেলা শুরু হবার পনের মিনিটের মধ্যেই পার্ক ইউনাইটেড ক্লাব দুটি গোল দিয়ে দিল। খেলা শেষ হবার পনের মিনিট আগে পর্যন্ত তারা দুটি গোলে এগিয়ে থাকল। দুটি গোলই দিল মুশতাক।

এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের খেলা দেখবার জন্য সেদিন মাঠে অবিশ্বাস্য রকম ভিড়। রেইনবো ক্লাব দু'গোলে হারছে, বালীগঞ্জের ছেলেদের মুখে চুন। খেলা শেষ হতে পনের মিনিট মাত্র বাকি। পার্ক ইউনাইটেডের মুশতাকের খেলা দেখে সবাই চমৎকৃত। এমনকি প্রতিপক্ষ দলের সমর্থকরাও হতবুদ্ধি।

সুন্দর ছিপছিপে ফর্সা ছেলে; পায়ে বুট, হাঁটুতে 'নি-কাপ', পরনে কালো রঙের ফুটবলপ্যান্ট, গায়ে সাদা-লাল জার্সি! মাথায় ঝাঁকড়া চুল কখনো কপালের ওপর নেবে আসছে, কখনো মাথার এক ঝাঁকানিতে আবার পেছনে সরে যাচ্ছে। লিকলিকে পা দিয়ে বল নিয়ে আসার ভঙ্গিটাও অপূর্ব। মাঠসুদ্ধ লোক তাকেই দেখছে, তারই খেলা দেখছে।

এমন সময় ঝমঝম করে বৃষ্টি নাবল। আশেপাশেই কোথায় যেন বাজ পড়ল। দর্শকদের উত্তেজনা গেল আরো বেড়ে।

আমি এ পর্যন্ত কিছুই করতে পারি নি। আমার দল দু'গোলে হারছে। সেদিন যে আমার কি

হয়েছিল আল্লাহ্‌ই জানে। পায়ের ফাঁক দিয়ে বলা যায় গলে, পায়ে পা যায় জড়িয়ে, কখনো যদি বল ধরতে পারি তো পরক্ষণেই প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড় নেয় কেড়ে। আমি যেন খেলছি না, মুশতাকের খেলা দেখছি।

এমন সময় এলো বৃষ্টি।

পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখে পুরলাম, সেকালে এই আমার একটি অভ্যাস ছিল। কুকুর যেভাবে দাঁত দিয়ে হাড় কামড়ে ধরে সেইভাবে রুমালটি দাঁতে চেপে বল পায়ে ছুটলাম। মাথাটি নিচু করে ছুট, ঠিক যেন ষাঁড়ের মতো। ডাইনে বাঁয়ে সম্মুখে পশ্চাতে কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ছুট। বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা ঢিল খাওয়া মৌমাছির মতো আমার পিছনে পিছনে ছুটে এলো। আমার দলের সমর্থকরাও উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল। গোলপোস্ট একদিকে আর আমি বল নিয়ে অন্ধের মতো ছুটছি আর একদিকে। বল নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে বিপক্ষ দলের কর্নার লাইনের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালাম। বেশ বুঝতে পারছিলাম, সকলের নিশ্বাস তখন বন্ধ।

ডান পা দিয়ে বলটি থামালাম। একবার দেখলাম ধাবমান বিপক্ষ খেলোয়াড়রা তখন কোথায়। একবার ভালো করে দেখে নিলাম গোলপোস্টটা কোথায়। তারপর তবলচি যেভাবে তবলা ঠুকে ঠুকে দেখে সেইভাবে ডান পা দিয়ে বলটি টিপে টিপে দেখলাম।

কিন্তু এসবই এক নিমেষের মধ্যেই ঘটে গেল।

তারপর বাঁ পায়ের এক মার। জ্যা-মুক্ত শরের মতো বলটি পাঁচজন ছেলের মাথার ওপর দিয়ে পোস্টের মধ্যে গলে গেল।

এক গোল শোধ হলো।

খেলা শেষ হতে আর মাত্র মিনিট তিনেক বাকি।

তার পরের কাহিনী যেমন ক্ষিপ্র তেমনি সংক্ষিপ্ত।

আমি তখন অপ্রতিরোধ্য। আমি জানি প্রবল উত্তেজনায় আমার চোখমুখ ঘোলাটে হয়ে ওঠে। সেদিনও নিশ্চয়ই তাই হয়েছিল।

একটি ক্ষুদ্র চামড়ার বল ধরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ওপর যেন আমার মান-সম্মান, জীবন-মরণ সবকিছু নির্ভর করছে। ভিড়ের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে, অন্যের পায়ের ফাঁক দিয়ে বল গলিয়ে দিয়ে, কখন দৌড়ে, কখন থমকে দাঁড়িয়ে আমি পরপর আরো দুটি গোল দিয়ে দিলাম।

মাঠসুদ্ধ লোক বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে অবাক এবং কিছুটা মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমাদের খেলা দেখল।

শেষ গোলটির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের খেলাও শেষ হলো। এইবার আমি মুখ থেকে রুমাল বের করে পকেটে পুরলাম।

একবার মাত্র ঘাড় ফিরিয়ে মুশতাককে দেখলাম। ভাবভানা যেন এই, খেলা কাকে বলে দেখলে! তারপর ছুট।

বাঁধ-ভাঙা স্রোতের মতো ভিড়-ভাঙা লোক আমার পিছনে পিছনে ছুটে এলো; কিন্তু সবার আগে এলো মুশতাক।

শাবাশ! খুব খেলেছ। এমন না হলে খেলা।

মুশতাকের আব্বা সুপারিনটেনডিং ইঞ্জিনিয়ার। বেনিয়াপুকুর পাড়ার ক্রিমেটোরিয়াম রোডে সুন্দর একতলা বাড়ি। তাঁর নাম এহসান সাহেব। সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা। মুশতাকের বাড়ি এসে আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। এ বাড়ির সবকিছুই ছবির মতন। সাজনো-গোছানো বৈঠকখানা,

শোবার ঘর, খাবার ঘর।

মুশতাকের আম্মা একটা মোড়ার ওপর বসে উলের সোয়েটার বুনছিলেন। তার বুবু সেলিনা একটা লম্বা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দুই হাত তুলে খোঁপা বাঁধছিলেন। আমার এ কাহিনী রহস্য-উপন্যাস নয়; সুতরাং এখানেই এ কথা স্বীকার করলে লোকসান নেই যে, সেলিনার প্রসাধনের দৃশ্য আজও আমার চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

সে সময় মুশতাকের আব্বা বাড়ি ছিলেন না।

মুশতাক আমার অনিচ্ছুক দুটি পায়ের সমস্ত আপত্তিকে উপেক্ষা করে হাত ধরে টানতে টানতে সোজা খাবার ঘরে নিয়ে এলো।

—ছেলেটি কে রে?

—হাফেজ রশীদ।

দুষ্টুমিতে মুশতাকের চোখ নৃত্য করে উঠল।

—বেশ, বাবা বেশ। এই বয়সেই কোরআন শরীফ মুখস্থ করেছ। বলি তোরাও শেখ।...

মুশতাকের আম্মা আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন।

আমি কিন্তু হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। আমি হাফেজও নই, নামও রশীদ নয়। একি পরিহাস! প্রতিবাদ করে বললাম, আমি হাফেজ নই। নামও রশীদ নয়। আমার নাম শাকের।

মুশতাক তবু দমবার পাত্র নয়। সে আবার বললো, আম্মা তুমি যদি আজ শাকেরের খেলা দেখতে। কে বলবে হাফেজ রশীদ নয়।

—তাই না কি। তা তোদের খেলার হলো কি?

মুশতাক সেদিনকার খেলার পুরো ইতিহাস বলে গেল। বলা বাহুল্য, তার মহাকাব্যের নায়ক আমিই।

মুশতাকের ভক্তির আতিশয্য দেখে তার আম্মা আর বুবু হেসে ফেললেন। আমি সঙ্কুচিত হয়ে উঠলাম।

বস্তুত গোড়া থেকেই আমি অস্বস্তি বোধ করছিলাম। আমার কাদা-মাখা ছেঁড়া হাফ প্যান্ট, কোমরে বেল্টের বদলে দড়ি, নগ্ন পা, এলোমেলো রুক্ষ চুল, এ সবের জন্য বড়ই বিব্রত বোধ করছিলাম। কেমন করে যেন মনে হচ্ছিল, মহাকাব্যের নায়কের উপযোগী সাজ এ নয়। তাছাড়া এ বাড়ির পরিচ্ছন্ন পরিবেশে নিজেকে খাপছাড়া লাগছিল।

খাবার টেবিলের সামনে একটা চেয়ার টেনে যখন বসলাম, তখন একেবারে অকস্মাৎ একটা কথা আমার মনে হলো। আমরা বড় গরিব। এ কথাটি এভাবে আগে কখনো মনে হয় নি।

সচেতনভাবে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের বয়স সেটা নয়। কিন্তু আজ তো বুঝতে পারি। তাছাড়া সে বাড়ির সামগ্রিক প্রভাব আমার মনের মধ্যে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। মুশতাকের বাড়ির সুন্দর সচ্ছল পরিবেশের বিরুদ্ধে আমার সেই অপরিণত মন হঠাৎ বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসল। আমি গুম হয়ে বসে থাকলাম।

মুশতাক তার মনের স্বাভাবিক আনন্দের তাগিদে একটি করে ভোজ্যবস্তুগুলোর সদ্ব্যবহার শুরু করে দিয়েছিল। তালতলার লাড়ুয়া, মাখন-রুটি, নিউমার্কেটের চাকা চাকা পনির, কপির পকোড়া, জিলিপি, এইসব সামনে সাজিয়ে মুশতাকের আম্মা আমাদের নাস্তা করতে দিলেন।

এসবই অতি লোভনীয় বস্তু, তবু আমার হাত সরছিল না।

বুবু আর আম্মা এক সময় লক্ষ্য করলেন আমি কিছুই খাচ্ছি না। তাঁদের উপস্থিতিটাই তার কারণ অনুমান করে তাঁরা উঠে চলে গেলেন। যাবার আগে মুশতাকের আম্মা বললেন, বাবা

খাও। লজ্জা করো না।

মুশতাক মাত্র একবার তার তশতরি থেকে চোখ তুলে বললো, হ্যাঁ, খা খা। বলেই সে আবার আহারে মনোনিবেশ করল। আমিও কোনোমতে নাস্তা সারলাম। তারপর দু'বন্ধু উঠে পড়লাম।

মুশতাক আমাকে নিয়ে তার পড়বার ঘরে এলো। বসবার ঘরেই মুশতাকের পড়বার টেবিল। বই খাতা ইনস্ট্রুমেন্ট বক্স, কালার বক্স, ড্রইং বুক, একটা বড় এ্যাটলাস আর সুন্দর একটা লাল ফাউন্টেন পেন টেবিলের ওপর সাজানো ছিল। মুশতাক এরই মধ্যে তার খেলবার সাজ বদলে একটা লাল স্পোর্টস শার্ট আর সাদা প্যান্ট পরে নিয়েছে। তার চুল থেকে একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। গন্ধটি যেন সদ্য পরিচিত। একটু আগেই যেন কোথায় খুঁজে পেয়েছি আর একটু আগেই যেন কোথায় হারিয়ে এসেছি। মুশতাক তার পড়বার টেবিলে বসে এটা-সেটা দেখাতে লাগল। এরই মধ্যে আমাদের ভাব বেশ জমে গেছে। বন্ধুত্বের তাগিদটা মুশতাকের দিকেই প্রবল। কিন্তু এ কথাও সত্য, আমিও তার প্রতি বেশ একটা টান বোধ করতে লাগলাম।

আমরা দু'জনেই ক্লাস নাইনে পড়ি। মুশতাক পড়ে হেয়ার স্কুলে আর আমি তালতলার একটা অখ্যাত স্কুলে। একটু আগেই এই সত্যটি আবিষ্কার করে আমরা অবাক হয়ে গেছি।

কথায় কথায় বেশ রাত হয়ে গেছে, আমরা টের পাই নি। এক সময় মুশতাকের আম্মা এসে বললেন, ছেলেরা খাবে চলো। রাত ন'টা বাজে।

পিছনে কুর্তা-পাজামা পরা এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন। ফর্সা সুন্দর চেহারা, সুঠাম বলিষ্ঠ গড়ন। মুশতাকের আব্বা এহসান সাহেব কখন অফিস থেকে ফিরে এসেছেন, কাপড়-চোপড় ছেড়ে ঘরোয়া লেবাজ পরেছেন, আমরা কিছুই জানি না।

আমি বাড়ি যাব বলে উঠে দাঁড়ালাম।

মুশতাকের আম্মা কিন্তু বললেন, চললে কোথায়? এখানেই খেয়ে যাও।

মায়ের এই প্রস্তাবে মুশতাকও উৎসাহে সায় দিল।

এমন সময় একটা গম্ভীর গলার আওয়াজ ভেসে এলো।

—তোমার আব্বার নাম কি?

এহসান সাহেবের প্রশ্ন।

—সৈয়দ আবু নাসের।

—তিনি কি করেন?

—ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

এহসান সাহেব কি যেন ভাবলেন। তারপর আবার প্রশ্ন করলেন : তোমরা আগে কোমেদান বাগান লেনে থাকতে না?

—জি!

—তোমার আব্বা ডিপুটি—না সাব-ডিপুটি?

চোর ধরা পড়লে যেমন হতবুদ্ধি হয়ে যায়, আমি সেই রকম মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম! বস্তুত আমার আব্বা সাব-ডিপুটি কালেক্টর। কিন্তু সেই বয়সেই আমার এই এক তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে, আব্বার এই পরিচয়টা তেমন গৌরবের নয়। অন্য নিকট-আত্মীয়রা কেউ ডি-এম, কেউ ডিপুটি সেক্রেটারি। আমি দেখেছি, তাঁরা পর্যন্ত আব্বার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন না। এই রিশতাদের বাড়িতে যখন জেয়াফত থাকে, তাঁরা পরস্পর সহজে কথা বলে

যান, সেক্রেটারি আর কমিশনার সাহেবদের অন্দরমহলের কতো কাহিনী, অথচ আব্বার কেমন যেন নম্র বিব্রত অপদস্থ ভাবভঙ্গি, তাঁকে কেউ ভালো করে আমলই দিচ্ছে না। লগি দিয়ে পানি দেখে ডিঙি চালাবার মতো করে তিনি যদি সাবধানে সন্তর্পণে দুটি একটি কথা বলেন, অমনি অন্য পদস্থ ব্যক্তিদের বাক্যালাপ যায় বন্ধ হয়ে, তাঁরা কেমন যেন অবাক দৃষ্টিতে আব্বার দিকে তাকিয়ে থাকেন। সেই থেকে এই পদটাই আমার মনের সমস্ত ধিক্কারবোধের প্রতীক হয়ে আছে।

তাই এহসান সাহেবকে আমি বলতে পারি নি আমার আব্বা সাব-ডিপুটি, একটু বাড়িয়ে বলেছি, ডিপুটি। কিন্তু এইভাবে ধরা পড়ে গিয়ে আমি ঘামতে লাগলাম।

ঠিক সেই মুহূর্তে দুটি প্রখর চোখের দৃষ্টি আমার দিকে কঠিন প্রশ্ন-চিহ্নের মতো নির্মম প্রত্যাশায় উদ্যত হয়ে থাকল, সেলিনার চোখের ভ্রূকুটি। তাঁর ঠোঁটের কোণে প্রথমার চাঁদের মতো তির্যক হাসি।

আমি এহসান সাহেবের প্রশ্নের কোনো জবাব দিলাম না। খেতেও রাজি হলাম না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তাঁরাও আর বিশেষ পীড়াপীড়ি করলেন না।

সেলিনাই বললো, আম্মা জোর করো না। ওর বাড়িতে হয়তো ভাববে।

আমি আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলাম।

চার

সেদিন রাত্রে আমার ঘুম হয় নি। সারারাত কেন ছটফট করেছি, ঘুমই-বা হয় নি কেন, এতদিন বাদে তা ভালো করে মনে নেই।

তার পরদিন ছিল রবিবার, স্কুল ছিল না।

ইজি-চেয়ারে শুয়ে আমি পাঁচকড়ি দে-র 'মায়াবী' পড়ছি। বাম পাশের ভাঙা টেবিলটিতে কিছু নুন-মরিচ আর কতগুলো ডাঁসা পেয়ারা রাখা ছিল। এই পেয়ারা জিনিসটা আমাকে কিনতে হতো না, বাড়িতেই গাছ ছিল। মাঝে মাঝে পেয়ারায় কামড় দিচ্ছিলাম, আর ধীরে ধীরে বইয়ের পাতায় চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলাম। সেই বয়সে পেয়ারা আর গোয়েন্দা কাহিনীর দ্বিবিধ রসের মধ্যে কোনটার প্রতি লোলুপতা ছিল বেশি, তা-ও শপথ করে বলা যায় না। তবে রাস্তার পাশে জানালার ধারে বসে এই কর্মটি করতে আমাকে প্রায়ই দেখা যেত।

কখন মেঘ করে এসেছে, জোরে জোরে হাওয়া দিতে শুরু করেছে, একটু একটু করে বৃষ্টি পড়ছে আমি খেয়াল করি নি। হঠাৎ বাজ পড়ার শব্দে সংবিৎ ফিরে আসে। আর বই পড়তে ভালো লাগে না। এমনকি পেয়ারার মতো জিনিসেও আর স্বাদ পাই না। জানালার ভিতর দিয়ে দেখতে থাকি, ঝড় কিভাবে তাল গাছটির মাথা ঝাঁকানি দিচ্ছে। দেখি, আর অলসভাবে পা দোলাতে থাকি।

এমন সময় কপালের ওপর একটা স্পর্শ অনুভব করলাম।

চির পরিচিত স্পর্শ।

আমি চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকি।

—গল্প শুনবি?

—কি গল্প?

—তোর বাপ-দাদার গল্প।

নিজের বংশকাহিনী, এই আমার সবচাইতে প্রিয় গল্প। কতবার কতোরকম করে শুনেছি, তবু শেষ হয় না, ক্লান্তি আসে না। আগে শুনতাম দাদির মুখে, এখন বলেন আম্মা। সেই পুরাতন জামানার গল্প বলতে বলতে দাদির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত। দাদির মুখের ওপর অতীতকালের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার স্মৃতির আলোছায়া আনাগোনা করত।

হাত দুটো মাথার নিচে রেখে মাদুরের ওপর শুয়ে শুনতাম, কতক বুঝতাম, কিন্তু বেশির ভাগই বুঝতাম না। তবু সে গল্প রূপকথার মতোই রোমাঞ্চকর মনে হতো।

তেমনি রোমাঞ্চকর দাদির ইন্তেকাল।

ছেলেবেলার স্মৃতির সঙ্গে আমার কল্পনার রঙ আর লোকমুখের অতিভাষণ মেশালে ঘটনাটা এই রকম দাঁড়ায়।

ঈদের ছুটিতে আব্বা কলকাতা এসেছেন। চাঁদ-রাতে সারারাত জেগে দাদি রান্না করছেন : সেমাই, পোলাউ-কোর্মা কাবাব-পরোটা। বাড়ির কারো চোখে ঘুম নেই। ঈদের আগের রাতে কেই-বা ঘুমায়? ঘুম কি আসতে চায়? বছরের একটি দিন ঈদ, আবার আসবে সেই আসছে বছর। রান্নাঘরে কোর্মার খুসবু, চাটুর শব্দ, কাঠ-কয়লার ধোঁয়া, উনুনের দগদগে আগুন আর বাবুর্চির ময়দা পেশা, অন্যান্য ঘরে পাজামার ইজারবন, মাথার টুপি আর জুতার ফিতা সব ঠিকমতো আছে কি না তারই তদারক, বাড়ির বিভিন্ন লোকের এইসব বিভিন্ন কাজেই তো রাত কাবার হয়ে যায়। সময় কোথায়? বস্তুত উৎসবের দিনের চাইতে তার আগমন-প্রতীক্ষাতেই তো প্রধান আনন্দ।

দাদিও বাবুর্চিখানায় ব্যস্ত, তাঁরও মরবার ফুরসত নেই, দম নেবারও ফুরসত নেই, এমনই এক সঙ্কটাপন্ন অবস্থা।

সেইদিন সন্ধ্যার কথা।

দাদির সঙ্গে আমার বাজি। আমি বলেছি এবার ঊনত্রিশে রোজা। দাদি বলেছেন, তিরিশে।

—ঊনত্রিশে রোজা তো যা না, চাঁদ দেখে আয়।

কোমেদান বাগান লেনে আমাদের বাড়ির চারপাশে উঁচু উঁচু দালান, ভালো করে আকাশ দেখা যায় না।

আমরা পাড়ার সব ছেলেরা জড়ো হয়েছি তেত্রিশ নম্বরের ছাতে, সেখান থেকে আকাশের চারদিক দেখা যায়।

একটি বিশেষ দিকেই চাঁদ উঠবে, এই বৈজ্ঞানিক সত্যটিতে আমাদের অধীর শিশুমন কিছুতেই সায় দেয় না। চাঁদ যদি ফাঁকি দিয়ে অন্য কোন দিকে ওঠে। আমরা অস্থির হয়ে আকাশের চারদিকে চাঁদ হাতড়ে বেড়াই; কিন্তু কোথায় চাঁদ।

অধীর উদ্বিগ্ন, অসহ্য প্রতীক্ষা।

—ঐ যে চাঁদ!

একজন সোল্লাসে লাফিয়ে ওঠে।

—কৈ কোথায়?

দশজনের অধীর প্রশ্ন।

তারপর একজন দশজনকে দেখিয়ে দেয়, ঐ যে দুটো তালগাছ দেখা যাচ্ছে না, তার ফাঁক দিয়ে, ঐ যে মেঘ দেখা যাচ্ছে, তারই নিচে।

সুতার মতো এক ফালি চাঁদ।

ছেলেরা লাফ দিয়ে নিচে নেবে আসে। যে যার বাড়ির দিকে ছুটে।

আকাশটা একটু আগেই তারা তন্নতন্ন করে খুঁজেছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে দেখেছে; আকাশের বুকে কোথায় কখণ্ড মেঘ জমেছে, আকাশের গায়ে কোথায় কটা বাড়ি হেলান দিয়েছে, তাও তারা একটু আগেই সমস্বরে বলে দিতে পারত। কিন্তু এখন? আকাশের মানচিত্রে তাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

বুকের মধ্যে শীর্ণ অপূর্ণ চাঁদের টুকরোটিকে পুরে নিয়ে সবাই ছুটতে ছুটতে চললাম, যে যার বাড়ি। কে কতো আগে আনন্দের বার্তা পৌঁছে দিতে পারে তারই পাল্লা।

সবার আগে ছুটছিলাম আমি একেবারে অন্ধ হয়ে উর্ধ্বশ্বাসে। বাজি জিতবার আনন্দ ততটা নয়; ঈদের জন্য আরো একটি দিন অপেক্ষা করতে হবে না, সেই আনন্দই প্রধান। কিন্তু একেবারে দোরগোড়ায় এসে পাল্লায় পেছিয়ে পড়লাম! চৌকিতে ধাক্কা লেগে দু'গজ দূরে ছিটকে পড়লাম। চোখের ঠিক নিচে একটা পেরেকের অর্ধেকটা ঢুকে গেল। তারপরের কথা আমার কিছু জানা নেই। যা জানি, তা নিজের স্মৃতি মন্থন করা ফ্রেমের ছবি নয়, দশজনের মুখে শোনা রূপকথা।

তার চেহারাটা কতক এই রকম।

আমার চোখ দিয়ে যে পরিমাণ রক্ত ঝরতে লাগল, আব্বা-আম্মার চোখ দিয়ে সেই পরিমাণ অশ্রু। ডাক্তার এলো, মুখ ভার করলো। আব্বার উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি বারবার আম্মার ওপর এসে পড়ে। আম্মা বারবার আব্বার কাছে ভরসা চান। দাদার টুপিটা গেল ঈদে বড় ভাই মাথায় দিয়েছিলেন। এবারও তিনি পরবেন না মেজ ভাই পরবেন এ তর্কের কোনো মীমাংসাই হচ্ছিল না। এই দুর্ঘটনার পর তাঁদের তর্ক কোনো মীমাংসায় উপস্থিত না হয়েই শেষ হয়ে গেল।

কেবল দাদি নিজের মনে কাজ করে যান। ঈদের প্রস্তুতি ছাড়া অন্য কোনো দিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। এমনকি মুখে তাঁর হাসি, আশ্চর্য, দুর্জ্ঞেয়, অনির্বচনীয় সে হাসি।

এক সময় রান্নাঘর থেকে দাদি ডাক দেন, দুলহীন বিবি, এদিকে এসো, কাজ আছে।

কোলের ছেলে নাবিয়ে আম্মা কাজ করতে যান। তাঁর মনের অবস্থা যাই হোক, এই আহ্বান অপ্রতিরোধ্য। মন্থর পদে তিনি রান্নাঘরে এগিয়ে আসেন। নিরুদ্ধ অভিমানের প্রতিমূর্তির মতো একটি কোণে বসে থাকেন।

আঁচল দিয়ে কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছে ফেলে, কাজের ফাঁকে দাদি একবার আম্মার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর একটু হাসলেন।

তারপর দুই হাত দিয়ে আম্মাকে ছোট মেয়েটির মতো কোলে টেনে নিলেন। "আমার বয়স যখন সাত তখন থেকে এক বেলার নামাজও আমি কামাই করি নি। একবারও কাজা করি নি। আমার সমস্ত এবাদতের বদলে আমি তোমার ছেলের হায়াত চেয়ে নিয়েছি। দেখবে সে কাল ঈদ করবে।"

দাদি রাত দুটো পর্যন্ত রান্নাঘরেই থাকলেন। তারপর গোসল আর অজু করে এসে জায়নামাজে বসলেন।

পরদিন সকালে জরির টুপি, চুড়িদার পাজামা আর রঙিন শেরওয়ানি পরে আমি ঈদের নামাজ পড়ে এলাম। সঙ্গে আব্বা, চাচাজান আর ভাইজানরা।

লাল জায়নামাজে বসে দাদি তখনো তসবিহ পড়ছিলেন। আমাদের দেখে ইশারা করে কাছে ডাকলেন। আব্বা, চাচাজান আর ভাইভানদের সঙ্গে আমিও দাদিকে কদমবুসি করলাম।

দাদি দোয়া পড়ে আমার কাটা ঘায়ের ওপর ফুঁ দিলেন। জায়নামাজের তিন দিকে সেমাই-

ফিরনি, গোস্ত-রুটি সব সাজানো ছিল।

দাদি আমাদের খেতে দিলেন।

শীর্ণ হাতে তসবিহ নড়ছিল; কিন্তু দন্তহীন মুখের হাসি তেমনি অপরিম্লান। 'বল তো ভাইয়া, সেমাইটা কেমন হয়েছে?'

কিন্তু উত্তর শুনবার জন্য দাদি অপেক্ষা করলেন না। তাঁর হাতের তসবিহ পড়ে গেল। মাথা বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ল। সব শেষ!

আম্মা থামলেন। উঠতে যাবেন, আমি আঁচল চেপে ধরলাম।

'ছাড়ু ছাড়ু। তিনটে বাজে। এখুনি কলে পানি আসবে। উনুন ধরাতে হবে।'

গত রাত্রে যে গ্লানি বোধ করছিলাম কেমন করে যেন তা দূর হয়ে গেল।

পাঁচ

দাদির ইন্তেকালের কাহিনী বাস্তবক্ষেত্রে হয়তো ঠিক এমনটিই ছিল না। হয়তো দাদি ঈদের দিন ইন্তেকাল করেছিলেন আর আমি ঠিক তার আগের দিন জখম হয়েছিলাম, কেবল এইটুকুই সত্য। বাকিটা ভক্ত হৃদয়ের কল্পনাবিলাস, অথবা কতগুলো পরস্পর সম্পর্কহীন ঘটনাকে এক অলৌকিক পরম্পরাসূত্রে গেঁথে তুলবার সেই সুপরিচিত দুর্বলতা মাত্র।

কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে মানুষের বিশ্বাস আর ভক্তি যুক্তির সমস্ত আপত্তিই উপেক্ষা করে সেখানে কত অলৌকিক কাহিনীই আমাদের শুনতে হয়।

কাহিনী হিসেবে এটাই-বা এমন মন্দ কি।

ছয়

তারও পরের দিন। সোমবার—সকালবেলা।

স্কুলে যাব, সবেমাত্র ভাত খেয়ে উঠেছি। ছেঁড়া মাদুরের ওপর রাখা রেকাবিতে তখনো পুঁই শাক, কুমড়ো ভাজি আর চিংড়ি মাছের তরকারি রাখা আছে। ঘরের চারদিকে ময়লা। দরজার কাছে বিড়াল নোংরা করে রেখেছে। ছেঁড়া মাদুরের দু'একটি আলগা বেত, আর জীর্ণ বালিশের খণ্ড খণ্ড তুলা আর বিচি ঘরের চারদিকে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। আম্মার পরনে দু'দিনের ময়লা শাড়ি।

এমন সময় বলা নেই কওয়া নেই, মুশতাক হাজির। এই পরিবেশে মুশতাকের আগমন দেখে আমার মনে আবার সেই পুরাতন গ্লানিবোধ ফিরে এলো।

বাইরে একটি মোটর গাড়ির হর্ন শব্দ করল। মুশতাক তাড়াতাড়ি বললো :

—চল চল। বুবু এখুনি রেগে উঠবে। তোকে তালতলায় আর আমাকে হেয়ার স্কুলে নাবিয়ে বুবু গাড়ি নিয়ে কলেজ যাবে।

আম্মা নিচু হয়ে এঁটো বাসন তুলছিলেন। তিনি জিগ্যেস করলেন :

ছেলেটি কে?

—আমার বন্ধু মুশতাক।

আমার ভারি ইচ্ছে করতে লাগল, আম্মা মুশতাককে কিছু খেতে দিন—যেভাবে মুশতাকের আম্মা আমাকে খেতে দিয়েছিলেন।

এবার সোজা আম্মাকে উদ্দেশ করে মুশতাক বললো :

—চাচি আমাদের বাড়ি বেড়াতে আসবেন। আম্মা আপনাকে বলতে বলে দিয়েছেন।

কেমন দিব্যি চাচি বলে ডাকল। একেবারে অবলীলায়। এতটুকু বাধল না। পরে অবশ্য জেনেছিলাম, মুশতাক সত্য বলে নি। অর্থাৎ তার আম্মা আমার আম্মাকে আমন্ত্রণ জানান নি। সে কথা তুললে মুশতাক হেসে জবাব দিয়েছিল :

—তুই বড্ড বোকা। দরকারমতো ওরকম দু'-একটা কথা বানিয়ে বলতে হয়।

পরে অবশ্য ওসব কথা আমিও বানিয়ে বলেছি, আর চাচি ডাকও গলায় বাধে নি; কিন্তু সেদিন ভারি অবাক হয়েছিলাম।

মুশতাক ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে আমার হাত ধরে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এলো। বাইরে এসে দেখি, সেলিনা গাড়ির এক কোণে চুপ করে গম্ভীর হয়ে বসে আছে। মুশতাককে দেখে বিরক্ত কণ্ঠে বললো :

—যেখানেই যাও, দেরি কর।

মুশতাক সে কথার কোনো জবাবই দিল না। আমি কিছুতেই গাড়ির পিছনে বসতে রাজি হই না। ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসলাম।

গাড়ি ছেড়ে দিল। কারো মুখে কোনো কথা নেই। এক সময় সেলিনাই নীরবতা ভাঙল। প্রশ্ন করল :

এই বুঝি তোমাদের বাড়ি?

আমি কোনো জবাব দিই না।

—আর ঐ যে, বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল—সে কে?

—আমার আম্মা।

—ওঃ সরি! আমি মনে করলাম কোনো ঝি বুঝি।

গাড়ি অলিগলি পার হয়ে এগিয়ে চলল। আমি দু' হাত শক্ত করে স্থির হয়ে বসে থাকলাম।

তারপর আর কেউ কোনো কথা বলে নি। সবচাইতে সঙ্কুচিত হয়ে বসেছিল মুশতাক। সে যেন এক আকস্মিক অপরাধের লজ্জায় শরবিদ্ধ হয়ে এক কোণে মাথা নত করে বসে থাকল।

মুশতাক বলে দিয়েছিল, ফিরবার পথেও সে আমাকে তুলে নেবে। ছুটির ঘণ্টার পর আমি যেন অপেক্ষা করি।

আমি কিন্তু অপেক্ষা করি নি। স্কুল ছুটি হবার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছি। সেই তিন মাইল পথ হাঁটতে হবে। যখন কোমেদান বাগান লেনে থাকতাম, তখন বেশি হাঁটতে হতো না। কিন্তু পার্ক-সার্কাসে উঠে আসার পর থেকে অনেকটা পথ হাঁটতে হয়। পার্ক-সার্কাসও নয়, পার্ক-সার্কাসের শেষ মাথা। বলতে গেলে বালীগঞ্জ। বলতে গেলে কেন, পোস্ট অফিস তো বালীগঞ্জই। বাড়িটাও বিড়লার বাড়ির একেবারে কাছাকাছি।

হাঁটতে অবশ্য আমার মন্দ লাগে না, তা বৃষ্টিই হোক, ঝড়ই হোক, আর রোদই হোক। বরং খুব ভালো লাগে। কিন্তু ছুটির পর আজকাল বড় খিদে পায়। সেই কোন্ সকালে খেয়ে আসি, তারপর পেটে আর কিছু পড়ে না। তাই এতোটা পথ হেঁটে যেতে বড় কষ্ট হয়।

মৌলালির মোড়, তারপর জোড়া-গির্জা, বেনিয়া পুকুরের মোড়, তারপর সাহেবদের গোরস্তান, যেখানে কবি মধুসূদনের সমাধি। তারপর বাঁ দিকে পার্ক শো হাউজ ফেলে পার্ক-

সার্কাস ময়দান পেরিয়ে ডান দিকে ঘুরলেই সৈয়দ আমির আলী এভিনিউ। আবার বাঁ দিকে ছাকুমিয়ার হোটেল আর ডান দিকে মডার্ন স্টোরস্ রেখে আরো এগিয়ে যেতে হয়। এবার ডান দিকে মোড় ফিরলেই আমাদের রাস্তা—মোড়ের ওপর একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ।

এতটা পথ হেঁটে আসতে সময় লাগে অনেক। ক্লান্তিতে পা আর উঠতে চায় না। তবু ভালো লাগে।

কলকাতার রাস্তা। ঘড়ঘড় করে ট্রাম চলে যায়, কন্ডাক্টর ঘণ্টা দিতে থাকে। দু'-একটা ভিস্তিও চোখে পড়ে—চামড়ার ব্যাগ পিঠে ফেলে অনেকটা যেন ব্যাঙের মতোই লাফাতে লাফাতে নিজ মনে চলেছে, রিকশা এগোয় ঠুনঠুন করে। পিচের রাস্তা গরমে গলতে থাকে। ফুটপাতের দু'ধারে কাটা শশা, তরমুজ আর রঙ-বেরঙের শরবত বিক্রি হয়। টেলিগ্রাফের তারে বসে কাক ঝুলতে থাকে। রাস্তার দু'পাশে দেয়ালের গায়ে অসংখ্য সিনেমার বিজ্ঞাপন। 'কমিট নো নুইসেন্স'। হঠাৎ রাস্তার মোড়ের কোনো সস্তা হোটেল থেকে ভেসে আসে শিক-কাবাবের গন্ধ। ঘোড়ার গাড়ি, গরুর গাড়ি, ঠ্যালা গাড়ি, মোটর গাড়ি, বাস, ট্রাক একটার পর একটা—কোনোটা মন্থর, কোনোটা দ্রুতগতিতে চলতে থাকে।

জোড়া-গির্জার ঘড়িতে পৌনে পাঁচটা বাজে—বিকেলের ছায়া পড়ে। এইসব দেখি, আর ক্লান্ত পদে ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে এগিয়ে যাই। কোনো কোনোদিন, পা যখন আর উঠতে চায় না, একটা চলন্ত ফিটনের পিছনের পাদানিতে উঠে বসি। কোচোয়ান ব্যাটারা যেন কেমন করে টের পেয়ে যায়। পিছন দিকে সপাং সপাং করে যা জোরে চাবুক চালাতে থাকে—পিঠে পড়লে আর রক্ষে নেই!

একটি ক্লান্ত ক্ষুৎপিপাসাতুর স্কুল-বালক এইভাবে তার দীর্ঘ পথ হ্রস্ব করে নিতে চায়—অব্যবহৃত একটি আসনে বসে, এতে কার কি ক্ষতি, কিছুতেই বুঝতে পারতাম না! তাই গাড়োয়ান ব্যাটার ওপর আমার ভারি একটা রাগ হতো। কখনো কখনো অসহায় আক্রোশে দু'চোখ পানিতে টলমল করে উঠত।

এসব কোনো দুঃখই থাকতো না— আম্মা যদি রোজ এক আনা করে পয়সা দিতেন। পয়সা চাইলে আম্মা কোনোদিনই না করতেন না। কিন্তু কেমন করে যেন আমার মনে হতো, না চাইলেই বুঝি ভালো হয়।

স্কুলে টিফিনের সময় যা খিদে পায়। তেলে ভাজা, আলুর দম, পেঁয়াজ-মরিচ দিয়ে মাখা মুড়ি কত কি বিক্রি হয়। কত ছেলে কিনে তাই খায়।

আমি সে পাড়াই মাড়াই না।

টিফিনের সময় পানি-খাবার ঘরে গিয়ে ঢকঢক করে পানি খেয়ে নিই।

বাড়ি পৌঁছে বই-পত্তর জানালার তাকে রেখে, সোরাই থেকে পানি গড়িয়ে নিয়ে পেট ভরে নিতাম। রোদের মধ্যে অতটা পথ হাঁটার পর পিয়াসাও লাগত কম নয়।

তারপর দোতলায় এসে বারান্দায় শীতল পাটি বিছিয়ে শুয়ে পড়তাম। সামনের তালগাছগুলোর পাতা নড়ত—চেয়ে চেয়ে তাই দেখতাম।

আম্মা হয়তো কোনোদিন নাস্তা এনে দিতেন। কোনোদিন পারতেন না। যেদিন কিছু থাকত না, আম্মা বারান্দা দিয়ে যাবার সময় আমার দিকে আড় চোখে তাকিয়ে দেখতেন। আমার চোখে চোখ পড়তেই দ্রুত বেগে এগিয়ে যেতেন।

আমিও এমন ভাব করতাম যেন তাঁকে দেখি নি; আনমনে গাছের পাতা-নড়া দেখছি। মায়ে-পোয়ে এইভাবে ফাঁকি চলত।

সাত

অথচ এই স্কুলে ভর্তি হবার জন্যই আমার কি অস্থিরতা। আমি যখন স্কুলে ভর্তি হই তখন বেশ বয়স হয়েছে; কিন্তু আমার লেখাপড়ার দিকে স্বতন্ত্রভাবে কারো নজর পড়ে নি। প্রথম দুই ছেলের লেখাপড়া নিয়েই ভাবনাচিন্তা আর বোধ করি সামর্থ্যেরও সবটুকুই শেষ হয়েছে। আমি নেপথ্যে সকলের দৃষ্টির অগোচরে থেকে এক পা এক পা করে ক্লাস সিক্সের বইয়ের দোরগোড়া পর্যন্ত এগিয়ে এসেছি।

বড় ভাই একদিন আমার ইংরেজি রচনা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। খাতাটা টেবিলের ওপর পড়ে ছিল। অমন কত দিনই তো থাকে; কিন্তু সেদিন কি মনে হলো, তিনি খাতাটা খুলে দেখলেন। ইউনিভার্সিটি যাবার জন্য বড় ভাই তৈরি হচ্ছিলেন। আম্মাকে বললেন :

'শাকেরটা তো বেশ বড় হয়ে উঠেছে। ওকে এবার স্কুলে দিতে হয়।' কথাটা যে আম্মার আগে মনে হয় নি তা নয়। কিন্তু বড় দুই ছেলে কলেজ চলে যাবার পর বাড়িটা একেবারে খাঁ-খাঁ করে। তখন বড্ড একা আর অসহায় মনে হয়। আমি কাছে থাকি বলে দুপুরবেলাটা তা-ও কেটে যায়।

স্কুলের ছেলে বলে পরিচিত হবার জন্য আমাকে মাঝে মাঝে এক অস্থির আকুলতা পেয়ে বসত বটে; কিন্তু বাসায় থাকতেও মোটের ওপর মন্দ লাগত না। আম্মা কুলোতে করে কুল আর বড়ি রোদে দিতেন, হয়তো আচার তৈরি করাই উদ্দেশ্য। আমি অকাজে-অকারণে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতাম, আর রৌদ্রতাপিত কুলগুলো নিষিদ্ধ ফলের মতোই আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকত। প্রলুব্ধ মনকে শতভাবে শাসন করতাম; কিন্তু কুলগুলোও সংখ্যায় একটি করে কমতে থাকত। হয়তো তাই পরবর্তী জীবনে অনেক দুঃখকষ্ট পেতে হয়েছে।

আম্মা জবাব দিলেন :

—বেশ তো। তোমার আব্বা বড় দিনের ছুটিতে আসছেন। তোমরা সবাই মিলে যা ভালো মনে কর তাই হবে।

সেদিন খুব ভোরে আমার ঘুম ভেঙে যায়। আজ আমি স্কুলে ভর্তি হবো। সমবয়স্ক সব ছেলেই যখন স্কুলে যায়, তখন বাড়িতে বসে থাকতেই-বা কেমন লাগে। পাশের বাড়ি থেকেই মফিজ স্কুলে যায়, তাকে আমার চোখে ভারি কাজের ছেলে বলে মনে হয়।

রোজ সকাল সাড়ে ন'টার সময় ফটকের সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকা আমার চাই-ই, কোনোদিন এর কামাই নেই। এই সময়টায় স্কুলের ছেলেরা দল বেঁধে স্কুলে যেত। বেশ লাগত। কেউ পান চিবোতে থাকে, কেউ বিড়ি ফোঁকে। কেউ-বা জুতো দিয়ে পাথরে ঠোকর মারতে মারতে অগ্রসর হয়। কারো-বা নগ্ন পা। অনেকে আবার পথের পাশ দিয়ে মাথা হেঁট করে আনমনে চলতে থাকে। কেউ-বা পথের ঠিক মাঝ দিয়ে কলরব করে এগুতে থাকে।

ঐটুকুন ছেলেদের মুখে বিড়ি দেখে আমার সারাটা গা কেমন শিরশির করে উঠত। আমি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় বারবার পিছনের দিকে দেখতাম। অভিভাবকরা কেউ দেখেছেন কিনা। অপরাধটা যেন আমারই।

কিন্তু মোটের ওপর এই স্কুলযাত্রী ছেলেদের শোভাযাত্রা দেখাই ছিল আমার জীবনের সবচাইতে বড় আনন্দ।

আরো একবার ফটকের সামনে এসে দাঁড়াতাম। বিকেল সাড়ে চারটার সময়। এইটে ছেলেদের বাড়ি ফেরার সময়। স্কুলটিও কাছেই। অনেক দিন ছুটির ঘণ্টাও শুনতে পেতাম। এই আওয়াজটা কানে এমন মধুর হয়েই বাজত। যেখানেই থাকি না কেন এই সময়টায়

কোনো প্রলোভনই আমাকে ঘরে বেঁধে রাখতে পারত না।

স্কুলে যাবার সময় তবু ছেলেদের একটা সংযত সুশৃঙ্খল ভাব থাকে; কিন্তু ফিরবার বেলা একেবারে বেপরোয়া। করপোরেশনের রাস্তায় হোস পাইপ দিয়ে পানি দেয়া হয়। রামধনুর মতো অর্ধ গোলাকার হয়ে পানি পড়তে থাকে। মাথাটা নিচু করে ছেলেরা তারই তলা দিয়ে হুস করে বেরিয়ে আসে। গায়ে এক ফোঁটাও পানি পড়ে না। কেউ কারো চুল ধরে টানে, কেউ মারে ল্যাং, কেউ-বা কারো কোঁচা দেয় খুলে। কোনোদিন হয়তো এই সময়টায় নাস্তা খেতে বসি। এমন সময় কানে আসে সমবেত কণ্ঠের আওয়াজ :

হল্লা করে ছুটির পরে
ঐ যে যারা যাচ্ছে পথে
হালকা হাসি হাসছে কেবল
ভাসছে যেন আল্লা স্রোতে—

হয়তো আর একদিন শুনতে পাই কবি গোলাম মোস্তফার চরণ :

আমরা নূতন আমরা কুঁড়ি
নিখিল মানব নন্দনে—

আর দেখে কে। নাস্তা ফেলে উল্কার মতো ছুট। একেবারে গেটের সামনে।

সেই স্কুলে ভর্তি হতে চলেছি। আব্বা 'ওয়াসেল মোল্লার' দোকান থেকে এক জোড়া নতুন হাফ শার্ট আর হাফ প্যান্ট কিনে এনে দিয়েছেন। সকাল সকাল গা ধুয়ে নিয়েছি। সুজির হালুয়া আর হাতে বেলা রুটি দিয়ে আম্মা নাস্তা করতে দিয়েছেন, সঙ্গে আলু ভাজিও আছে। আজ যেন ঈদ! নাস্তা করে উঠেছি, দেখি সামনেই আব্বা আর আম্মা দাঁড়িয়ে আছেন। আম্মা দোয়া পড়ে মাথায় ফুঁ দিলেন। এমন সময় বড় ভাই আর মেজ ভাইও সেখানে উপস্থিত। সকলেই আজ আমাকে একটা বিশেষ চোখে দেখছেন। আজকের দিনটি খোদা যেন আমার জন্যই তৈরি করেছেন। কারো মুখে কথা নেই; কিন্তু সকলের চোখ দিয়েই এক অব্যক্ত আশীর্বচন ঝরে পড়ছে।

আমি মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকি। আমার এই ভঙ্গিটি সকলেরই পরিচিত। আব্বা জিগ্যেস করলেন :

—কি রে! কিছু বলবি?

আমি কোনো কথা বলি না। ইশারা করে আমার কোমরটা দেখিয়ে দিই। বেল্‌ট্‌টা কেনা হয় নি। কোমরে একটা পুরানো টাই বাঁধা আছে।

—তাই তো। ভারি ভুল হয়ে গেছে। ছোট সাহেবের জন্য বেল্‌ট্‌ কেনা হয় নি। মেজ ভাই সহাস্যে বলে উঠলেন।

আমি ছুটে পালালাম।

বড় ভাই আমার সঙ্গে চললেন। গলির মোড়েই খানকাহ্‌-পাক। দু'ভাই সিঁড়ির ওপর সিজদা দিলাম। তারপর চললাম স্কুলে ভর্তি হতে।

হলদে রঙের দোতলা বাড়ি। সামনে প্রকাণ্ড লোহার গেট। তখনো ঘণ্টা পড়ে নি। বিভিন্ন বয়সের ছেলেরা বিভিন্ন দিকে ছুটোছুটি করে হয়রান হচ্ছে। আমার বুক ভয়ে ঢিপঢিপ করতে লাগল।

স্কুল প্রাঙ্গণের দুই পাশে দুই ফেরিঅলার প্রতিযোগিতা চলছে। একদিকে চটপটি, আলুর দম, কাবলি ভাজা আর ফাকোড়ি বিক্রি হচ্ছে; বিপরীত পার্শ্বে লাল নীল হলুদ বর্ণের সিরাপ

দেয়া গুঁড়ো বরফ বিক্রি হচ্ছে। ছেলেরা এইমাত্র খাওয়া-দাওয়া করেই স্কুলে এসেছে। তবু খদ্দের কোনোখানেই কম নয়।

এমন সময় ছেলেদের মধ্যে হঠাৎ "পালা-পালা" রব পড়ে গেল। চোখের নিমেষে অতগুলো ছেলে যে কোথায় অদৃশ্য হলো, আল্লাহ মালুম। দোতলা থেকে মোটাসোটা বেঁটেপনা এক ফর্সা ভদ্রলোক নেবে আসছেন। মাথাটা একেবারে ন্যাড়া; শুধু পিছনের দিকে একটা মস্ত টিকি মরূদ্যানে তালগাছের মতো দাঁড়িয়ে আছে। পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি, পরনে মোটা খদ্দরের ধুতি হাঁটু পর্যন্ত কোনোমতে নেবে এসেছে। ফতুয়ার বোতাম খোলা; নগ্ন বুকের ওপর তেল কুচকুচে পৈতে শোভা পাচ্ছে। কাঠের সিঁড়ি তাঁর পদভারে পটাস পটাস শব্দ করে চতুর্দিক সচকিত করে তুলল। এমন গম্ভীর মানুষ আমি জীবনে দেখি নি। নিচে নেবেই এক হুঙ্কার। গলার আওয়াজ শুনে পিলে চমকে ওঠে।

—দেওকী। আরে ও দেওকী। তোকে কতবার মানা করেছি না— ফেরিঅলাগুলোকে স্কুলের ভিতর ঢুকতে দিবি না। মনে থাকে যেন, আমার একটি ছেলেরও যদি অসুখ করেছে তো তোমাকেই আমি আস্ত রাখব না।

দেওকী স্কুলের দারোয়ান। এইভাবে একবার তুই আর একবার তুমি সম্ভাষণে সম্ভাষিত হয়ে তার নেশা ভুলে গেল। বেচারা গেটের কাছে একটা টুলের ওপর বসে ঝিমোচ্ছিল, আর যখন ঝিমোচ্ছিল না তখন খইনি টিপছিল। কিন্তু তুইয়ের পর তুমি সম্ভাষণের সম্মান লাভ করে সত্যিই তার নেশা ছুটে গেল।

—কি করব পণ্ডিত মশাই। শালারা কিছুতেই শোনে না।

বলেই দেওকী এত বড় জিব কাটল।

—চোপরাও উল্লুক। কত পয়সা খেয়েছিস বল্।

উত্তরে দেওকী তার রাত্রি জাগরণ-ক্লান্ত আর খইনির নেশায় রঙিন রক্তচক্ষু দুটি মুদে আর একবার জিব কাটল।

এই রকম স্বতঃস্ফূর্ত অবলীলায় পণ্ডিত মশাই আদেশ দিতেন। হুকুম দেয়ার জন্য যেন তাঁর জন্ম। কে কর্তৃপক্ষ আর কে ইতরপক্ষ, পণ্ডিত মশাইয়ের বেলা সে প্রশ্নই ওঠে না। দারোয়ান থেকে শুরু করে হেডমাস্টার পর্যন্ত স্কুলের প্রতিটি লোক পণ্ডিত মশাইয়ের ভয়ে তটস্থ। তার একমাত্র কারণ এই যে, হেডমাস্টার তাঁর ছাত্র ছিলেন। আর তিনি এইমাত্র যে বললেন "আমার একটি ছেলেরও যদি অসুখ করেছে" তার সত্যকার অর্থ পরে বুঝেছিলাম। সত্যিই তিনি প্রতিটি ছাত্রকেই নিজের ছেলের মতোই ভালোবাসতেন।

বড় ভাই আমার হাত ধরে এক পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এতক্ষণে তাঁর ওপর পণ্ডিত মশাইয়ের চোখ পড়ল।

—আব্বাস তুমি! কি খবর?

—স্যার, আমার ছোট ভাইটিকে ভর্তি করতে এসেছি।

—বেশ বেশ। তুমি এখন কি করছ? সেই ইংরেজি সাহিত্য নিশ্চয়ই। তোমাদের বংশটাই রাজ-ভক্ত হে!

পণ্ডিত মশাই হেসে ফেললেন। বড় ভাইও হাসলেন।

—তোমার মেজ ভাই কি করছে।

—সে বি এ পড়ছে।

—সেই গুড ওল্ড ইংলিশ অনার্স?

বড় ভাই আবার হাসলেন, কেমন যেন অপরাধীর মতো। বস্তুত পণ্ডিত মশাইয়ের অনুমানই ঠিক। তিনি আবার বললেন :

—ছেলেটা কিন্তু বাংলাও লিখত ভালো। কিন্তু বাংলা শিখে কি হবে! কি বলো?

—না স্যার, ঠিক তা নয়।

পণ্ডিত মশাই সে কথা শুনলেনও না। এবার বড় ভাইকে ছেড়ে আমার ওপর নজর দিলেন। ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে গেল।

একবার আমাকে তিনি ভালো করে দেখে নিলেন; কিন্তু কোনো কথা বললেন না। আমরা অফিস রুমের দিকে হাঁটতে লাগলাম। পণ্ডিত মশাই একটি হাত দিয়ে আমার কোমরের টাই ধরে এগুচ্ছিলেন।

এমন সময় এক কাণ্ড হলো।

পণ্ডিত মশাইয়ের হাতের টানে আমার কোমরের টাই আলগা হয়ে খুলে গেল। প্যান্ট কোমর থেকে খসে পড়ল। ঠিক সেই সময় দোতলার বারান্দার একদল ছেলে সমস্বরে সজোরে হেসে উঠল। সেই হাসির শব্দ ইট-পাটকেলের মতো আমার মাথায়-গায়ে এসে পড়তে লাগল। কান্নার ঢেউ চোখের কাছে এসে আছাড় খেতে লাগল।

জীবনে বহুবার বহুভাবে লজ্জা পেয়েছি; কিন্তু সেদিনের সেই অভিজ্ঞতার কাছে সবকিছুই তুচ্ছ। আবার সেই গগনবিদারি হুঙ্কার :

—কে রে!

চোখের নিমেষে আবার চারদিক নিজ্‌ঝুম।

পণ্ডিত মশাই এবার আমাকে বললেন :

—শোন! তোকে যদি কেউ বিরক্ত করে, আমাকে বলিস। চাবকে পিঠের ছাল তুলে দেব।

সামনের ছেলেদের দেখে বললেন :

—তোরাও শুনে রাখ্।

যাবার আগে বড় ভাই বলে গেলেন :

—স্যার একটু চোখ রাখবেন।

—সে তোমাকে বলতে হবে না। চোখ না রাখলে তুমিও এত বড়টা হতে না।

আর কিছু না বলে পণ্ডিত মশাই আর একদিকে চলে গেলেন।

আমি ক্লাস সিক্সে ভর্তি হলাম।

আট

থার্ড বেঞ্চের এক পাশে বসি। একেবারে প্রথমেই থার্ড বেঞ্চে জায়গা পাওয়া খুব সহজ কথা নয়। পড়ুয়া ছেলেরা পরীক্ষার ফলাফল অনুসারে প্রথম তিনটি বেঞ্চ দখল করে বসে। এই বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসারে আমার স্থান হওয়া উচিত ছিল একেবারে শেষের বেঞ্চিতে। কিন্তু হেডমাস্টার আর হেড পণ্ডিতের সুপারিশেই আমি ক্লাসে অভিজাতদের মধ্যে জায়গা পেলাম। আমার পাশেই বসে মফিজ—সেই ছেলেটা, যাকে রোজ আমি যাতায়াত করতে দেখেছি।

সেদিন ক্লাসে নির্দিষ্ট স্থানে এসে বসতেই দেখি আমার নামে একটি খাম পড়ে আছে।

"অদ্য শনিবার। বৈকাল তিন ঘটিকায় ইন্টালী টকির সামনে সাঙুভেলী রেস্টুরেন্টের তিন

নম্বর কেবিনে উপস্থিত থাকিবেক। ইতি ইস্কাপনের রাজা।"

ওরে বাবা, এ আবার কি!

আমি পাঁচকড়ি দে আর দীনেন রায়ের উপন্যাসের তৃষিত পাঠক। সুতরাং "লোহারথাবা", "ইস্কাপনের রাজা" প্রভৃতি নামকে বড্ড ডরাই।

ভয়ে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। তার ওপর আব্বা-আম্মা বারবার করে মানা করে দিয়েছেন, "খবরদার। স্বদেশীঅলাদের সঙ্গে মিশবি না। তারা গলা টিপে মেরেই ফেলবে।" স্বদেশীঅলাদের সম্পর্কে এই রকম একটা ভয়ঙ্কর ছবি আমার মনে মনে আঁকা হয়ে গিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত সেই স্বদেশীঅলাদের খপ্পরেই পড়লাম না কি।

দুই চোখ ভরা আশা নিয়ে মফিজের দিকে তাকালাম—সে কোনো আলোকপাত করতে পারে কি না; কিন্তু মফিজ গৌতম বুদ্ধর মতো মুখভাব করে তখন পড়া শুনছে।

বড্ড দমে গেলাম।

টিফিনের সময় বট গাছটির গুঁড়িতে বসে চুপচাপ সাত-পাঁচ ভাবতে লাগলাম।

পণ্ডিত মশাইকেও বিপদের কথা খুলে বলা নিরাপদ নয়। শুনেছি স্বদেশীঅলারা দলের কথা ফাঁস করে দিলে জানেই মেরে ফেলে। এক ছিল মফিজ। কিন্তু তার ব্যবহারটাও এমন দুশমনের মতো। অপরপক্ষে কোথায় কোন্ দুই না তিন নম্বর কেবিন, সেখানে যাওয়াও সম্ভব নয়। এখন কি করি!

—চটপটি খাবি?

মফিজ কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে টেরও পাই নি।

ভাবলাম মফিজকে সব কথা খুলে বললে হয় না। সে তো অনেক দিন থেকে এই স্কুলে পড়ছে। সে হয়তো হাল-হকিকত জানে।

শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললাম।

—আমি ভাই বড় বিপদে পড়েছি। এই দ্যাখ।

খামসুদ্ধ চিঠিটা মফিজের হাতে দিলাম।

ফালি করে কাটা আলুর দম একটা সরু কাঠি দিয়ে তুলে মফিজ মুখে পুরল। তারপর শাল পাতার ঠোঙাটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। তারপর চিঠিটা হাতে করে সেও গাছের গুঁড়িতে বসে পড়ল।

গভীর মনোযোগ দিয়ে চিঠিটা পড়ে সে আবার ফেরত দিল!

—কি রে। চুপ করে আছিস কেন? কি বুঝলি!

—ভয়ের আছে, আবার নেইও।

—সে কি রকম?

—দলের কথা শুনলে ভয় নেই, আর না শুনলে—

মফিজ তার বাক্য অসমাপ্ত রাখলেও অর্থোদ্ধার করতে কিছুমাত্র অসুবিধা হলো না।

—আচ্ছা, এরা স্বদেশীঅলা নয় তো?

—স্বদেশীঅলা? না সে রকম কিছু নয়।

এই বলে মফিজ আর একটি আলুর দম মুখে পুরল।

আমি ভয়ে ভয়ে আবার জিগ্যেস করি :

—তুইও দলের সভ্য?

—হুঁ! তবে সভ্য নয়। আমরা বলি দলের অসভ্য।

বেলা তিনটার সময় পথ চিনে আমি তিন নম্বর কেবিনে উপস্থিত হলাম। পুরো খবর সংগ্রহ করবার জন্য আমাকে তিন আনা পয়সা খরচ করতে হয়েছে। বড় কষ্টের পয়সা। মফিজটা এক আচ্ছা জোঁক! তাকে তেলে ভাজা, ঘুগনি, আর বলতেই নেই, একটা ক্যাভেন্ডার সিগারেট খাইয়ে বাকি খবর জানতে হয়েছে। ইস্কাপন-চক্র আমাদের ক্লাসেরই একটি দল। দেশোদ্ধার তাদের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত না হলেও, তাদের কর্মপন্থা আমার পক্ষে কম ভয়াবহ নয়। দলপতির নির্দেশ যে-কেউ অমান্য করেছে, তাকেই নাকাল হতে হয়েছে। কথা না শুনলে এরা না কি গড়ের মাঠে মাঠসুদ্ধ লোকের চোখের সামনে প্যান্ট খুলে নেয়।

কেবিনের ভিতর কতগুলো পরিচিত কণ্ঠের আওয়াজ শুনতে পাই।

কালো পর্দাটা এক হাত দিয়ে সরিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ি।

অমনি সব চুপ।

ইস্কাপনের রাজা আর কেউ নয়, আমাদের সলিল। সলিল ক্লাসের সবচাইতে লম্বা আর সবচাইতে বয়স্ক ছেলে। একেই বয়স বেশি, তার ওপর দু'বছর থেকে ক্লাস সিক্সেই পড়ছে। তাকে ডরাতো না, ক্লাসে এমন কোনো ছেলেই ছিল না। শোনা যেত, মাস্টাররা পর্যন্ত সলিলকে সহজে ঘাঁটাতেন না।

—হরিহর। ও হরিহর।

—আজ্ঞে বাবু, আসি।

—যা তো রে, একটা ভেজিটেবল চপ, আর এক পেয়ালা চা নিয়ে আয়।

—বাবু পয়সা?

—পয়সা!

সলিল এমনভাবে কথাটি বললো যেন পয়সা শব্দটি সে এই প্রথম শুনেছে।

—পয়সা দোব'খন। এখন যা বললাম তাই কর।

—বাবু, ম্যানেজার বাবু যে মানেন না। অনেক বাকি পড়েছে।

কথাটা শুনে সলিল আর বাক্যব্যয় না করে উঠে পড়ে। আমার মনে হলো এখুনি একটা খুনোখুনি হবে।

একটু পরই সলিল ফিরে এলো। তার পিছনে হরিহরের এক হাতে ভেজিটেবল চপ আর অন্য হাতে চা। হরিহরের পিছনে এক চশমা পরা ভদ্রলোক, নিশ্চয়ই তিনিই ম্যানেজার। সলিল দেনা চুকিয়ে এলো কি অন্য কোনো ব্যবস্থা করে এলো, সে আমি জানি না।

ম্যানেজার বিনীতভাবে বললেন :

—সলিল বাবু। দোকান আপনারই। কেবল যখন যা দরকার চাইবেন।

—না মশাই। আপনার বিরুদ্ধে কোনো নালিশ নেই। কিন্তু হোটেলের বাবুর্চি-বেয়ারাগুলোকে একটু আদব কায়দা শেখাবেন। কাকে কি বলতে হয় জানে না। মুখের ওপব চোপা করে।

সলিল এবার আমাকে বললো :

তারপর পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে নিপুণ হাতে সেটাতে অগ্নিসংযোগ করে অল্প হেসে আবার বললো :

—কি রে চলবে?

আমি ভয়ে ভয়ে জবাব দিলাম :

—থাক না ভাই। কখনো খাই নি।

সকলে সমস্বরে হেসে উঠল। সুকান্ত বললো :

—তোরা শুনেছিস! পণ্ডিত মশাই বলছিলেন, এ বছর শাকেরই গুড-কন্ডাক্টের জন্য প্রাইজ পাবে।

কথাটা শুনে আমার কান গরম হয়ে গেল। গুড-কন্ডাক্টের জন্য প্রাইজ পাওয়ার মতো লজ্জাকর ঘটনা যেন আর কিছুই হতে পারে না।

বেপরোয়া হয়ে আমিও একটা সিগারেট ধরালাম, গুড-কন্ডাক্টের জন্য যাতে প্রাইজ পেতে না হয় তারই আপ্রাণ চেষ্টা। মুখে যতই বিস্বাদ লাগুক, দম যতই বন্ধ হয়ে আসুক, তবু প্রাণপণে সিগারেট টানতে লাগলাম।

সেই আমার মুখে খড়ি।

সুকান্ত যখন দেখল আমি একটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি, তখন সে অন্য আর একদিক থেকে আক্রমণ করল।

সে বললো : তোর নাম শাকের কেন রে? তোদের নামগুলোই কেমন যেন বিদঘুটে। রোজ শাক খাই তাই তোর নামটা তবু কোনোমতে মনে আছে।

এমন উপাদেয় রসিকতা যেন কেউ কোনোদিন শোনে নি, এমনি হাসি শুরু হয়ে গেল। একটু পরই আর একজন ছেলে বলে উঠল :

—তা যা বলেছিস ভাই। মুসলমানদের নামগুলো মুখস্থ না করলে যদি কিছুতেই মনে থাকে! আরে বাবা, বসে বসে যদি কতগুলো নামই মুখস্থ করব তো হরিনাম দোষ করল কি।

এইভাবে আর কতক্ষণ চলত কে জানে। কিন্তু সলিল টেবিল চাপড়ে সকলকে থামতে বললো।

—এবার সভার কাজ শুরু করতে হয়।

সভার কাজ শুরু হলো।

বিশেষ কিছু নয়। পণ্ডিত মশাই আজকাল বড় কড়াকড়ি শুরু করেছেন। স্কুল আওয়ারের মধ্যে কোনো ছেলেই বাইরে যেতে পারবে না—এই জরুরি পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার জন্যই এই সভা।

এমতাবস্থায় দারোয়ান দেওকীই আমাদের একমাত্র সহায়। তার সহায়তা ক্রয় করবার জন্য ক্লাসের প্রতিটি ছাত্রকেই মাসে তিন আনা চাঁদা দিতে হবে।

এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার পর সভার কাজ শেষ হলো।

মৌলালির মোড়ে পৌঁছে দুটি বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল। একটি সিনেমার বিজ্ঞাপন : 'দেশের মাটি।' শ্রেষ্ঠাংশে সায়গল আর উমাশশী। কেন যে এতদিন পরও বিজ্ঞাপনটির কথা মনে আছে, জানি না। আর একটি : 'কমিট নো নুইসেন্স।'

হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরে এলাম। মাথার মধ্যে ইস্কাপন-চক্র, দেশের মাটি আর 'কমিট নো নুইসেন্স' তালগোল পাকাতে থাকল।

নয়

তখনো ক্লাস সিক্সেই পড়ি। এনুয়াল পরীক্ষা দরজায় কড়া নাড়ছে। অথচ সেদিন আমি 'রিডিং-রুমে' বসে 'বনে-জঙ্গলে' পড়ছিলাম। এমন সময় মফিজ এসে বললো :

—দু'মাস বাদে পরীক্ষা। তুই 'বনে-জঙ্গলে' পড়ছিস!

—শুরু করেছি। শেষ না করে উঠতে পারছি নে।

মফিজ অনেকক্ষণ কোনো কথা বলে না; কিন্তু চলেও যায় না।

—কি রে। কিছু বলবি?

মফিজ আমার কানের কাছে ঝুঁকে পড়ে গলা খুব খাটো করে বলে :

তোর সঙ্গে জরুরি কথা আছে।

—কি কথা?

মফিজ এদিক-ওদিক সাবধানে দেখে নিয়ে বললো :

—ফার্সি পড়াবার জন্য মৌলবী সাহেবকে মাস্টার রাখবি? তিনি বলেছেন, এনুয়াল পরীক্ষায় তোকে পঁচানব্বুই নম্বর দেবেন। তুই তো সব সাবজেক্টেই ভালো, ফার্সিতে একটু বেশি নম্বর পেলে ক্লাসে তোর পজিশন থাকবে। দু'মাস পঁচিশ টাকা করে মাইনে দিলেই হবে।

—সে কি রে! পরীক্ষার আগেই নম্বর কি রে!

—দূর গাধা! তুই জানিস, ঐ শিশিরটা ক্লাসে থার্ড হয় কি করে? পরীক্ষার তিন মাস আগে থেকে সেকেন্ড পণ্ডিত তাকে পড়ায়। ঐ পঁচিশ টাকা মাইনে। বাংলা আর সংস্কৃতে শিশির আশি-পঁচাশি করে নম্বর পায়। অঙ্কের মাস্টার হারান বাবুকেও শিশির হাতে রেখেছে। তুই জানিস না। ক্লাস ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত এ-রকম কত হয়।

—তুই বলছিস কি!

—আরে ভাই তুই জানিস, এই মাস্টারদের কত কষ্ট! ওদের দিকটাও তো দেখতে হবে। মৌলবী সাহেবের কষ্ট দেখলে চোখে পানি আসে।

সত্যকার বেদনাবোধে মফিজের কণ্ঠ ভারাক্রান্ত হয়ে আসে। পরে অবশ্য শুনেছিলাম, এই বেদনাবোধের রহস্য। মৌলবী সাহেবের বারো বছরের একটি কন্যা ছিল। দেখতে সে যেমনই হোক, চৌদ্দ বছরের মফিজের কানে এই মেয়েটির চুড়ির শব্দ বড়ই মিষ্টি শোনাত।

কিন্তু সেদিন আমি এসব কিছুই জানতাম না। তাই অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকি।

—আরো শুনবি? আমাদের ফোর্থ-বয় শেখর। সেই তো ক্লাসের সেরা ছেলে। কিন্তু হলে কি হবে। বেচারা গরিব বলে কাউকে মাস্টার রাখতে পারে না। তাই ফোর্থ হয়। তুই দেখবি, ম্যাট্রিকে তারই রেজাল্ট সবচাইতে ভালো হবে।

বিস্ময়ের পর বিস্ময়। আমি হতবুদ্ধি হয়ে যাই। মাথাটাও কেমন ঘুরতে থাকে। শেখর ছেলেটিকে আমার বরাবরই খুব ভালো লাগে। হাঁটু পর্যন্ত উঁচু একটি লাল-পেড়ে ধুতি আর একটি ফতুয়া পরে স্কুলে আসে। শান্ত চোখের দৃষ্টি। ফার্স্ট বয় কাঞ্জিলাল, সেকেন্ড বয় বদ্রিনারায়ণ আর থার্ড বয় শিশির, কেউ তাদের সঙ্গে কথা বলে না। বিদ্যার আভিজাত্যে তারা তিনজন এক স্বতন্ত্র দল। শেখর চুপচাপ তার আসনে বসে পড়া শোনে।

কিন্তু কেমন করে যেন ক্লাসের আশিজন ছেলের মধ্যে শেখরকেই সবার আগে চোখে পড়ে।

আজকে এই সময় একদিনের কথা আমার মনে পড়ল।

এসিস্‌টেন্ট হেডমাস্টার শশাঙ্কবাবু আমাদের ইংরেজি কম্পোজিশন শেখাচ্ছিলেন। ছেলেদের বলেছেন : বন্ধুর পিতৃবিয়োগে শোক প্রকাশ করে চিঠি লেখ।

আমার চিঠি সবচাইতে ভালো হয়েছিল। শশাঙ্কবাবু দশের মধ্যে আট দিলেন। তারপর

শেখর : সাড়ে সাত।

—তোমার খাতাটা একটু দেখতে পারি ভাই।

এমন শান্ত, ভদ্র, মিষ্ট অনুরোধ জীবনে আর কোনোদিন শুনি নি।

—নিশ্চয়ই।

ক্লাসে আর কোনো কথা হয় নি। শেখর খাতাটি দেখে ফেরত দিল।

টিফিনের সময় ছেলেরা ছোটাছুটি দাপাদাপি খাওয়া-দাওয়া করতে থাকে।

সেদিন দেখি, শেখর একটি মুদির দোকানের সামনে একা দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখে এক অবর্ণনীয় দৃষ্টি।

—মুড়ি-মুড়কি খাবি?

আমি জিগ্যেস করলাম।

—না ভাই। তুমি খাও।

—তুই অমন "তুমি তুমি" করিস কেন বলতো? আর তো কেউ তুমি বলে না! শেখর অল্পক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর হনহন করে একদিকে চলে গেল।

আসল কথাটা শুনেছিলাম পরে।

কাঞ্জিলাল, বদ্রি আর শিশির একদিন শেখরকে এক পাশে ডেকে নিয়ে বলেছিল :

—শেখর। তোমাকে বহুদিন থেকে একটা কথা বলব মনে করেছি। তুমি ইতরদের মতো তুই-তোকারি করবে না।

এই সময় মফিজের প্রশ্ন আমাকে আবার বর্তমানে ফিরিয়ে আনল।

—কি রে। কি ঠিক করলি? মৌলবী সাহেবকে কি বলব?

—না রে না। আমি বড় ভাইয়ের কাছে ফার্সি পড়ি। তাছাড়া ও-ভাবে ফার্স্ট-সেকেন্ড হওয়ার তরবিয়ত আমরা পাই নি।

মফিজ আর কিছু বলে না।

এবার আমিই জিগ্যেস করি :

—আচ্ছা মফিজ, তুই এত কথা কি করে জানলিরে?

এইবার মফিজ একটুখানি হাসল। দেখবার মতো সে হাসি।

—ক্লাস ওয়ান থেকে এই স্কুলে পড়ছি। আমি জানব না, তো জানবে কে?

তা বটে।

এইভাবে আমার দিন কাটতে থাকে। এক এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এক এক দিনে এক এক বছর করে বয়স বাড়তে থাকে।

দশ

কোনো কোনোদিন স্কুলে যাবার বা স্কুল থেকে ফিরবার পথে দেখি মুশতাকদের বাসার সামনে তাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। অমনি একটা সুস্থ সুন্দর হাসিখুশিভরা জীবনের ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বড় ইচ্ছে হয়, একবার ভিতরে যাই; পরক্ষণেই দ্বিগুণ নিরুৎসাহে মন ভরে যায়।

একদিন গড়ের মাঠে ফুটবল খেলতে গেছি। অনেকক্ষণ ধরে বৃষ্টি হচ্ছে— রাস্তায় এক হাঁটু পানি জমে গেছে। 'বোম্বে ক্রাউন' রেস্টুরেন্টের ছাদের নিচে দাঁড়িয়ে আছি—কবে বৃষ্টি ধরবে, বাড়ি যাব।

এমন সময় চোখের সামনে বিদ্যুৎ চমকাবার মতো করে মুশতাকদের হলদে রঙের শেভ্ গাড়িটা আমারই চোখের সামনে এসে দাঁড়াল।

সেলিনা, আর একটি মেয়ে এবং মুশতাক একের পর এক গাড়ি থেকে নাবল। সন্তর্পণে পানির ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে, বর্ষণের বিরুদ্ধে অশেষ নালিশ প্রকাশ করতে করতে কলহাস্যে মুখরিত আর সিক্ত-সাজ সম্পর্কে বিচলিত হয়ে তারা তিনজন ফুটপাতের ওপর নেবে এলো। মুশতাক এলো সবার পিছনে, তার চোখেমুখে সেই পরিচিত দুষ্টুমিভরা হাসি। ফুটপাতের এক কোণে বর্ষার পানি জমে এক ক্ষুদ্র জলাশয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। মুশতাক সজোরে সেই স্থানটুকুর ওপর পদাঘাত করতেই সেলিনার শাড়ি আরো ভিজে গেল। সেলিনা সাপের মতো ফণা তুলেই যেন ওঝা দেখে দৃষ্টি নত করে নিল—এক কোণে দণ্ডায়মান আমাকে দেখে একেবারে স্থির হয়ে গেল।

শত চেষ্টা সত্ত্বেও সেলিনার শাড়ি-ব্লাউজ প্রায় সবটুকুই ভিজে গেছে। মাথার চুলে আর চোখের পল্লবে বর্ষার পানি শিশিরের মতো টলমল করছে। সেলিনাকে দেখলেই এখন আমার ভয় হয়। তাই আমিও অনেকটা বজ্রাহতের মতোই দাঁড়িয়ে থাকলাম। সেলিনার পা দু'খানাও যেন কিছুক্ষণ নড়ল না। এমন সময় মুশতাকও আমাকে আবিষ্কার করল।

—কি রে শাকের তুই যে! এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস?

মুশতাকের প্রশ্নের জবাবে কিছু বলতে যাব এমন সময় শুনতে পেলাম সেলিনা দ্বিতীয় মেয়েটিকে বলছে :

—মুশতাক'স বি-এফ—বেস্ট ফ্রেন্ড।

তার ঠোঁটের বাঁকা হাসিটুকুও দৃষ্টি এড়াল না।

সুতরাং জবাবে কিছুই বলতে পারলাম না, বলবার প্রবৃত্তি হলো না।

এবার মুশতাক ঘাড় ধরে সজোরে আমাকে নাড়া দিয়ে বললো :

—দাঁড়িয়ে ভাবছিস কি। চল ভিতরে চল—ব্রেন কাটলেট খাওয়া যাবে।

আমি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। পকেটে একটি পয়সাও নেই—ব্রেন কাটলেট খাব কি। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, একটু আগেই ব্রেন কাটলেটের ভেসে আসা গন্ধ মনটিকে আনচান করে দিচ্ছিল। বর্ষণ মুখরিত সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা হাওয়া সেই ইচ্ছেটিকে শাসন-না-মানা ঝড়ের মতোই দুর্দমনীয় করে তুলছিল। অথচ এই মুহূর্তে ব্রেন কাটলেট খাবার প্রস্তাবে আমি ক্ষেপে উঠলাম। বিচিত্র মানব মনের গতি। বিচিত্রতর দরিদ্র-সন্তানের মনস্তত্ত্ব। বহির্বিশ্বে বেড়ে উঠবার সব পথ রুদ্ধপ্রায় দেখে অন্তর্লোকে তার পরিণতিটা কত দ্রুতই না আসে। মুশতাক বয়সে আমার চাইতে কতটুকুই আর ছোট, তবু সে আমার কাছে শিশু মাত্র।

যাই হোক এবার আমি যে জবাব দিলাম তা যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি রূঢ়।

—আমি ভাই তোমাদের মতো বড়লোক নই। কাটলেট খাবার পয়সা আমার নেই।

—আহা, তোকে পয়সা খরচ করতে বলছে কে?

—তাহলে কি তোর কাছ থেকে ভিক্ষে নেব?

এবার মুশতাকও রেগে উঠল।

—তুই তো আচ্ছা কথা বলিস! বন্ধুর কাছ থেকে কেউ ভিক্ষে নেয়? তাছাড়া তোকে যদি

আমি একদিন খাওয়াই, তাতেই কি তোর মান যাবে?

—না ভাই তুই যা।

—তা কিছুতেই হয় না।

এই বলে মুশতাক জোর করে একটা পাঁচ টাকার নোট আমার পকেটে গুঁজে দিল।

একটা কেবিনে সেলিনা আর তার বান্ধবী মুখোমুখি বসে ছিল। মুশতাক কোনো কথা না বলে সেই মেয়েটির পাশে গিয়ে বসে পড়ল। আমিও মুহূর্তকাল চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম। সেলিনা একবার দুটি চোখ তুলে—চোখ তো নয় যেন করাত—মুশতাকের দিকে তাকালো। মুশতাকের দুটি চোখ তখন টেবিলক্লথটির সূচিকার্যের নৈপুণ্য পর্যবেক্ষণে নিযুক্ত। সেলিনা নীরবে একটু সরে বসে জায়গা করে দিল। আমি সেলিনার পাশে গিয়ে বসলাম—যেন ফাঁসির মঞ্চের ওপর এগিয়ে এলাম।

এবার মুশতাক আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল :

—বুবুর বন্ধু অনিমা। আমার বন্ধু শাকের।

অনিমা হাত তুলে নমস্কার করল। আমি আরো একটু আড়ষ্ট হয়ে বসলাম। সেলিনা আর অনিমা দৃষ্টি বিনিময় করল।

বাইরে তখনো তেমনি বৃষ্টি পড়ছে, এ বৃষ্টি যে কোনোদিনই থামবে তা মনে হয় না। টিনের ছাতে জানালার শার্ষিতে, নালার পানিতে, ফিটন গাড়ির চামড়ায়, পথে-মাঠে দালানের দেয়ালে বৃষ্টির আছাড় খাওয়ার অবিরাম শব্দ ছাড়া আর কোনো দিকে কোনো শব্দ নেই। কালো পিচের রাস্তার ওপর এমন তীক্ষ্ণ ধারায় বৃষ্টি পড়ছিল যেন কড়াইয়ের ওপর খই ফুটছে।

কেবিনের ভিতরে আমরা চারিটি প্রাণী চুপচাপ বসে কাটলেটের জন্য অপেক্ষা করছি। কারো মুখে কথা নেই।

এক সময় কাটলেট এলো, মনে হলো এক যুগ পরে।

নীরবে আহার চলল। ছুরিকাঁটার শব্দ, তাছাড়া কারো মুখে কোনো রা নেই। খাবার সময় কেবল আমার মুখ দিয়েই এক রকম বিশ্রী আওয়াজ বেরুতে লাগল। অন্য তিনজন কেমন নিঃশব্দে খেয়ে চলেছে। শুধু কি তাই। কেমন ধীর মন্থর গতি; খাওয়াটা যেন এক বেদনাদায়ক কর্তব্য।

কেবিনের ভিতর এক অস্বাভাবিক নীরবতা বিরাজ করতে লাগল। সবাই কাটলেটের সদ্ব্যবহার করতে ব্যস্ত, নিশ্চয়ই এইটেই নীরবতার কারণ। অথচ এই নীরবতা কেন যেন আমাকে পীড়ন করতে লাগল। আমরা চারজনই এক সঙ্গে বসে খাচ্ছি; যা কিছু ঘটছে চারজনেরই চোখের সামনে ঘটছে। অথচ অপর তিনজনের ভাবভঙ্গি দেখে আমার কেবলই মনে হতে লাগল, এমন কিছু ঘটেছে, বা ঘটছে, যা শুধু ওরা তিনজনই জানে। সে এমনই এক রহস্য যা চতুর্থজনকে জানানো যায় না। আমার এই অস্বস্তিকর আশঙ্কার হেতু কি তখনো বুঝি নি। তবে একটা কথা আমার মনে হচ্ছিল। আমি যেভাবে ছুরি আর কাঁটা চালনা করছিলাম, সেটাকে ঠিক স্বচ্ছন্দ বলা যায় না।

এমন সময় যেন ভূত দেখেছি সেইভাবে চমকে উঠলাম।

হঠাৎ চোখে পড়ল আমার সঙ্গী তিনজন ডান হাতে ছুরি আর বাম হাতে কাঁটা ধরে আহার করছে।

আর আমি?

সে মর্মান্তিক কথা মনে হলে আজও আমার শরীরের লোম খাড়া হয়ে ওঠে।

আমার বাম হাতে ছুরি আর ডান হাতে কাঁটা।

সময়ের গতি যেন থেমে গেছে।

আমি মুহূর্তকাল নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকলাম।

তারপর মাথা নত করে ছুরি আর কাঁটাকে হস্তান্তরিত করলাম। আমার সঙ্গী তিনজনের তিন জোড়া পা অসোয়াস্তিতে শান্ত নীরে বুদ্বুদের মতো একবার নড়ে উঠল। তারা তিনজন অলক্ষ্যে দৃষ্টি বিনিময়ের চেষ্টা করল; কিন্তু তখন আমার চোখ-কান অস্বাভাবিক রকম সজাগ। কিছুই দৃষ্টি এড়ালো না।

কথাটা মনে হলে আজও আমার কান গরম হয়ে ওঠে। অথচ, আশ্চর্য—এই এতদিন পরও ডান হাতে কাঁটা আর বাম হাতে ছুরি ধরে আহার করতে পারলেই আমি অপেক্ষাকৃত সহজে আহার করি।

ওয়েটার বিল নিয়ে এলো। আমি দ্রুতবেগে পকেট থেকে পাঁচ টাকার নোট বের করে তশতরির ওপর রাখলাম। দ্রুততর বেগে নেবে এলো অনিমার হাত, তশতরির ওপর রাখা আমার হাতের ওপর!

—না, না তুমি নয়। আমি দেব।

সেলিনা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বললো :

—চলো চলো বিল দেয়া হয়ে গেছে।

—এ তোমার ভারি অন্যায় কিন্তু।

অনিমা তিরস্কার করে উঠল।

অনিমা আর সেলিনার মধ্যে বাক্য-বিনিময় হচ্ছে, তারই এক ফাঁকে মুশতাক আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ একটা চোখ টিপল! তার অর্থ এই : ওরাই পয়সা দিক না। তুই অত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন।

আমি কিছু বললাম না। কি-ই-বা বলব! সেলিনা, অনিমা আর মুশতাক বিল দেয়া-নেয়া নিয়ে রচসা করতে পারে; কিন্তু বিল তারা তিনজনের মধ্যে আর যেই দিক, আমার যে দেবার প্রশ্নই উঠতে পারে না, এটা তারা ধরেই নিয়েছে। তার কারণ কি এই যে, আমি তাদের স্বল্প-পরিচিত? না কি, তার চাইতেও সূক্ষ্ম কোনো কারণ ছিল? তার কারণ কি এই নয় যে, যে বৃষ্টি ধরবার অপেক্ষায় আমাকে বাড়ি থেকে বহু দূরে একটি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, সেই বর্ষণের শুভক্ষণেই ওরা তিনজন হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, গৃহের উষ্ণ কোণ ত্যাগ করেছে, মোটর গাড়ি বের করতে বলেছে, তারপর সোজা 'বোম্বে-ক্রাউনে' উপস্থিত হয়েছে?

আমার তখন যে বয়স সেই বয়সে এমন তলিয়ে চিন্তা করবার মতো বুদ্ধির পরিণতি থাকার কথা নয়। কিন্তু কতগুলো সামাজিক অভ্যাস, রীতি-নীতি, আদব-কায়দার পিছনে এমন-ধারা অনুচ্চারিত কতগুলো কারণই কাজ করতে থাকে। এতো ভালোই যে রীতি-নীতিগুলো এই কার্য-কারণের সূত্র ধরেই অগ্রসর হয়। তবু সেদিন বড্ড কষ্ট পেয়েছিলাম। না হয় আমার পকেটের পাঁচটি টাকাও আমার নিজের নয়, তবু আমাকে বিল শোধ করতে দিলে কি আর এমন ক্ষতি হতো। ওদের তিনজনের সঙ্গে কোনো একখানে তো তাহলে সমতুল্যতা দাবি করতে পারতাম।

আমি যখন এই চিন্তারই সূত্র ধরে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হয়ে গেছি সেই সময় সেলিনা বললো :

—অনিমা চলো আজ রাত্রে তুমি আমাদের বাড়ি থাকবে।

—আমার কোনোই আপত্তি নেই। কিন্তু মাকে রাজি করবার দায়িত্ব তোমার।

—আচ্ছা আমারহ।

—শাকের, তুইও চল।

মুশতাক এবার আমাকে নিমন্ত্রণ করল। সেলিনা তার বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করলে মুশতাকই-বা তার বন্ধুকে ডাকবে না কেন? মুশতাকের বহু কার্যকলাপের পিছনে এমনই এক সাম্য-নীতি কাজ করত।

যাই হোক, মুশতাকের প্রস্তাব সম্পর্কে হাঁ না কিছু বলবার আগেই অনিমাও অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে যোগ করল :

—বেশ হবে। তুমিও চলো না।

কেবল সেলিনা কোনো কথাই বললো না।

আমরা সবাই গাড়িতে গিয়ে বসলাম। সবার আগে আমি ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসলাম।

গাড়ি চলল ভবানীপুর, অনিমাদের বাড়ি। তারপর যাবে বালীগঞ্জ, আমাদের বাড়ি। তারপর বেনিয়া পুকুর, মুশতাকদের বাড়ি।

বৃষ্টি তখন থেমেছে; কিন্তু আকাশে ক্ষণে ক্ষণে মেঘ তখনো গর্জন করছে। মোটর গাড়ির আর্শির ওপর কখনো কখনো বিদ্যুতের আলো টর্চের মতো এসে পড়ে। তখনই আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া বড় বড় মেঘ এদিক থেকে ওদিকে সরে যাচ্ছে দেখা যায়। ঠাণ্ডা হাওয়া দিতে থাকে।

গাড়ি চলল এ-পথ সে-পথ পেরিয়ে। কারো মুখে কথা নেই। একবার কেবল ড্রাইভার আমাকে উদ্দেশ করে বললো :—বাবু। আপনার পা-টা একটু সরিয়ে নিন। গাড়িতে কাদা লাগছে।

আমি আজ্ঞা পালন করলাম। গাড়ি আগের মতোই ছুটতে লাগল।

একটা বাগানঅলা বাড়ির মধ্যে ঢুকে গাড়ি বারান্দার নিচে এসেই থেমে পড়ল।

অনিমা গাড়ি থেকে নাবতে নাবতে বললো :

—তোমরা সবাই নাবো।

সেলিনা তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করে বললো :

—না চলো, আমি একাই যাই। সবাই নাবলে আবার দেরি হয়ে যাবে।

একটু পরই তারা ফিরে এলো।

আবার গাড়ি ছুটল। একটু পরই আমাদের বাড়ির দরজা।

অনিমা দরজা খুলে নাবতে যাচ্ছিল।

—চলো শাকের, তোমার মায়ের সাথে আলাপ করে আসি।

—আলাপ করবি আর একদিন পোড়ারমুখী, এখন থাম।

কি কারণে জানি না সেলিনা অনিমাকে বিরত করল। আমিও এই প্রথম সেলিনার প্রতি এক প্রকার কৃতজ্ঞতা বোধ করতে লাগলাম।

কেবল মুশতাক আমার সঙ্গে নেবে এলো।

আম্মা একটি অন্ধকার কোণে চুপচাপ বসেছিলেন। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন।

—কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

কণ্ঠ অপ্রসন্ন।

জবাব দিল মুশতাক।

—আমাদের সঙ্গে ছিল। চাচি, শাকের আজ রাতে আমাদের বাড়ি থাকবে। আম্মা মুশতাকের কথার কোনো জবাব দিলেন না। একবার শূন্য দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন মাত্র।

তারপর আমার হাত ধরে পাশের ঘরে নিয়ে এলেন। জিগ্যেস করলেন :

—আলমারি থেকে দুটো টাকা নিয়েছিস?

আমার গলা কেঁপে উঠল, তবু বললাম :

—কৈ, না তো!

—আচ্ছা যা!

আম্মার গা গরম। নিশ্চয়ই তাঁর গায়ে জ্বর আছে।

আমি তবু নড়ি না।

আম্মা আবার বলেন :

—ওষুধের জন্য টাকা দুটো রেখেছিলাম।

আমি আর দাঁড়াই না। তাড়াতাড়ি মুশতাকের সঙ্গে বেরিয়ে আসি। সেলিনার প্রতি ডবল কৃতজ্ঞতা বোধ করি। ভাগ্যিস, অনিমাকে নাবতে দেয় নি।

বেশ রাত হয়েছে। করপোরেশনের বৈদ্যুতিক আলোক-স্তম্ভটির ঠিক নিচেই গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টি তখন থেমে গেছে। শুধু আকাশের বুকে বড় বড় মেঘ তখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সেলিনা আর অনিমা গাড়ির মধ্যে বসে আছে। আলো-অন্ধকারে তাদের ইহলোকের প্রাণী বলেই মনে হচ্ছে না। চারদিকের পরিবেশ কেমন যেন অশরীরী অলৌকিক।

এবার আমরা মুশতাকদের বাড়ি পৌঁছলাম।

মুশতাকের আম্মা বললেন :

—অনেক দিন আস নি। অসুখ-বিসুখ করে নি তো বাবা।

আমি কোনো জবাব দিই না।

বাথরুমের দরজায় ঠেস দিয়ে সেলিনা দাঁড়িয়েছিল। তার চুল বৃষ্টির পানিতে ভেজা—কাঁধে তোয়ালে। এখুনি গা ধুতে যাবে।

মুশতাকের আম্মা আবার বললেন :

—আজ এখানেই খেয়ে যাবে।

মুশতাক তাড়াতাড়ি জবাব দিল :

—খেয়ে যাবে কি আম্মা! শাকের যে আজ রাত্রে এখানেই থাকবে।

অনিমাও যোগ দিল :

—আমিও যে থাকব বলেই এসেছি, মাসিমা।

—ওমা। তাই না কি। তা তোমরা দুষ্টু ছেলেমেয়েরা বাইরে থেকে কি ষড়যন্ত্র করে এসেছ, না বললে আমি কি করে জানব বলো মা।

এবার আমার দিকে ফিরে বললেন :

—আমি চললাম রান্নার ব্যবস্থা করতে। দুষ্টু ছেলে তুমি চলে যেও না সেদিনের মতো।

এবার আমিও বললাম :

—না চাচি। আমি যাব না।

সেলিনা তখনো দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছিল। কখন এক সময় খোঁপা খুলে দিয়েছে। চুলগুলো হাঁটু পর্যন্ত নেবে এসে যেন পা ধরে কিসের জন্য সাধাসাধি করছে।

অনিমা বললো :

—সেলিনা, আমার হাতে ক্যামেরা থাকলে এখনি তোর ছবি তুলে নিতাম।

—কেন রে?

—কেন রে! তা কি আর আপনি জানেন!

এবার সেলিনা একটুখানি হেসে গোসলখানার দরজা বন্ধ করল।

আমরা সবাই বৈঠকখানায় এসে বসলাম।

সেলিনাও একটু পরেই গোসল করে বেরিয়ে এলো।

মুশতাকের পরনে জিপ-লাগানো লাল রঙের স্পোর্টস্ শার্ট আর সাদা হাফ প্যান্ট। ভারি স্মার্ট লাগছিল। আমি পরে আছি সাদা রঙের বিবর্ণ নোংরা হ্যাফ প্যান্ট আর একটা ময়লা হাফ শার্ট। আমার ঢ্যাঙা পায়ের লোমগুলো সজারুর গায়ের লোমের মতোই বিসদৃশ ঠেকছিল। আমি আবার মনের মধ্যে সেই পুরাতন অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগলাম।

সেলিনা মুশতাকের দিকে তাকিয়ে একবার মুচকি হাসল। সে হাসির অর্থ আমি বুঝলাম না।

কথা বলছি, এমন সময় সেলিনার দৃষ্টি অনুসরণ করে আমার দৃষ্টি আমারই দুটি পায়ের ওপর এসে স্থির হলো। হাফ প্যান্টের নিচে হাঁটু থেকে পা পর্যন্ত সবটাই খোলা; আমার পায়ের সজারুর মতো লোমগুলো যেন সকলের গায়ে বিঁধছিল। সবচাইতে বেশি আমার নিজের গায়ে। সেলিনা একবার সেইদিকে দেখল, একবার মুশতাকের দিকে। মুশতাকের পরনেও হাফ প্যান্ট; কিন্তু কেমন করে যেন হাফ প্যান্ট তাকে দিব্যি মানিয়ে যেত।

সেলিনার চোখের দৃষ্টি দেখে মুশতাক পর্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে গেল। সেও একবার আমার লোমশ পা দুটির দিকে চকিতে তাকিয়ে নিয়ে গম্ভীর হয়ে বসে থাকল।

আর আমি?

আমার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল আমারই হতভাগ্য পদযুগলের ওপর। এই দুটি পা-কে নিয়ে কি করি, কোথায় লুকাই, সেই অসহায় চিন্তায় আমার মাথা ভার হয়ে থাকল। মনে হতে লাগল, এমন একজোড়া বিসদৃশ পদার্থ সৃষ্টি না করলে খোদার লোকসানটা কি হতো। আর সৃষ্টি যদি করাই হলো একটু সুন্দর সুডৌল আর সুশ্রী করে তৈরি করলেই-বা কার কি ক্ষতি হতো। সেই এক নিমেষের লজ্জা থেকে বাঁচবার জন্য জীবনের অবশিষ্ট সময়টা পদবিহীন হয়ে থাকতেও আমি সানন্দে রাজি হয়ে যেতাম। কিন্তু দুটি জলজ্যান্ত পা-কে—তা সে যতোই লোমশ আর বিসদৃশ হোক তো আর ইচ্ছে করলেই পকেটে পুরে ফেলতে পারি না এবং সত্যি সত্যিই আর লোপাটও করে দেয়া যায় না। কারণ, আমার পদমর্যাদা না হয় নাই থাক কিন্তু পদ-চালনার প্রয়োজন তো আর দশজনের চাইতে কিছু কম ছিল না। বরং কিছু বেশিই ছিল।

ঝকঝকে পরিষ্কার মেঝে, দেয়ালে কত রকমের ছবি, সৌখিন আসবাবপত্র, কোথাও এতটুকু বালুকণা পর্যন্ত চোখে পড়বার উপায় নেই। সেইখানেই আমি হাফ প্যান্ট পরে পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছি। হাঁটুর ভাঁজের কাছে কাদা-মাখা পানি টলটল করছে, গোড়ালির কাছে এক চাকলা কাদা। খোদার দুনিয়ায় এতদিকে এত সুন্দর জিনিস থাকতে সেলিনার চোখ বারবার সেই কাদাটুকুর ওপর এসে পড়ছে। অথবা এসে পড়ছে বলেই আমার মনে হচ্ছে।

মুশতাক আমার হাত ধরে টেনে তুলল।

—তুই গোসলখানায় ঢুকে পড়। আমি কাপড় এনে দিচ্ছি।

আমি প্রতিবাদ না করে দুটি অবাঞ্ছিত-পরিস্থিতির মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম অবাঞ্ছিতটাই বেছে নিলাম। চিড়িয়াখানার জানোয়ারের মতো কৌতূহল আর কৌতুকের বস্তু না হয়ে, পরের

পোশাক পরে বাবু হওয়াও ভালো। অন্তত আমি তাই ঠিক করলাম।

এক সময় চাচি এসে বললেন :

—তোমরা সব করছ কি। খাবার হতে কিন্তু দেরি আছে। বরং তোমরা এখন এক পেয়ালা করে চা খাও।

অনিমা সোৎসাহে সায় দিল।

আমি ইতিমধ্যে গোসল করে মুশতাকের দেয়া সাজে সজ্জিত হয়ে তৈরি হয়ে নিয়েছি।

কথার অভাব ঘটলেই অনিমা একটা কিছু বলে, বা একটা কোনো প্রস্তাব করে কামরার নীরবতা দূর করছিল; কিন্তু এভাবে কাঁহাতক আলাপ চলতে পারে? তাই এক সময় সে-ই প্রস্তাব করল :

—এসো, ক্যারাম খেলা যাক।

মুশতাক চট করে রাজি হয়ে গেল; কিন্তু সেলিনা কোনো কথাই বললো না। অনিমা জবরদস্তি করে তাকে টেনে চাটাইয়ের ওপর বসিয়ে দিল।

প্রথমবার আমি আর অনিমা পার্টনার হলাম; কিন্তু হেরে গেলাম।

অনিমা খেলে ভালোই। এমনকি 'টাচ্' আর 'রিবাউন্ডের' মারগুলো জবরদস্ত মারে। কিন্তু তার এক দোষ শেষের দিকে যারপরনাই নার্ভাস হয়ে যায়। হয়তো এক কঠিন অবস্থা থেকে নিজেকে উদ্ধার করে ধীরে ধীরে ময়দান সাফ করে আনল, তারপর যে মুহূর্তে বোর্ড অবধারিত আমাদেব মনে হচ্ছে, ঠিক সেই সময়ই তার হাত দুটি ফাঁসির আসামির মতো কাঁপতে থাকে। এইভাবে জেতা খেলা আমরা হেরে যাই।

খেলা শেষ হলে অনিমা দুঃখ করে বললো :

—কিছু মনে করো না ভাই, আমাব দোষেই হেরে গেলে।

সত্যিই তাকে দেখে মনে হচ্ছিল তার পরিতাপের সীমা-পরিসীমা নেই। ক্যারাম খেলায় তো হারে নি, তার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল, জীবনের শেষ খেলাতেই বুঝি তার বাজিমাত হয়ে গেছে! সে অনবরত খুনখুন করছিল।

বস্তুত এমনটিই হয়। বিশেষ করে প্রথম যৌবনের সেই সন্ধিক্ষণে তো নিশ্চয় এমনটিই হয়। খেলাই বল, পড়াই বল, যা কিছুতেই প্রতিযোগিতার একটা ভাব আছে, সেখানে একাগ্র চেষ্টার পর আশাহত হলে বুকটাই ভেঙে যায়। সেদিন অনিমার নৈরাশ্য মাত্রাতিরিক্ত মনে হচ্ছিল। আজ কেবল তা স্বাভাবিক নয়, সমীচীন মনে হচ্ছে। জীবনটা গোড়া থেকেই তার কাছে এক দুর্লভ বস্তু। সে সর্বতোভাবেই জীবনটার সদ্ব্যবহার করতে চায়। জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই সে পরাজিত হতে চায় না। তার নিষ্ঠা আছে, সে তার নিষ্ঠার পুরস্কার চায়। কেনই-বা চাইবে না?

যাই হোক, দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা এ আখ্যায়িকাব উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং যেখান থেকে সরে এসেছি সেখানেই ফিরে যাই।

দ্বিতীয়বার খেলতে বসলাম। এবার পার্টনার হলাম আমি আর মুশতাক। অনিমা আর সেলিনা। বলা বাহুল্য, আমাদেরই জিতবার কথা।

কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলাম, মুশতাক ফাজলামি করছে বেশি, খেলছে কম! আমি একার চেষ্টায় কতদূর এগিয়ে নিয়ে যাব? একক চেষ্টায় আর যে খেলাতেই জেতা যাক না কেন, কোনো 'ডাবল্স্' খেলায়, বিশেষ করে ক্যারামের ডাবল্স্ খেলায় বিশেষ সুবিধা করা যায় না।

'বেসের' একটা সহজ মার যখন মুশতাক গুবলেট করে দিলো, আমি তখন রীতিমতো রেগে উঠলাম।

মুশতাক হাসতে হাসতে জবাব দিলো :

—তুই ভাবছিস কি। ওরা যখন বিশ করবে, তখন আমরা খেলা শুরু করব। মেয়েদের একটু গ্রেস দিতে হয়।

হলোও তাই। অনিমা-সেলিনার নম্বর যখন বিশ, আমাদের তখনো শূন্য।

এইবার মুশতাক খেলা শুরু করল। সে কি খেলা! ক্যারাম খেলা যে এত দর্শনীয় হতে পারে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। কত সব অকল্পনীয়, অদৃশ্যপূর্ব, অনবদ্য মার। মুশতাকের সরু সরু আঙুলগুলো যেন খেলছে না, সেতারের তার নাড়ছে। দুটি গুটির মাঝ দিয়ে, তিনটির মাথার ওপর দিয়ে, চারটির পাশ দিয়ে, যতসব সম্ভব-অসম্ভব কোণ থেকে, সে কি এক একটা মার। মুশতাকের মতো খেলোয়াড়ের হাতে ক্যারাম খেলা শিল্পের পর্যায়ে পড়ে।

কিন্তু মেয়েরাও অত সহজে হাল ছাড়বার পাত্রী নয়। যে সুবিধা তারা একবার পেয়ে গেছে সে সুবিধা তারা হেলায় হারাবে না।

হারল না। তারাই জিতল। আমরা চব্বিশ পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিলাম।

তৃতীয় খেলায় আমি আর সেলিনা পার্টনার।

এতক্ষণের ফলাফল; আমি দুটোই হেরেছি, সেলিনা দুটোই জিতেছে, অনিমা আর মুশতাক একটি জিতেছে।

এইবার তৃতীয় আর শেষ খেলা।

মুশতাক অনিমাকে ভরসা দিয়ে বললো :

—তুমি ভেব না। এবার আমরাই জিতব।

কিন্তু উত্তর এলো অনিমার কাছ থেকে নয়, সেলিনার কাছ থেকে। সে বললো :

—তাতে আমারও সন্দেহ নেই। 'ডাবলস্ খেলার' তো এই বিপদ।

সেলিনা কখনোই তার ভাইয়ের সঙ্গে একমত হয় না, বিশেষ করে যেখানে তাদের পরস্পরের শ্রেষ্ঠত্বটাই প্রতিপাদ্য সেখানে তো কিছুতেই নয়। কিন্তু আজ সে অপ্রত্যাশিতভাবে একমত হলো।

আচ্ছা। তাহলে সেলিনার আশঙ্কা এই যে আমাবই খেলার দোষে হেরে যাবে।

আমিও রুমাল মুখে পুরলাম।

মুশতাক আমার এই অভ্যাসের কথা জানে। কিন্তু সে এই সঙ্কেত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বললো :

—শাকের, তোর রুমাল পকেটেই রাখ। এ খেলা তোকে জিততে দেব না।

আমি সে-কথার কোনো জবাব দিলাম না। কিন্তু রুমাল মুখ থেকে সরিয়েও নিলাম না। ক্যারাম খেলায় মুশতাক অনন্য তা একশ'বার মানি। তবু মনে মনে বললাম : দেখাই যাক না। অধ্যবসায়ের যদি কোনো মূল্য থাকে, তো আজ আমাকে সেই মূল্য পেতে হবে।

এমন অবস্থায় খেলতে বসা আর কিছু নয়, নিজের স্নায়ুর ওপর জুলুম করা। সেলিনা প্রথম দুটি খেলাতেই জিতেছে, তৃতীয় ও শেষ খেলাতেও সে জিততেই চায়। অথচ আমাকে পার্টনার দেখে সে আগে থেকেই হার মেনে বসে আছে! মুশতাকও আগে থেকেই ঘোষণা করেছে, সে আমাকে জিততে দেবে না। অবস্থা যখন এই, তখন খেলতে বসা স্নায়ুর ওপর জুলুম ছাড়া আর কি।

এমন একাগ্র নিষ্ঠা আর মনোযোগের সঙ্গে জীবনে অন্য কোনোদিন অন্য কোনো কাজ আমি

করেছি কি না সন্দেহ, সেদিন ক্যারাম যেভাবে খেলেছিলাম। কেবল মারগুলো পরিপাটি হলেই ক্যারাম খেলায় জেতা যায় না। বিশেষ করে প্রথম শ্রেণীর খেলায় হাতের চাইতে বুদ্ধির খেলাই বেশি। নিজের দুটি গুটি সহজেই ফেলতে পারি; কিন্তু তাহলে প্রতিপক্ষের তিনটি গুটির পথ সাফ হয়ে যায়। তাই নিজের একটি গুটি স্থানান্তরিত করে বিপক্ষ দলের অনেকগুলো গুটির পথ রোধ করে দিই। ধীরে ধীরে যেন পা টিপে টিপে শত্রুর শিবিরের দিকে এগুতে থাকি। শত্রুও সেইভাবে নানা প্রলোভন দেখিয়ে তার জাল বিস্তার করতে থাকে।

এইভাবে অনেকক্ষণ ধরে আমাদের খেলা চলতে থাকল। খেলার গতি ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো কখনো এদিক, কখনো ওদিক।

শেষ 'বোর্ডে' তখন ফলাফল : মুশতাকদের নম্বর আঠাশ, আমাদের তেইশ, কিন্তু 'রেড' আমরাই 'পট' করেছি। অর্থাৎ যে-দল এই 'বোর্ড' জিতবে, খেলাও তারাই জিতবে।

আমার ডান দিকের পকেটের ঠিক মুখের সামনে দুটি কালো গুটি। মুশতাকদের গুটি। কালো গুটি দুটির মাঝখানের আধ ইঞ্চিরও কম ব্যবধান আর সেই ফাঁকটুকুর কাছ ঘেঁষে আছে, আমাদের একটি সাদা গুটি, আমাদেব শেষ গুটি। 'বোর্ডে' তখন মোট তিনটি গুটি, দুটি মুশতাকদের, একটি আমাদের।

পকেটের মুখের সামনে বটে, কিন্তু এত কাছে নয় যে 'বেস' থেকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করতে পারি। একমাত্র উপায় যদি 'বিবাউন্ডে' ফেলতে পারি। সে বলতে গেলে এক অসাধ্য ব্যাপার। 'রিবাউন্ড' মারলে আমাদের সাদা গুটি না পড়ে মুশতাকদের দুটি কালো গুটির একটি পড়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশি। অথচ সেই চেষ্টাই আমাকে করতে হবে।

মারটি অতিশয় দুরূহ সন্দেহ নেই। কিন্তু গুটিটি 'পট' করতে পারলে আমরা 'গেম' জিতে যাব। কারণ ইতিপূর্বেই আমরা তেইশ করেছি এবং এবারো আমরাই 'রেড' পট করেছি। কিন্তু সাদা গুটিটা ফেলতে না পারলে খেলায় জিতে যাবে মুশতাক-অনিমা। কেবল যে মুশতাকেব দম্ভই সত্য হবে তাই নয়, সেলিনার আশঙ্কাও যথার্থ প্রমাণিত হবে।

আমি যদি আমার গুটি ফেলতে না পারি তাহলে আমার ডান পাশে মুশতাক সহজেই তাদের কালো গুটি দুটি ফেলে দেবে। তাদের কালো গুটি দুটি মুশতাকের বেসের কাছে পাকা ফলের মতো টপ করে ঝুড়ির মধ্যে পড়বারই অপেক্ষা করছে।

সবাই নিশ্বাস বন্ধ করে দেখছে, অপেক্ষা করছে, আমি কি করি। অনিমার চোখ-মুখ পাথরে খোদাই করা মূর্তির মতোই নিথর ভাবলেশহীন। সেলিনার মুখে ঝড়ের পূর্ব মুহূর্তের সঙ্কেত— কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। বুঝতে পারছিলাম, অসহ্য প্রতীক্ষায় তার শরীর কাঁপছে।

এমনকি মুশতাকও উৎসুক।

আর বলা বাহুল্য, আমার মনের অবস্থাটাও তখন ঈর্ষা করবার মতো নয়।

আমার সমস্যা এই : কালো গুটি দুটির মাঝখানে ফাঁক বড় কম। প্রথমত মারতে হবে রিবাউন্ড। রিবাউন্ড মারে কালো গুটি দুটিকে দু'দিকে সরিয়ে দিয়ে তারই মাঝ দিয়ে সাদা গুটিটিকে গলিয়ে দিতে হবে। বড় সহজ কাজ নয়।

সহজই হোক আর কঠিনই হোক, পাবি আর না পারি, চেষ্টা তো করতে হবে।

দাঁত দিয়ে রুমালটি ভালো করে চেপে ধরলাম। 'স্ট্রাইকারটাকে' একেবারে বামদিকে সরিয়ে আনলাম। তারপর আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে লাগালাম এক 'রিবাউন্ড' মার। স্ট্রাইকারটি আমাদের সাদা গুটিটির ঠিক মাথার ওপর বাজপাখির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। কালো গুটি দুটি তারই ধাক্কায় সসম্মানে দু'দিকে সরে গেল, আমাদের সাদা গুটিটি রাজার মতো সমারোহ আর

মর্যাদায় গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেল।

মুশতাকের গলার ভিতর থেকে ঝাঁপ দিয়ে বেরিয়ে এলো দুটি কথা :

—ওয়ান্ডারফুল শট্।

এইবার আমি রুমাল পকেটে পুরলাম।

এক ঢিলে দুই পাখি মারলাম। মুশতাকের দম্ভ আর সেলিনার আশঙ্কা দুই-ই মিথ্যা প্রমাণিত হলো।

এতক্ষণে সেলিনা হাত-পা ছেড়ে আরাম করে বসল।

এই সময় চাচি এসে বললেন :

—চলো চলো শিগ্‌গির। খাবার তৈরি।

যেতে যেতে অনিমা মুশতাককে উদ্দেশ করে বললো :

—তোমার ওভার-কনফিডেন্সের জন্য তুমি হার।

কথাটি ঠিক। মুশতাক আর অনিমা পর্দা তুলে বেরিয়ে গেল।

তাদের পিছনে সেলিনা। সবার শেষে আমি।

সেলিনা পর্দার কাছে এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। তাবপর সোজা আমার দিকে তাকিয়ে বললো :

—থ্যাঙ্কস্।

তারপর পর্দা তুলে চলে গেল।

তার হাতের চুড়ি আর পর্দার রিঙ এক সঙ্গে বেজে উঠল।

এগারো

খুব সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমি বাড়ি ফিরে আসি। গেট তখনো বন্ধ। আমি জানি অনেকক্ষণ কড়া নাড়তে হবে। অত সকালে সেই শব্দ যদি কারো কানে পৌঁছয়ও, তবু উষ্ণ শয্যা আর আলস্য ত্যাগ কবে কেউ উঠে আসবে না। নিদ্রার ভান করে পড়েই থাকবে। এক আম্মা ছাড়া। সারারাত আম্মার ঘুম হয় না আমি জানি। শেষ রাত্রের দিকে একটু চোখ বন্ধ হয়ে আসে। তাই এই সময়টা তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত না করে আমি বেরিয়ে পড়ি।

কলকাতার রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলোগুলো তখনো নেভে নি। কিন্তু প্রথম অরুণ-কিরণের পটভূমিকায় অনেক নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। সেই সাত-সকালেই হোস-পাইপ দিয়ে রাস্তায় পানি দেয়া হচ্ছে। ফুটপাতের ওপর এখানে-সেখানে কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে। পথের পাশের কোনো কোনো দোকান সবেমাত্র দিনের পাট খুলছে—হাতে মগ আর পায়ে খড়ম দোকানদার ছাউনির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে।

রাস্তার মোড়ে ছোট্ট চায়ের দোকান। বালতিতে করে উনুন ধরানো হয়েছে।

একটু পরই ডালপুরী ভাজা হবে। একটি বন্ধ ঘোড়ার গাড়ি বালীগঞ্জ ময়দানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে—সেই ঘোড়ার খুরের শব্দ ছাড়া কলকাতার রাজপথ তখনো নিস্তব্ধ।

আমি চায়ের দোকানের সামনে পাতা বেঞ্চির ওপর বসে পড়ি।

—দুটি ডালপুরী আর এক ভাঁড় চা। জলদি।

—হাঁ বাবু। জলদিই দেব। গরম ডালপুরী আর গরম চা।

ডালপুরী আর মাটির ভাঁড়ে করে গুড়ের চা যদি পাই তো আমি আর কিছুই চাই না; যদিও আমি ভালো করেই জানি, এদের এই দোকানে ডালপুরী তৈরি করবার প্রণালি, পরীক্ষার আগে মুখস্থ করা স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রণালির সঙ্গে ঠিক মেলে না। কিন্তু সে কথা মনে করে আমার একটা সাময়িক দ্বিধা আসে মাত্র, তার বেশি নয়; চোখের সামনে ডালপুরী দেখলে সে দ্বিধা একেবারেই থাকে না। বড় দিনের পরবে আব্বা ভালো কেক কিনে আনেন; কিন্তু কিসে আর কিসে। কোথায় লাগে কেক।

কাচের পেয়ালার চাইতে মাটির ভাঁড়েই চা খেতে আমার বেশি ভালো লাগে। তা আবার চিনির চা নয়, গুড়ের। ভাঁড়ের, গুড়ের আর চায়ের মিশ্র গন্ধটুকুর মতো আর কিছুই নয়। শুধু দুধটুকু একটু ঘন হওয়া দরকার। আর একটু পোড়া!

বালীগঞ্জ ময়দানে তখন বেশ লোক হয়েছে। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বাবু আছেন, প্যান্ট-শার্ট পরা সাহেব আছেন; কিন্তু এঁদের মধ্যে একটা মিলও আছে—সবাই বেশ বয়স্ক।

কি একটা অজ্ঞাত কারণে একটি দৃশ্য আজও আমার মানস-পটে আঁকা আছে। একটি শিমুল গাছের গুঁড়িতে বসে এক তন্বী শ্বেতাঙ্গিনী ফ্লাস্ক থেকে ঢেলে চা খাচ্ছেন। তাঁর পরনে ব্রিচেস। একটু আগেই রাইড করছিলেন। এখন হয়তো একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন।

একটু একটু করে সূর্য উঠছে। সূর্যের কিরণ শিশির সিক্ত ঘাসের ডগায় বসে ফড়িংয়ের মতো কাঁপছে। আমি সোজা সামনের দিকে হাঁটতে থাকি। এসব কিছুই পিছনে ফেলে। এত বড় বালীগঞ্জ মাঠটির এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত পৌঁছে যাই। হাঁটতে আমার ভালো লাগে; কিন্তু একটি মাঠের চারপাশে বারবার ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগে না। একই দৃশ্য বারবার দেখলে চোখ দুটির সঙ্গে পা দুটিও ক্লান্ত হয়ে আসে। ভালো লাগে প্রতি মুহূর্তে নতুন দৃশ্য নতুন মুখ।

বালীগঞ্জ ময়দানের বিপুল বটগাছটির ছায়ায় এসে বসে পড়লাম। এই বটগাছটি আমার বড় প্রিয়। বটগাছটির গোড়াটা ইয়া চওড়া। এই গাছটির ভিতরই সুন্দর ঝকঝকে একটি ঘর। সেখানে থাকেন এক দরবেশ। কখনো থাকেন আবার কখনো নিরুদ্দেশ হয়ে যান। কিন্তু তাঁর ঘরটি সবসময়ই ঝকঝকে তকতকে থাকে। কে যে পরিষ্কার করে কেউ জানে না। সবাই বলে, ঐ অরক্ষিত ঘরটির মধ্যেই দরবেশ সাহেবের অনেক ধন-দৌলত পরম অবহেলায় পড়ে থাকে। কিন্তু বাটপাড়ি করতে কেউ সাহস করে না। দরবেশ সাহেবের ধনে লোভ করতে গিয়ে কত লোকের হাত খসে গেছে। কত লোক বজ্রাহত, কত লোক নির্বংশ হয়েছে।

জনশ্রুতি : দরবেশ সাহেবের এই আস্তানা পাহারা দেয় দশ হাত লম্বা এক অজগর সাপ।

সাপের কথা মনে হতেই আমার পৃষ্ঠদেশ কেমন শিরশির করে উঠল। ঠিক তখনি পাশের জৈন মন্দিরে ঘণ্টা পড়তে শুরু করল।

সেখান থেকে উঠে পড়ি। কিন্তু আমার মনে হতে থাকে, থাকবার জন্য এমন একটা আস্তানা মন্দ নয়। সারাদিন কেমন ঝিরঝির করে বাতাস বইতে থাকে।

বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড ধরে হাঁটতে থাকি। প্রমথেশ বড়ুয়ার বাড়ির কাছে। একবার যেন কিসের আশায় দাঁড়িয়ে থাকি, কিন্তু ভগ্নপ্রায় গৃহটি নেহায়েতই পাষাণ। সেখানে কোনো প্রাণী থাকে বলেও মনে হয় না।

তারপর আবার চলতে শুরু করি। মসজিদের পিছনে আর একটি ভগ্নপ্রায় বাড়ি, তাও পিছনে ফেলে চক্রবেড়ে রোডের দিকে এগিয়ে যাই। ল্যান্সডাউন রোড, এলগিন রোড সব পিছনে ফেলে কেবল এগুতে থাকি—রূপালি সিনেমার দিকে।

এই এক নতুন অভ্যাস হয়েছে আমার—ম্যাটিনী শোতে সিনেমা দেখা। অবশ্য পয়সাব অভাবে সবসময় সাধ পুরো করা সম্ভব হয় না। যখনি কোনো নতুন বাংলা ছবি রিলিজ হয়, প্রথম দিনই সেই ছবি দেখা চাই। বিশেষ করে প্রমথেম বড়ুয়া, দুর্গাদাস, উমাশশী আর যমুনা যদি সেই ছবির পাত্র-পাত্রী হয়। তার ওপর যদি থাকে পঙ্কজ মল্লিক আর সায়গলের গান, তাহলে তো কথাই নেই। ক্লাসের বেশির ভাগ ছেলেই অবশ্য সায়গলের ভক্ত। কিন্তু সায়গলের গান আমার অত ভালো লাগে না—গলাটা বড়ই মিহি। তবে হ্যাঁ, পঙ্কজ মল্লিকের গলা আর গান! শুনলে সারা শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে।

একদিনের কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ে। সেদিন ছিল রবিবার, সকাল ন'টা বাজে। গলির মোড়ের চায়ের দোকানে রেডিও বাজছিল। রোজই বাজে, সবসময়েই বাজে। কিন্তু রবিবার সকাল ন'টার কথাই আলাদা—পঞ্চজ মল্লিকের সঙ্গীত শিক্ষার আসর। রেডিওর সামনে কত যে লোকের ভিড়, চায়ের দোকানে একটিও চেয়ার খালি নেই। আমার ভারি ইচ্ছে হতে লাগল, চায়ের দোকানের একটি চেয়ারে বসে আরাম করে গান শুনি; কিন্তু তা আর কি করে হয়। অন্তত এক কাপ চা না কিনলে তো আর বসবার জায়গা পাওয়া যাবে না। এদিকে পকেট তো যথারীতি গড়ের মাঠ।

আমি পথে দাঁড়িয়েই গান শুনছিলাম। একেবারে তন্ময় হয়ে, লুপ্ত-চেতন হয়ে। আমি যেন এ দুনিয়াতেই নেই—চলে গেছি এমন এক দুনিয়ায় যেখানে কেবল সুর আর সুর। হঠাৎ একটা মোটর গাড়ি আমার কানের পাশ দিয়ে ঝাঁ করে বেরিয়ে গেল! একটা হৈ-হৈ শব্দ উঠল। কিন্তু না : সবাই বললো, এ-যাত্রা খুব বেঁচে গেছে।

রেস্টুরেন্টের মালিক অমিয় বাবু বেরিয়ে এসে বললেন :

—এসো খোকা। ভিতরে এসে বোসো। ভগবান খুব বাঁচিয়েছেন। আমার ভারি লজ্জা করছিল। তবু অনেকটা যেন যন্ত্রচালিতের মতোই ভিতরে গিয়ে বসলাম।

অমিয় বাবু আমার জন্য জায়গা করে দিলেন। তারপর চেঁচিযে বললেন :

—পল্টু। আরে ও পল্টু শুনছিস! এদিকে দুটো টোস্ট, একটা মামলেট, আর এক পেয়ালা চা নিয়ে আয়।

এ যে প্রায় রাজভোগ। আমার সারাটা গা ঘেমে উঠল। আমি দরিদ্র ছাত্র মাত্র। পয়সা পাব কোথায়? আর পয়সা যে নেই সে কথা এই এতগুলো লোকের সামনে স্বীকারই-বা করি কেমন করে। অথচ স্বীকার না করেও তো উপায় নেই। এক্ষুণি যে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। তারপর চোরের মতো চারদিক দেখতে দেখতে অমিয় বাবুর টেবিলের কাছে এগিয়ে এলাম।

—আমার পয়সা নেই।

—পয়সা নেই তো কি হয়েছে।

অমিয় বাবু এত জোরে কথাগুলো বললেন যে সবাই আমাদের দিকে ফিরে দেখল।

অমিয় বাবু বলেই গেলেন, তেমনি জোরে :

—পয়সা নেই তো কি হয়েছে। তুমি পাড়ার ছেলে। পালিয়ে তো যাবে না। তাছাড়া তোমার মেজ ভাই আমার রেগুলার কাস্টোমার। যখন হবে দেবে।

আমার লজ্জা বরং বেড়েই যায়। এতগুলো লোক, সবাই কি ভাবছেন। আমার এই এক ভয়। আমার সবসময়ই কেবল মনে হতে থাকে, সকলেই যেন আমাকে দেখছেন! বিশেষ করে কোনো হাস্যকর বা লজ্জাকর পরিস্থিতিতে আমি যখন জড়িয়ে পড়ি, তখন আরো বেশি করে

এই ভয় পেয়ে বসে। আমি কি বলি, কি করি, কিভাবে হাঁটি দুনিয়াসুদ্ধ লোক সব কাজ ফেলে যেন তাই দেখছেন, তাই শুনছেন। এই ভাবনার দরুন পায়ে পা যায় জড়িয়ে, কথায় কথা যায় জড়িয়ে, দৃষ্টি অপরাধীর মতো সঙ্কুচিত হয়ে আসে।

রূপালি সিনেমার সাড়ে চার আনার কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আমি এতসব কথা ভাবছিলাম। আমি 'কিউর' একেবারে পিছনে দাঁড়িয়েছিলাম। কখন যে একেবারে সামনে পৌঁছে গেছি খেয়ালও করি নি। টিকিট করে বেরিয়ে আসছি এমন সময় পাশ থেকে কে ডাকল :

—শাকের!

সলিল!

—চল্। টালীগঞ্জ যাবি। আজ এগারোটার সময় শুটিং আছে, দেখে আসি!

সলিল এক বিখ্যাত চিত্রাভিনেতার কি রকম যেন আত্মীয় হয়। এই কারণে ক্লাসসুদ্ধ সবাই তাকে খাতিরও করে খুব। সলিলকে দেখলে আমারো চোখ কেমন যেন স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে আসে। মোহভরা চোখে সলিলকে দেখতে থাকি। সলিলকে তো নয়, সলিলকে উপলক্ষ করে কল্পনা চিত্রলোকের স্টুডিওর চারপাশে ঘুরে বেড়ায়।

একটু ইতস্তত করে আমি সলিলের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাই। সেদিন বাড়ি ফিরে আসতে অনেক দেরি হয়ে যায়। টালীগঞ্জ থেকে ফিরবার পথে যখন ট্রামে উঠলাম তখন দুটো বেজে গেছে। সলিল থাকে কালিঘাটে। সেদিন বাড়ি ফিরে না এসে দুপুরের খাওয়াটা সলিলদের বাড়িতেই সেরে নিই। এই উপলক্ষে একটা মজার অভিজ্ঞতা হয়।

সলিলই প্রস্তাব করে :

—শাকের, তুই আজ দুপুরে আমাদের বাসাতেই খেয়ে নে। নইলে তিনটায় আবার সিনেমায় পৌঁছতে পারবি না।

সেদিন তো অনেক রকম অসম সাহসিকতাই করেছি, আর একটা করতে রাজি হয়ে যাই।

সলিল একটু লজ্জিত হয়ে, একটু যেন ইতস্তত করে, একটু গলা পরিষ্কার করে নিয়ে পুনশ্চ বললো :

—এই শোন্! মাকে বলব তুই আমার ক্লাস-ফ্রেন্ড।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। ক্লাস-ফ্রেন্ড তাতে কি আর সলিলের সন্দেহ আছে না কি! বস্তুত আমি ক্লাস সিক্সে ভর্তি হবার পর থেকে এই ক্লাস নাইন পর্যন্ত সলিল একবারও ফেল করে নি। সলিল নিজেই বলে, আমার না কি খুব পয় আছে। অতএব তার এই ভূমিকায় আমি স্বভাবতই আশ্চর্য হই।

এইবার সলিল আসল কথাটি পাড়ল।

—আর শোন্। বলব তুই হিন্দু। তোর নাম অম্বিকা। মা খুব গোঁড়া কিনা। নইলে এক সঙ্গে খেতে দেবে না। কোনোই অসুবিধা হবে না। তুই তো দেখতেও হিন্দুর মতো। কে বলবে বাঙালি নোস।

—আমি বাঙালি নই কি রে!

—বাঃ! তুই তো মুসলমান!

সলিল ছাত্র মোটেই ভালো নয়। তবু ক্লাসের সবাই তার বন্ধু হতে চায়। সলিলই এড়িয়ে চলে। অথচ সেই সলিলই উপযাচক হয়ে আমার সাথে ভাব করতে চায়। এতে কে না গর্ববোধ করবে।

কিন্তু আমার নাম অম্বিকা? এ তো ভারি মজা!

সেদিনকার খাওয়াটা কিন্তু হয় দিব্যি। লুচি, আলুর দম, পায়েস, আরো কত কি!

নির্বিঘ্নে খাওয়া শেষ হলে আমরা বেরিয়ে আসি। পানের দোকান থেকে দু'খিলি পান আর একটা পাসিং শো সিগারেট কিনে নিয়ে সলিল হো-হো করে হেসে উঠল।

—মা যদি কোনোদিন জানতে পারে তো বেচারীকে গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। সলিলের হাসি আর থামে না। এক সময় সলিল গম্ভীর হয়ে বলে :

—তুই কাপড় পরিস না কেন রে?

কাপড় পরি না! আমি আবার অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি।

—দূর গাধা কোথাকার। কাপড় কাকে বলে তাও জানিস না। আমি কি পরে আছি?

—কেন, ধুতি!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ ধুতি। ধুতিকেই কাপড় বলে। তুইও পরবি। বেশ মানাবে।

আমার হাফ প্যান্ট তাহলে কাপড় নয়। মফিজের পাজামাও কাপড় নয়।

সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে সলিল আরো একবার হো-হো করে হেসে উঠল।

সলিলের হাসি আমাব একটুও ভালো লাগল না। মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল!

বারো

একেবারে অন্ধকার হয়ে গেছে। বাড়ি থেকে বেরিয়েছি গতকাল বিকেলবেলা, আর ফিরছি আজ রাত্রে। গতরাত্রে বাইরেই থাকব, আম্মাকে অবশ্য সে নোটিশ দেয়া ছিল; কিন্তু সে নোটিশে আজ সারাদিনের গতিবিধির কোনো ব্যাখ্যা নেই।

বেশ দূর থেকে আমাদেব বাড়িটা দেখা যায়। বাড়িটা চোখে পড়তেই বুকটা ধড়াস করে উঠল। যতক্ষণ চোখের আড়ালে ছিল, বিপদও যেন দূরে ছিল; কিন্তু এবার একেবারে বিপদের মুখোমুখি। আর তো এড়ানো যাবে না। আমাদের বাড়ির ঠিক সামনের ল্যাম্পপোস্টটিতে এরই মধ্যে আলো জ্বলেছে। বাইরের বারান্দাটাও এবার দেখা যাচ্ছে। বারান্দায় একটা ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার পা আর অগ্রসর হতে অস্বীকার করে। দূর থেকে আমাকে দেখে ছায়াটাও স্থির হয়ে গেল।

আমি তবু ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম।

বারান্দার বেলিং ধরে আম্মা দাঁড়িয়ে আছেন।

সিঁড়ি দিয়ে বারান্দার ওপর উঠে এলাম, তারপর বারান্দার এক কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম। উদ্যোগী হয়ে কোনো কৈফিয়ত দেয়ার প্রয়োজন হবে না জানতাম : তাই নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

—কোথায় ছিলি দু'দিন?

আমি জবাব তৈরি রেখেছিলাম। সবিস্তারে প্রশ্নটির জবাব দেয়ার উদ্যোগ করছি, এমন সময় আম্মা দু'হাত দিয়ে ইশারা করে আমাকে থামিয়ে দিলেন।

—চুপ চুপ। গোল করিস না। যা শিগগির হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় বদলে তৈরি হয়ে নে। তোর আব্বা এসেছেন।

—আব্বা এসেছেন!

বিপদ আশঙ্কা করছিলাম আম্মার কাছ থেকে; কিন্তু এ-যে একেবারে অপ্রত্যাশিত আর এক

দিক থেকে বিপদ উপস্থিত। মনে মনে যত ভয়ই থাক, এ কথাও ভালো করেই জানতাম, চোখে কোনোমতে একবার অশ্রু টেনে আনতে পারলেই, আম্মার রাগ যাবে নিভে; কিন্তু আব্বার কথাই আলাদা। একে তো তিনি কলকাতায় আসেন কম। রাগ করেন আরো কম; কিন্তু একবার যদি তিনি রাগ করেন তো আর রক্ষে নেই। তখন প্রায় কেয়ামত হয়ে যায়।

সারাদিন বাইরে কাটিয়ে বাড়ি ফিরছি, এদিকে কোথা থেকে আব্বা হাজির। আমার ধড়ে তখন প্রাণ নেই।

অথচ আম্মার কাছ থেকে যে বিপদ আশঙ্কা করছিলাম, তার কিছুই দেখলাম না। বরং মনে হলো, আমার ভয় দেখে আম্মা কিছুটা কৌতুকই বোধ করছেন। আম্মার মেজাজ আশ্চর্য রকম প্রসন্ন। তাঁর মুখের হাসি এক দুর্লভ বস্তু; অথচ আজ তাঁর সারা মুখচোখ হাসছে।

—হয়েছে, বীরপুরুষ হয়েছে। পড়তে বসগে যা। উনি একটু আগেই এসেছেন।

আব্বা এসেছেন বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছিল। হাওয়ায় জবাকুসুম তেলের গন্ধ; আম্মা রান্নাঘরে ব্যস্ত; মেজ ভাইয়ের সদাই মুখরিত কণ্ঠ আজ স্তব্ধ। সবগুলো লক্ষণই একটি কথাই ঘোষণা করছে, বাড়িতে কর্তা আছেন।

তেরো

পরদিন খুব ভোরে একটা গোলমাল শুনতে পেলাম: ঘুম গেল ভেঙে। এমন সময় সমস্ত বাড়িটাকে প্রকম্পিত করে আব্বার আওয়াজ ভেসে এলো :-র-ম-জা-ন!

এই ডাকটির সঙ্গে রমজান অত্যন্ত পরিচিত। কেয়ামতের দিনে ইসরাফিলের সিঙাকেও বুঝি সে এত ভয় করবে না। বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে সে আব্বার সামনে এসে দাঁড়ালো।

আব্বার ক্ষুদ্র চোখ দুটি তখন জ্বলজ্বল করছে; রাগে পা টলছে; সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। খোঁচা খোঁচা দাড়িতে পরিপূর্ণ মুখের অভিব্যক্তি আরো ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে। তাঁর সেই মূর্তির সামনে আসতে অতি বড় সাহসীরও বুক কাঁপবে।

—হারামজাদা, মুরগি কোথায়?

—জি আমি তো জানি না।

এই নেতিবাচক জবাব আব্বার পছন্দ হলো না।

—জি আমি তো জানি না! ব্যাটা ন্যাকা।

আব্বার দৃষ্টি রুক্ষ থেকে হয় রুক্ষতর; পেশিগুলো দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর। গত রাত্রেই এই মুরগিটি কেনা হয়েছে। বহু কষ্টের সঞ্চিত উদ্বৃত্ত থেকে এই মুরগিটি কেনা হয়েছে। আব্বা এসেছেন, সাদা কোর্মা রান্না করা হবে। সেই মুরগিটিই সকালবেলা কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। গোলমাল করে আব্বা বাড়ি মাথায় তুললেন। শেষ পর্যন্ত স্থির করলেন জীবটির অন্তর্ধানের সঙ্গে নিশ্চয়ই রমজানের কোনো যোগাযোগ আছে।

রমজান আমাদের বাড়ির ভৃত্য। যাকে কন্দর্প বলে, হতভাগা দেখতে তেমন কিছু নয়। রমজানের কদম-ছাঁট কেশগুচ্ছ ওপরের দিকে সাঁড়াশির মতো তোলা: কেশ থেকে অনবরত বহুদিনের পচা মাংসের গন্ধ বের হয়; চোখ দুটি কোটরের মধ্যে এত বেশি ঢোকা যে, আছে

কি নেই তাও ঠাহর করে দেখতে হয়।

আব্বার জেরার সম্মুখীন হয়ে রমজান ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে।

—কোথায় উঁ? কোথায়?

রমজান নিরুত্তর দাঁড়িয়ে থাকে। আব্বা তাঁর নীরবতাকে অপরাধের স্বীকারোক্তি বলে ধরে নেন।

এবার এক প্রবল চপেটাঘাতে রমজান ঘুরে পড়ল।

আমি বড্ড দমে গেলাম। সুপ্রভাতে দিনটি শুরু হলো বলা চলে না। আব্বা যে কটি দিন কলকাতায় থাকবেন, সে কটি দিন আমাকে বাড়িতেই থাকতে হবে। সারাটা দিন বাড়িতে থাকা আমার পক্ষে কম বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা নয়। তাছাড়া আব্বার মেজাজ কখন কেমন থাকে, আগে থেকে কেউ বলতে পারে না। সবচাইতে মুশকিল, কিসে যে তিনি প্রসন্ন হন আর কিসে রুষ্ট, তা পূর্বাহ্নে অনুমান করা অসাধ্য।

আজকের দিনটি যে খুব সুদিন হবে না সেটা অন্তত অবধারিত। সারাটা দিন যে কিভাবে কাটবে সেই কথা মনে করে আম্মার পিছনে পিছনে ছায়ার মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

চারপাশে শাক-সবজি, আলু, মাছ আর তারই মাঝখানে বসে আম্মা বঁটি দিয়ে পটল কাটছিলেন! আমিও সেখানেই বসে পড়লাম।

—আব্বার রাগ খুব বেশি, তাই না?

আম্মা এবার মুখ তুললেন। আম্মা আজ খুব সকাল সকাল গা ধুয়ে সারাদিনের জন্য তৈরি হয়ে নিয়েছেন। একটা ধোপার ধোয়া শাড়িও পরেছেন। গত সন্ধ্যায় তাঁর মুখে যে হাসি দেখি, এখনো তা অপরিম্লান আছে। আম্মাকে যেন আজ এক দৃষ্টিতে দেখলাম। এতদিন আমার ধারণা ছিল আম্মা বুঝি দেখতে ভালো নয়। মুশতাকের আম্মা আর নিজের আম্মাকে কল্পনায় পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে একটা তুলনামূলক বিচারও করে নিয়েছি। এই বাজিতেও আমি মনে মনে মুশতাকের জিত মেনে নিয়েছি। সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে আমি বরাবর কেবল এই মোনাজাতই করেছি, মুশতাক বা সেলিনা বা তাদের মা যেন কোনোদিন আমাদের বাড়ি না আসে; আমার আম্মাকে পরীক্ষকের দৃষ্টিতে দেখবার সুযোগ যেন তাদের কোনোদিনই না হয়।

কিন্তু এই মুহূর্তে এক অভাবিত আবিষ্কারে আমার মন যুগপৎ বিস্ময়ে ও আনন্দে ভরে গেল। কে বলে আম্মা দেখতে ভালো নয়। এই মুহূর্তে মুশতাকের আম্মা একবার দেখে গেলে পারতেন।

আম্মা বঁটির ওপর থেকে মুখ তুললেন। তারপর কতকটা যেন আনমনেই বলে গেলেন :

—ওঁর মেজাজ! এখন আছে তো এখন নেই।

—আচ্ছা আম্মা! তুমি রোজ ফর্সা জামা-কাপড় পর না কেন?

আম্মা যেন হঠাৎ বিব্রত হয়ে পড়লেন। তারপর কতকটা সামলে নিয়ে বললেন :

—তুই যখন রোজগার করে এনে দিবি, তখন দেখবি রোজ ফর্সা জামা-কাপড় পরব।

সে কথায় আমি কান দিই না। পুনশ্চ বলি :

—মুশতাকের আম্মা সবসময় কেমন ফিটফাট থাকেন।

আম্মার মুখ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল! সে এক মুহূর্ত মাত্র। তারপর হাঁটুর ওপর চিবুক নাবিয়ে এনে তিনি তাঁর মুখের হাসি গোপন করতে চেষ্টা করলেন।

—মুশতাকের আম্মা যদি তোর আম্মা হতেন, তাহলে তুই খুব খুশি হতিস—তাই না!

—যাঃ। তাই বই কি। তা নয়। কিন্তু...

আমার মুখে আর কোনো কথা যোগালো না। এক নব আবিষ্কারের বিস্ময়ে আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। পরক্ষণেই এক নিদারুণ ধিক্কার বোধে আমি অধোবদন হয়ে গেলাম। বস্তুত এইমাত্র আম্মা যে-কথাটি বললেন, সেই কথাটি ঠিক সেইভাবে কখনোই আমার মনে আসে নি। কিন্তু এখন হঠাৎ কথাটি শুনে আমার মনে হলো, কথাটি যে ঘুণাক্ষরেও মনে আসে নি তা নয়। হঠাৎ এক দুস্তর লজ্জায় মাথাটা আপনা থেকেই নিচু হয়ে গেল।

আম্মা আড় চোখে আমাকে দেখছিলেন। এবার হাসতে হাসতেই বললেন :

—কি রে! মুখে যে কোনো কথা নেই। যা বললাম ঠিক না?

আমি মাথা নিচু করে বসেই থাকলাম। হঠাৎ দু'চোখ প্লাবিত করে অশ্রুর বন্যা নেবে এলো।

আম্মা দু'হাত দিয়ে আমাকে কোলের ওপরে টেনে নিলেন। বললেন :

—আচ্ছা পাগল ছেলে তুই যা হোক।

অনেকক্ষণ কারো মুখে কোনো কথা নেই। এক সময় আমিই বললাম—কিছুতেই কি আর গলা থেকে কথাগুলো বেরুতে চায়। তবু শুরু করলাম :

—সে দিনের সেই দুটি টাকা—

কিছুতেই কথা শেষ করতে পারলাম না।

আম্মা তেমনি হাসতে হাসতেই বললেন :

—তুই থাম তো। বকবক করিসনে। আমার হাতে অনেক কাজ।

বলেই আম্মা উঠে পড়লেন। তক্তার ওপর থেকে একটা মাটির হাঁড়ি নাবিয়ে কি সব নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।

টাকার প্রসঙ্গ যে এখানেই শেষ তা বুঝলাম। সিদ্ধান্ত আমার পক্ষেও কিছুমাত্র অরুচিকর মনে হলো না।

এবার আমিও উঠে পড়লাম।

কিন্তু খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে-ফিরে আবার রান্নাঘরেই এসে উপস্থিত হলাম। বাড়িতে বন্দি হয়ে থাকলে এছাড়া আর উপায়ই-বা কি! আব্বা একটা প্রকাণ্ড ইজি-চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর দুই পাশে দুটি মোড়ার ওপর বড় ভাই আর মেজ ভাই বসে অপেক্ষা করছিলেন।

অপেক্ষা আর কিছুরই নয়।

বহুদিন পর কলকাতা ফিরে এলে আব্বা ছেলেদের কাছে ডেকে এনে তাঁর অবর্তমানকালের যাবতীয় ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শুনতে চান। ইজি-চেয়ারে শুয়ে কখনো বড় ভাইকে একটি প্রশ্ন করেন, আবার কখনো মেজ ভাইকে একটি প্রশ্ন করেন। তাঁরা যে সময়টায় জবাব দিতে থাকেন সেই অবসরে আব্বা চোখ মুদে হুঁকোর নলে টান দিতে থাকেন এবং তারই মাঝে আরো দু'-একটা অতিরিক্ত প্রশ্ন করে জ্ঞাতব্য তথ্যের মধ্যে কোথাও কোনো রন্ধ্র থাকলে তাও পূর্ণ করে নেন।

আজও দেখলাম আব্বার দুই পাশে দুটি মোড়ায় বসে বড় ভাই আর মেজ ভাই তাঁদের জবানবন্দি দিচ্ছিলেন। প্রশ্নোত্তরের সময় বড় ভাইয়ের আচরণ অনেকটা স্বচ্ছন্দ; কিন্তু বেচারা মেজ ভাইয়ের করুণ মুখভাব দেখে আমার চিত্তও আর্দ্র হয়ে উঠল।

আমি আর ওদিকে ভিড়তে সাহস করলাম না। আমাকে অবশ্য কখনোই এই কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় নি; হলে নির্ঘাত ফেল করতাম। কারণ আব্বার সব প্রশ্নের উত্তর

জানা থাকার নয়, আর থাকলেও সে উত্তর আব্বার কাছে কিছুতেই সদুত্তর বলে মনে হতো না। কিন্তু এখন তো আমি বড় হয়েছি। পাছে আমাকে দেখলে তিনি আমাকেও ডাক দেন, সেই ভয়ে আম্মার কাছে নিরাপদ কোণে ফিরে এলাম।

আম্মা জিজ্ঞাসা করেন:

—আবার কি চাস? এখানে ফিরে এলি কেন? যা না তোর আব্বা এসেছেন, তাঁর কাছে গিয়ে একটু বস না। কত খুশি হবেন।

আমি সে কথার কোনো জবাবই দিলাম না। সামনেই একটা মিঠা আলু পড়ে ছিল, তাই নাড়াছাড়া করতে লাগলাম। কিছুকাল নীরবতার পর যখন আমি কথা বললাম, প্রসঙ্গ তখন একেবারেই ভিন্ন।

—আমরা বড় গরিব, তাই না?

—ফের সেই কথা। তুই সবসময় গরিব গরিব করিস কেন রে? কিসে গরিব? তোর আব্বা শুনতে পেলে কত কষ্ট পাবেন জানিস?

আমি আমার পূর্ব উক্তিরই সূত্র ধরে আবার বললাম :

—বাড়িতে সাবান দিয়ে কেচে নিয়েও তো তুমি ফর্সা জামা-কাপড় পরতে পার। তাই কেন কর না?

—কেন আবার। ইচ্ছে করে না তাই।

—ইচ্ছে কেন করে না?

—যা যা পালা। বকাস নে। মার খাবি।

আব্বা যে কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, একেবারেই টের পাই নি। হঠাৎ খুব কাছে থেকেই সিগার আর জবাকুসুম তেলের গন্ধ ভেসে এলো। এ গন্ধ সুগন্ধই যেমন লোবানের গন্ধও সুগন্ধ; কিন্তু কেমন করে যেন মওতের কথা মনে কবিয়ে দেয়। অন্তত আমাকে। আমি কাঠ হয়ে বসে থাকলাম। সকালবেলার রুদ্র মূর্তির কথা মনে পড়ে গেল।

আমি অচৈতন্যের মতো তেমনি মাথা নিচু করে বসে থাকলাম; গলায় শব্দ নেই, শরীরে এতটুকু কম্পন নেই। যেন পাষাণ হয়ে গেছি।

পিছনের ছায়া তেমনি নীরবে সরে গেল। খড়মের আওয়াজ একটু একটু করে দূরে চলে গেল। এইবার আমি মুখ তুললাম।

—ওঁকে দেখে তোরা অমন কাঠ হয়ে যাস কেনরে?

আম্মার কণ্ঠ অত্যন্ত কঠিন।

উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই তিনি উঠে চলে গেলেন।

অপেক্ষা করলেও অবশ্য সেদিন উত্তব দিতে পারতাম না। বাড়ির অভিভাবকের অশেষ স্নেহ শুভেচ্ছা আর কল্যাণ কামনা সত্ত্বেও তাঁকে এড়িয়ে চলার এই যে একটা প্রবণতা, এর ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া সহজ না হলেও, ব্যাখ্যা একটা থাকেই! শৃঙ্খলা বস্তুটি সভ্য জীবনযাত্রার পথে সম্পূর্ণ অপরিহার্য হলেও মানুষের আদিম প্রবৃত্তি বোধ করি বিশৃঙ্খল থাকতেই ভালোবাসে। সকাল হলেই হাতমুখ ধুয়ে নাস্তাপানি খেয়ে পড়তে বসতে হবে এবং রাত ন'টা বাজতেই বিছানায় যেতে হবে এই বাধ্যবাধকতাটুকু মোটেই রুচিকর ঠেকে না। সকাল ন'টা পর্যন্ত ঘুমুতে পারলেই এবং রাত ন'টার পর পড়াশোনা শুরু করতে পারলেই, অন্তত সেই স্বাধীনতাটুকু থাকলেই আমরা যেন খুশি হই। কিন্তু বাড়িতে আব্বা থাকলে সেটি হবার জো নেই। যখন খুশি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব, সারাটি রাত বন্ধুর বাড়িতে কাটিয়ে আসব, রৌদ্র-

দগ্ধ দুপুরে ঘুড়ি-লাটাই নিয়ে ছাতে উঠব, এসব কিছুই হবার উপায় নেই।

অবশ্য অন্য কারণও ছিল।

আমাদের অভিভাবক অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ। এককালে, তাঁর বাপদাদার আমলে, আব্বার সামাজিক মর্যাদা শিখরে ছিল। চতুর্দিক থেকে সকলেই এত সম্মান প্রদর্শন করত যে, সেই অফুরন্ত উপঢৌকনের ফলে সম্মানিত হওয়া তাঁর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এর যে অন্যথা হতে পারে, ব্যতিক্রম ঘটতে পারে সে ছিল তাঁর কাছে অচিন্তনীয়। অথচ একদিন চাকা গেল ঘুরে—দাদার মৃত্যু হলো। আব্বাকে চাকরি নিতে হলো। অপেক্ষা করবার উপায় ছিল না। হাতের কাছে যে চাকরি পাওয়া গেল, হাত পেতে তাই নিতে হলো।

অথচ তাঁর এই পদমর্যাদা তাঁর সামাজিক মর্যাদার সমতুল্য ছিল না। বংশ-পরম্পরায় সঞ্চিত মর্যাদার ভাণ্ডার অপর্যাপ্ত হলেও অফুরন্ত হয় না! একদিন সে ভাণ্ডারও শূন্য হয়। এই পরিবর্তনটুকু কেবল যে মর্মান্তিক তাই নয়, অনেকের পক্ষেই এই পরিবর্তন স্বীকার করে নেয়া সহজও নয় সম্ভবও নয়।

একজন সরকারি কর্মচারী হিসেবে আব্বা তেমন কিছু উচ্চপদস্থ ছিলেন না; কিন্তু তবু একজন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে তাঁর হাতে যে ক্ষমতা ছিল তাও তুচ্ছ নয়। তার চোখের ঈষৎ কম্পনে শত শত অপরাধীর হৃৎকম্প হতো, কলমের এক একটি আঁচড়ের ফলে আসামি মুক্তির নিশ্বাস ফেলত বা কয়েদ হতো। তাই আব্বাব ব্যক্তিত্বে এক প্রকার হাকিমী—নৈর্ব্যক্তিকতা ছিল যা কাছে টানত না, দূরে সরিয়ে দিত। অবশ্য অনেক সময়ই স্ত্রী-পুত্রের সান্নিধ্যে এই নৈর্ব্যক্তিকতার পর্বত সূর্যের সান্নিধ্যে বরফের মতো গলে যেত। সে দৃশ্য দুর্লভ হলেও এবং দুর্লভ বলেই, আমাদের সকলের চোখই সিক্ত করে দিত।

চাকরি জীবনের শেষের দিকে তিনি একটা মহকুমার শাসন ভার পেয়েছিলেন। কিন্তু যেদিন তিনি শাসনভার একজন ইংরেজ আই-সি-এস কর্মচারীকে বুঝিয়ে দিয়ে অবসর ভোগ করতে কলকাতা চলে এলেন, সেদিন তাঁর চোখে পানি। শ্বাসরুদ্ধকর খাটুনির মাঝে মাঝে খোদার কাছে তিনি বরাবরই এই মোনাজাত করেছেন এমনি শান-শওকতের মধ্যেই যেন তাঁর জীবন শেষ হয়। ট্রেন ছাড়বার প্রাক্কালে উর্দিপরা আরদালি, ইউনিফর্ম-পরা কনস্টেবল এবং অন্যান্য অধীন কর্মচারী প্লাটফর্মের ওপর ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। সকলের মুখেই বিদায়বেলার বেদনার ছায়া। আব্বার মুখে রিক্ততার পাণ্ডুরতা। ট্রেন ছেড়ে দিল। আরদালি বললো : হুজুর সালাম। কনস্টেবল দিল স্যালুট।

আব্বার চোখে পানি। সব শেষ। আরদারি সালাম, কনস্টেবলের স্যালুট, সব শেষ। বাকি জীবনটা কি নিয়ে থাকবেন? আদালত নেই. আসামি নেই, মামলা-মোকদ্দমা কিছুই নেই। জীবনটাই যে নিঃশেষ হয়ে গেল।

অবসরপ্রাপ্ত হাকিমকে কেউ আর ভয় করে না। পথের যে-কোনো লোকের একজনের মতোই সাধারণ লোক বলে মনে করে। যে ব্যক্তি পূর্বে দশ হাত দূরে থেকে সালাম করত, এখন পাশ দিয়ে যাবার সময়, পথের ওপর অত্যন্ত ঘটা করে পানের পিক্ ফেলে একবার জিগ্যেস করে :

—কি, মৌলবী সাহেব কেমন আছেন?

নিয়তির এই নিদারুণ পরিহাসকে হাসিমুখে মেনে নিতে পারে ক'জন। বাইরে বিড়ম্বিত হয়ে, অন্দরে বিড়ম্বনার সৃষ্টি করাই অধিকাংশ লোকের অভ্যাস হয়ে যায়। তাদের শক্তির সমারোহ শুরু হয় বাড়িরই লোকজনের ওপর, নির্ভরশীলদের ওপর। তখন বাড়ির কুকুরটি

পর্যন্ত ঘেউ ঘেউ করতে সাহস করে না—টিকটিকিগুলো আওয়াজ করতে ভয় পায়—ঘড়ির টিকটিক শব্দ এক প্রচণ্ড বেয়াদবির মতো মনে হয়।

আব্বা কিন্তু জায়নামাজে বসে খোদাকে ডাকতে থাকেন। এক নীরব নিঃসঙ্গ কোণে নিজের একটি জগৎ সৃষ্টি করে নেন। মাঝে মাঝে সেখানে আম্মাকে ডেকে নিয়ে বিগত দিনের সুখ-দুঃখের কথা আলোচনা করেন।

কিন্তু এ আমি কি করছি।

অনেক পরের কথা অনেক আগেই বলে ফেলছি।

সেদিন বিকেলেই এক কাণ্ড হয়ে গেল।

রমজান এসে খবর দিল :

—ছোটবাবু, আপনার কাছে দোস্ত এসেছে।

—লোক এসেছে? আমার কাছে? বাড়িতে আব্বা থাকতে? কে? কেমন লোক?

—তা জানিনে বাবু। লম্বা পানা দেখতে। দহলিজে বসে সিগ্রেট খাচ্ছে।

সিগ্রেট খাচ্ছে! আমার বন্ধু!

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসি। এসে দেখি সলিল বসে আছে।

—আমার মাসিমা তোদের পাড়াতেই থাকেন। দেখা করতে গিয়েছিলাম। ভাবলাম একবার তোর এখান থেকেও ঘুরে যাই।

আমার মুখ চুন। গলায় রা নেই।

বেশ কিছুটা সময় বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থেকে এক সময় কোনোমতে বললাম :

—তোর সিগারেটটা ফেলে দে না ভাই। এখুনি হয়তো বাবা এসে পড়বেন।

সলিলের পরনে ফিনফিনে ধুতি, আদ্দির পাঞ্জাবি, মাথার মাঝখান থেকে কাটা লম্বা টেরি। হাতে আঙুলের ফাঁকে একটা জ্বলন্ত সিগারেট, যার গন্ধ হয়তো এতক্ষণে অন্দরমহলে আব্বার নাসিকা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

সলিলকে আজ এইভাবে এখানে উপস্থিত দেখে আমার কেবলই মনে হতে লাগল, তার সঙ্গে বন্ধুত্বের কোনো সন্তোষজনক কৈফিয়তই আমি আব্বাকে দিতে পারব না।

সলিল একবার অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো। জানালার ভিতর দিয়ে সিগারেটটাও ছুঁড়ে ফেলে দিল; কিন্তু তারপর পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে দিব্যি গুছিয়ে আরাম করে বসল।

এদিকে আমার হার্ট-প্যালপিটেশন শুরু হয়ে গেছে।

সলিল আর একটিবারও আমার দিকে ভ্রূক্ষেপ করল না। তার দুটি চোখের দৃষ্টি জাহাজের সন্ধানী আলোর মতো কামরাটির চতুর্দিকে কখনো-বা পর্দার ফাঁক দিয়ে অন্দরমহল পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে লাগল। পর্দার ফাঁক দিয়ে ভিতরে যতদূর দেখা যায়, বারবার দেখতে লাগল।

এমন সময় আমার নাকে জবাকুসুম তেল আর সিগারের গন্ধ আবার ভেসে এলো। আমার হৃৎপিণ্ড বুকের ভিতর কাটা ছাগলের মতো আছাড় খেতে লাগল।

সলিল হঠাৎ জিগ্যেস করল :

—তোদের বাসায় কে কে আছে রে?

—আমার মা, বাবা আর ভাইরা।

—তোরা ক'ভাইবোন?

—তিন ভাই শুধু।

—বাস্!

হঠাৎ সলিল উঠে পড়ল।

—চলি। অনেক কাজ আছে। আরো দু'একটি বাড়ি যেতে হবে।

বলেই সে হনহন করে বেরিয়ে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্তে পর্দা তুলে আব্বা ঘরে ঢুকলেন।

—ছেলেটি কে?

—আমার ক্লাস-ফ্রেন্ড।

—ক্লাস-ফ্রেন্ড! হারামজাদা। ইয়ার আর খুঁজে পাও নি।

বলা বাহুল্য, তারপর আমার যে-অভ্যর্থনাটি হলো সেটিকে ঠিক উত্তম পুরুষের উপযোগী বলা যায় না।

দু'তিন দিন পর।

অন্তর্হিত মুরগিটিকে কলাগাছের তলায় মৃতাবস্থায় পাওয়া গেল।

কলাগাছের বাগানে সাপেরও উপদ্রব ছিল। হয়তো সর্পদংশনই মুরগিটির মৃত্যুর কারণ। তার ওপর কুকুর-বিড়ালের নখের আঁচড়ে মুরগিটির সর্বশরীর ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। রক্ত ও পালকশূন্য মৃত মুরগিটি ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ে আছে।

আব্বা বুঝলেন, এ মানুষের কাজ নয়।

রমজান শয়তান হলেও এতটা শয়তান হতে পারে না।

অত্যন্ত মোলায়েম ও অশ্রু ভারাক্রান্ত কণ্ঠে আব্বা ডাক দিলেন :

—রমজান!

এই আহ্বানও রমজানের সুপরিচিত।

—জি হুজুর, যাই।

আব্বা গভীর কণ্ঠে দুঃখ প্রকাশ করে বললেন :

—তোকে মিছিমিছি মেরেছিলাম রে!

তৎক্ষণাৎ মুনিবের পায়ের ধুলো মাথায় ঠেকিয়ে একগাল হেসে রমজান জবাব দিল :

—ছিঃ হুজুর। দুঃখ করবেন না। তার বদলে আর একটি থাপ্পড় মারুন। খোদার কাছে হাজার শুকুর, আপনার মতো মুনিব পেয়েছি।

—নে নে এই দুটো টাকা নে। বায়োস্কোপ দেখবি।

দ্রুতপদে রমজান সেখান থেকে পালালো। অবশ্য তার আগে দ্রুততর হস্তে টাকা দুটি পকেটস্থ করতে ভুল করে নি।

সেদিন দুপুরে আব্বা খেতে বসেছেন।

আম্মা দস্তরখানের সামনে বসে হাত পাখা নাড়ছেন। এক সময় আম্মা বললেন :

—রমজান কি বলছিল জানেন?

মুখের মধ্যে এক লুকমা ভাত পুরতে পুরতে আব্বা জিগ্যেস করেন :

—কি বলছিল?

—বলছিল, আপনি যদি রোজ ওকে একবার করে মার দেন তো ও খুশি হয়।

—সে কি! কেন?

—দুটো করে টাকা বকশিশ পাওয়া যাবে।

—বলেছে! হারামজাদা বলেছে। র-ম-জা-ন!

আম্মা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসি গোপন করলেন।

আজ আব্বা চলে যাচ্ছেন।

বাইরে ফিটন গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কোট-প্যান্ট-হ্যাট পরে আব্বা তৈরি হয়ে নিয়েছেন। ট্রেনের সময় হয়ে এসেছে। বিরাট দেহ, বিশাল ছাতি, প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব; কিন্তু এই মুহূর্তে আব্বাকে আমার চাইতেও অসহায় আর দুর্বল মনে হচ্ছিল। আলনার ওপর থেকে ছড়িটা টেনে নিলেন। তারপর আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন :

—রোদে রোদে ঘুরে বেড়াস্‌নে বাবা। কত রোগা হয়ে গেছিস্‌।

আর কিছু বলতে পারলেন না। কেবল আমার দুই গালের ওপর চুমু খেলেন। কান্নার ঢেউ এসে আমার গলার কাছে আছাড় খেতে লাগল। মনে মনে বারবার বলতে লাগলাম : আমি বাইরে যেতে চাই না, বন্ধুদের বাড়ি রাত কাটাতে চাই না, আমি কিছুই চাই না, কেবল চাই আব্বা বরাবর আমাদের সঙ্গে থাকুন।

এক পা এক পা করে আব্বা দরজাব দিকে এগিয়ে গেলেন। কিছুতেই তাঁর পা উঠতে চায় না। এইবার আবার আমাদের দিকে ফিরে আম্মাকে উদ্দেশ করে বললেন :

—আব্বাসের মা চলি। খোদা হাফেজ। যাই।

আম্মার গলা থেকে অস্ফুটে বেরিয়ে আসে :

—খোদা হাফেজ।

ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। জানালার গরাদ ধরে আমি আর আম্মা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম, জানালার বাইরে শূন্য দৃষ্টি মেলা। যেন ঘোড়ার ক্ষুরের মিলিয়ে যাওয়া শব্দটুকুর দিকেই তাকিয়ে আছি। সেইটুকুই ধরে রাখতে চাই।

চৌদ্দ

একদিনে সাতটা পিরিয়ড। আজকাল ফোর্থ পিরিয়ডের পর আর পড়ায় মন বসে না। মাথা ঘুরতে থাকে। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসে। তার ওপর যা গরম। মাস্টাররাও ভালো করে পড়ান না। তাঁরাও কেমন ঝিমিয়ে পড়েন। হয়তো আমাদের একটা কিছু লিখতে দিয়েই তাঁরা তন্দ্রায় ঝিমুতে থাকেন—মাথাটা বুকের ওপর ঝুলে আসে। ছাত্ররা লিখছে কি না, আর লিখলেও কি লিখছে সে সম্বন্ধে কোনোদিন কোনো কৌতূহলই তাঁরা দেখাতেন না।

এনুয়াল পরীক্ষার আর বেশি দেরি নেই। এইবার ক্লাস নাইন থেকে ক্লাস টেনে উঠব।

ফিফ্‌থ পিরিয়ডে ফার্সি ক্লাস।

মৌলবী সাহেব সেদিন মাথা থেকে টুপিটা খুলে টেবিলের ওপর রাখলেন। তারপর চেয়ারে বসে পড়ে মাথার ওপর একবার হাত বুলিয়ে নিলেন। নোংরা কালো শেরওয়ানির জীর্ণ পকেটের ভিতর শীর্ণ হাতটি গলিয়ে দিয়ে একটি বিকট দুর্গন্ধময় রুমাল বের করলেন। সেই রুমালটি দিয়েই গলার ঘাম মুছলেন। চশমার কাচ দুটি পরিষ্কার করে নিয়ে চশমাটি প্রায় একটি কামানের মতো করে নাকের ওপর বসালেন। তারপর কামানটি আমার প্রতি নিশান করে একটি প্রশ্নবাণ ছুঁড়লেন :

—কি মিঞা পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?

আমি নিরুত্তর।

মৌলবী সাহেবও জবাবের জন্য পীড়াপীড়ি করলেন না। আমার দিকে আর একটিবারও

ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত করলেন না।

বিকেলবেলা। রোদ তখন পড়ন্ত। ক্লাসরুমের ভিতর লম্বা লম্বা ছায়া পড়তে শুরু করেছে। জানালার ভিতর দিয়ে রাস্তায় করপোরেশনের কল দেখা যাচ্ছে। লাইন বেঁধে মেয়েরা কলসি নিয়ে অপেক্ষা করছে। মনে হয় কারো কোনো তাড়া নেই। তারা জানে তার পালা আসতে দেরি আছে, অযথা চঞ্চল হয়ে লাভ নেই। স্থির হয়ে বসে থাকাই ভালো।

তারা দিব্যি বসে পান চিবোচ্ছে, ঘামাচি টিপছে, চুল বাঁধছে—অনেকে কেবল গল্পই করছে। স্কুলের বটগাছটিতে দুটি একটি পাখি যেন ক্লান্ত অবসন্ন উদ্দেশ্যহীন হয়ে বসে আছে। মাঝে মাঝে অলসভাবে ডানা নাড়ছে, ক্বচিৎ-কদাচিৎ এক মুহূর্তের জন্য মুখর হয়ে তাদের অস্তিত্ব প্রকাশ করছে। একটি দাঁড়কাকও অন্যমনস্ক হয়ে ডালের ওপর বসে আছে।

কোথাও কারো কোনো তাড়া নেই, ব্যস্ততা নেই—কারো কিছু করণীয় নেই। সবকিছুরই গতি ঢিমে হয়ে গেছে।

একটা ফেরিঅলা কাটা শশা বিক্রি করছে। কেবল তাকে কেন্দ্র করেই কিছু প্রাণ-চাঞ্চল্য তখনো অবশিষ্ট আছে।

—তোমরা ফেরিঅলাদের কাছ থেকে কাটা খিরা পাপিতা কিনে খাও—পেটের অসুখ করে না?

—জি না স্যার।

লম্বা কালো দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে মৌলবী সাহেব বলেন : বেশ বেশ।

হঠাৎ মৌলবী সাহেবের কি খেয়াল হলো, তিনি পড়া নিতে শুরু করলেন। মফিজ, রাজ্জাক, আবুল পাল-তোলা-নৌকার মতো তরতর করে পড়া বলে গেল, কোথাও এতটুকু বাধল না। চড়ায় ঠেকে গেলাম কেবল আমি।

—কি মিঞা, পড়া বলতে পার না কেন? হিন্দুয়ানি পড়ায় তো শুনি এক নম্বর।

ব্যাপারটা বুঝতে পারি। পণ্ডিত মশাই আমাদের "রামায়ণী কথা" পড়ান। কৈকেয়ীর চরিত্র বিশ্লেষণ করে একটা রচনা লিখে আনতে তিনি গোটা ক্লাসকে বলে দিয়েছিলেন। আমার রচনা সবার চাইতে ভালো হয়েছিল। পণ্ডিত মশাই সেটা ক্লাসে পড়ে শুনিয়েছিলেন।

এবারো চুপ করে থাকি। কোনো জবাব দিই না। কিন্তু মনে মনে অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়ে উঠি। স্কুলের পাঠ্য-তালিকায় যদি 'রামায়ণী কথা' অন্তর্ভুক্ত করা হয়, আর মুসলমানি কোনো কথা অন্তর্ভুক্ত করা না হয়, সে দোষ কি আমার? আর নম্বর বেশি পেয়েছি, সেই কথা? তা নম্বর বেশি কে না পেতে চায়? পরীক্ষায় সকলের সঙ্গে টক্কর তো দিতে হবে।

আমাকে নিরুত্তর দেখেও মৌলবী সাহেব নিরস্ত হলেন না।

—এদিকে এসো তো।

আমি উঠে এগিয়ে যাই।

—তুমি না কি পানিকে জল, আব্বা-আম্মাকে বাবা-মা, বড় ভাইজানকে বড়দা বলে ডাক?

বস্তুত অভিযোগ অস্বীকার করবার উপায় ছিল না। স্কুলের শতকরা পঁচানব্বই জন ছেলে হিন্দু। আমাদের মুখে আব্বা আম্মা ভাইজান এসব সম্বোধন শুনলে তারা সকলেই এমন বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে যে মনে হয় তারা যেন কস্মিনকালেও এমনধারা অসংস্কৃত উক্তি শ্রবণ করে নি। তারা যে নিজেরাই কেবল হতবুদ্ধি হয়ে যায় তাই নয়, তাদের সেই বোবা দৃষ্টি হতবুদ্ধি করেও দেয়। তবে এ-অপরাধে আমি একাই অপরাধী নই। স্কুলের সব কটি মুসলমান ছেলেই সমান দোষী। একশ' জোড়া চোখের বিদ্রূপের মোকাবিলা মাত্র পাঁচজোড়া চোখ কি করে করবে? তাই দেখেছি, মৌলবী সাহেব পর্যন্ত পণ্ডিত মশাইয়ের সঙ্গে যখন বাক্যালাপ

করেন তখন তাঁর জবানও বদলে যায়। তাঁকেই-বা দোষ দেবে কে? স্কুল-গভর্নিং বডির সব কটি সদস্যই হিন্দু। মৌলবী সাহেবের চাকরির মায়া তো আছে।

সুতরাং ফাঁসিতে ঝোলাবার জন্য মৌলবী সাহেব যখন আমাকে একাই বেছে নিলেন তখন তর্ক করতে পারতাম, প্রতিবাদও করতে পারতাম ; কিন্তু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই, সেই অল্প বয়সেই এই জ্ঞানটুকু হয়ে গিয়েছিল।

ঠিক এই সময়টিতেই সামনের বারান্দা থেকে পণ্ডিত মশাইয়ের চটির শব্দ ভেসে এলো। পণ্ডিত মশাই সারাটি স্কুল চক্কর দিয়ে বেড়ান, কোথায় কি অঘটন ঘটছে, তাই তদারক করে বেড়ানো তাঁর কাজ। যেখানেই তাঁর ছায়া পড়ে সেখানেই সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

মৌলবী সাহেবও সেই শব্দ শুনে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

—যাও যাও নিজের জায়গায় যাও।

তারপর সুর করে ফার্সি পড়তে লাগলেন।

আরো একদিনের কথা মনে পড়ে।

মৌলবী সাহেব ক্লাসে ঢুকলেন, মুখটি কেমন মলিন। সোজা চেয়ারের দিকে এসে বসে পড়লেন। তারপর হাঁপাতে লাগলেন। একটু বিশ্রাম নেয়ার পর তাঁর চোখ-মুখে কিছুটা রঙ ফিরে এলো। বুঝতে পারছিলাম ভিতরে ভিতরে তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন! তাঁর উত্তেজনার কারণ কোনোদিনই জানতে পারি নি।

—তোমার কাছে আট আনা পয়সা হবে?

আমার কাছে আট আনা পয়সা থাকবার কথা নয়। কিন্তু সেদিন ছিল। স্কুলের মাইনে দেয়ার পর খুচরা একটি টাকা তখনো আমার কাছে ছিল।

আমি তাড়াতাড়ি আট আনা পয়সা হাতে করে এগিয়ে গিয়ে বলি : জি আছে।

—কাল মনে করে চেয়ে নিও।

তারপর মৌলবী সাহেব হাসানকে ডেকে বললেন : যাও তো মৌলালির মোড় থেকে কাবাব-পরোটা কিনে আন ; আজ সকালে খাওয়া-দাওয়া না করেই বেরিয়ে পড়েছি। বড্ড ভুখ লেগেছে।

—স্যার কাবাব-পরোটা আনলে পণ্ডিত মশাই রাগ করবেন। কাবাব আনতে পারব না।

মৌলবী সাহেব খানিকক্ষণ চুপ থাকলেন। তাঁর চোখ-মুখ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করল; কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্যই।

আশ্চর্য, সেই মুহূর্তেই দরজার কাছে পণ্ডিত মশাইয়ের ছায়া পড়ল। চেয়ার থেকে উঠে পড়ে মৌলবী সাহেব সহাস্য বদনে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন : আসুন, আসুন।

পণ্ডিত মশাই সে-কথার কোনো জবাব দিলেন না। তেমনি নীরবেই চলে গেছেন।

মৌলবী সাহেব চেয়ারের ওপর বসে পড়ে আবার হাঁপাতে লাগলেন। একটু পরে বললেন : যাও, হালুয়া-পুরী নিয়ে এসো।

অন্য সব মাস্টারের মতো, মৌলবী সাহেবও ছাত্রদের এইসব ফুটফরমাশ করতেন। সব ছেলেই তাঁকে অল্পবিস্তর ভয়ও করত।

এক মফিজকে তিনি কখনো কিছু বলতেন না। মফিজ বেশ গম্ভীর চালে বসে বসে গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করত—চিত্রতারকাদের জীবন-কাহিনী।

পরদিন অবশ্য মৌলবী সাহেবের কাছ থেকে আমি পয়সা চেয়ে নিই নি। আমার লজ্জা করছিল। মৌলবী সাহেবও ব্যস্ত মানুষ, ভুলে গিয়েছিলেন।

পনেরো

দেখতে দেখতে কটি বছর কেটে গেল। ক্লাস সিক্স শুরু করে ক্লাস নাইন। আজ আবার এনুয়াল পরীক্ষার ফল বের হবে। ক্লাস নাইন থেকে টেনে উঠব।

ক্লাস ওয়ান থেকে নাইন পর্যন্ত সব ক্লাসের ছেলেরাই বহু আগে থেকে তাদের নির্দিষ্ট ক্লাসে এসে বসে আছে।

অন্যদিন এই সময় স্কুল কেমন সরগরম থাকে। আজ একেবারে চুপ। সকলের চোখমুখই উদ্বিগ্ন প্রত্যাশার ছায়ায় মলিন। সকাল দশটার সময় স্কুল টিচার হরেন বাবুকে সঙ্গে নিয়ে হেডমাস্টার আমাদের ক্লাসে ঢুকলেন। পিছনে হেড পণ্ডিত আর হেড মৌলবী। এতক্ষণ যা-ও-বা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল এখন একেবারে স্তব্ধ।

ছেলেরা সবাই উঠে দাঁড়ালো।

হেডমাস্টার বললেন : বসো।

অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠ।

তাঁর হাতে সবগুলো ক্লাসের প্রগ্রেস রিপোর্ট। হেড পণ্ডিত আর হেড মৌলবীর হাতে সিলেবাস।

হেডমাস্টার বলতে শুরু কররেন : শেখর, তুমি ফার্স্ট হয়েছ।

ক্লাসসুদ্ধ সবাই অবাক। সকলের চেয়ে অবাক শেখর স্বয়ং! গোটা ক্লাসই হতবুদ্ধি হয়ে বসে থাকল! কারো মুখে কোনো কথা নেই।

এমন সময় এক অপ্রত্যাশিত কাণ্ড হলো। বলা নেই কাওয়া নেই সলিল চিৎকার করে উঠল : থ্রি চিয়ার্স ফর শেখর।

আমরা স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকলাম। সলিল সাহসী ছেলে জানতাম; কিন্তু সে যে হেডমাস্টারের উপস্থিতিতেও এ-ধরনের নাটক শুরু করে দিতে পারে তা কোনোদিনই কেউ ভাবে নি।

হেডমাস্টার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। দেখে মনে হলো তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। তারপর হেডমাস্টারের মুখে অল্প একটু হাসি দেখা গেল। তিনি সহাস্যে বললেন : কি হলো তোমাদের? চুপ থাকলে যে।

এর পরের ঘটনা আরো অবিশ্বাস্য।

স্বয়ং হেডমাস্টার সুউচ্চ কণ্ঠে হেঁকে উঠলেন : থ্রি চিয়ার্স ফর শেখর।

এবার আর কেউ কোনো শাসন মানল না।

ক্লাসের শতাধিক ছেলে গগনবিদারি কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল : হিপ হিপ হুর-রে।

যাকে নিয়ে এত উত্তেজনা সে এক কোণে মাথা নিচু করে চুপচাপ বসেছিল। এইবার সে ডুকরে কেঁদে উঠল।

এক নিমেষে ক্লাসসুদ্ধ সবাই চুপ।

হেডমাস্টার এগিয়ে এসে শেখরের মাথায় হাত রেখে বললেন : বি কোয়ায়েট মাই বয়। রাইজ টু দি অকেশন।

শেখর যখন আবার শান্ত হলো তখন হেডমাস্টার বললেন : তুমি রেকর্ড নম্বর পেয়েছ। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় তুমি স্কুলের নাম উজ্জ্বল করবে আমরা তাই আশা করি।

শেখর মাথা নিচু করে হেডমাস্টারের পদধূলি নিয়ে ধীরে ধীরে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেল।

—আবদুস শাকের সেকেন্ড। ইংরজিতে ফার্স্ট হয়েছে।

—কাঞ্জিলাল রায় থার্ড।

হেডমাস্টার আর কোনো মন্তব্য করলেন না।

—বদ্রিনারায়ণ প্রসাদ ফোর্থ।

শিশির ফিফ্‌থ মফিজ টেনথ্‌ সলিল নট-প্রমোটেড।

দীর্ঘ তিন বছর পর সলিল আবার ফেল করল।

সলিলকে সম্বোধন করে হেডমাস্টার বললেন : সলিল এবার তোমাকে প্রমোশন দেয়া সম্ভব হলো না।

—কুছ পরোয়া নেই স্যার। দু'চারবার ফেল করা—সে আমার অভ্যাস আছে।

—আরো একটা কথা বলতে হচ্ছে। তুমি কোনোদিন ম্যাট্রিক পাস করতে পারবে না। তোমাকে এ-স্কুল ছেড়ে চলে যেতে হবে।

সলিল এতটার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

সে আর একটি কথাও বললো না! ক্লাস ছেড়ে চলে গেল। তার কিছু আগে শেখরও বেরিয়ে গেল। তাদের অবস্থায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য। কিন্তু উভয়ের ভঙ্গির মধ্যে কোথায় যেন একটা মিলও ছিল।

সলিলের জন্য আমাদের সকলেরই দুঃখ হলো। ছাত্র সে যেমনই হোক, এতদিনের অভ্যাসের ফলে মনে হয়, সে ক্লাসে না থাকলে ক্লাসই যেন পূর্ণ হলো না। তাছাড়া সে ছিল আমাদের কাছে বহির্বিশ্বের প্রতীক।

পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে অনেকক্ষণ ধরে পোস্ট-মর্টেম চলল। জানা গেল, ক্লাস নাইন আর টেনের বাংলা ও সংস্কৃতের খাতা স্বয়ং পণ্ডিত মশাই দেখেন। তাই এবারের পরীক্ষায় যার যা প্রাপ্য সে তত নম্বরই পেয়েছে। মফিজ আমাকে আর একটি সংবাদ দিল। মৌলবী সাহেব না কি এবারে আমাকে বেশি নম্বর দিয়েছেন। স্কুলের মুসলমান ছেলেরা কোনোদিন পরীক্ষায় ভালো করতে পারে না, পজিশন পায় না, এ তাঁর বহুদিনের দুঃখ। এবারে তাঁর সেই দুঃখ ঘুচল।

এইবার বুঝলাম। আমাকে যখন সেকেন্ড ঘোষণা করা হলো, তখন মৌলবী সাহেবের চোখ দুটি আনন্দে হাসছিল।

মফিজ এবার ঠাট্টা করে বললো : মাত্র আট আনা খরচ করেই তুই বাজিমাত করলি।

মফিজের তামাসা আমার ভালো লাগল না।

ক্লাস টেনের ছেলে আমরা। বেশ বড় হয়ে উঠেছি। শরীরও ধীরে ধীরে প্রায় আমাদের অগোচরেই বেড়ে উঠেছে। গলার আওয়াজ ভারি হয়ে গেছে। পদযুগলে আগের সেই ক্ষিপ্রতা নেই, গতিও কেমন মন্থর হয়ে আসছে। দৃষ্টি থেকে চঞ্চলতা দূর হয়ে যাচ্ছে।

সরস্বতী পূজার জন্য একদিন ছুটি। ছুটির পরদিন স্কুলে গিয়ে সবাই শুনলাম : পণ্ডিত মশাই মারা গেছেন। পণ্ডিত মশাই মারা গেছেন? হ্যাঁ, গতরাত্রে ওলাওঠায় তিন ঘণ্টার মধ্যে মারা গেছেন।

সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

তবু কথাটি যেন কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায় না। মারা গেছেন? পণ্ডিত মশাই? মাত্র পরশুদিনই না তিনি আমাদের কাজী নজরুলের কবিতা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন।

হেডমাস্টার মশাই তাঁর কামরাতে বসে আছেন। সেই যে সকালে এসে নিজের ঘরে ঢুকেছেন, তারপর তাঁকে আর কেউ বেরুতে দেখে নি। তিনি প্রত্যেক ক্লাসে তাঁর একটা ছোট্ট লেখা পাঠিয়ে দিয়েছেন। ক্লাসটিচার সে লেখা প্রত্যেককে পড়ে শোনালেন। পণ্ডিত মশাইয়ের

কাছে এ স্কুল কিভাবে কতদিন ধরে কতটা ঋণী, হেডমাস্টারের বাণীতে সেই কথা। শেষের দিকে হেডমাস্টার বলেছেন :

—"পণ্ডিত মশাই ছিলেন সত্যকার আচার্য। নির্লোভ নিঃস্বার্থ। স্কুলের ছেলেরা ছিল তাঁর প্রাণ। এই স্কুল ছিল তাঁর সাধনার মন্দির। বহু প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁর ডাক এসেছে—উচ্চ পারিশ্রমিকের প্রলোভন। কিন্তু যে স্কুলের সঙ্গে বিশ বছরের সম্পর্ক সেই স্কুলের মায়া তিনি কোনোদিন ছাড়তে পারেন নি।

দেড় হাজার টাকা তাঁর আজীবন সঞ্চয়। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ ইচ্ছা এই ছিল যে, এই টাকা দিয়ে তাঁর স্কুলের ছেলেদের যেন মিষ্টি খাওয়ানো হয়। তাঁর বিধবা স্ত্রী স্কুলের এক হাজার ছেলের জন্য মিষ্টি পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

এইখানেই হেডমাস্টারের বাণী শেষ।

আমরা সকলেই হাতে মিষ্টির মোড়ক নিয়ে স্কুল থেকে বেরিয়ে আসি।

স্কুল আজ ছুটি।

কত কথাই মনে হচ্ছিল। ক্লাস টেনে উঠেছি। সলিল বিদায় নিয়েছে। পণ্ডিত মশাই মারা গেছেন। আস্তে আস্তে স্কুলের সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ হয়ে যাচ্ছে। পিছনে ফেলে আসছি এক বৈচিত্র্যময় জীবন।

এদিকে মিষ্টি খেয়ে গলা গেছে শুকিয়ে। পথের ধারে পানের দোকানে লেমনেড দেখে তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। পকেটে সাড়ে তিন আনা পয়সাও আছে। কিন্তু লেমনেড খেলে চলবে কেন? পার্ক-শো-হাউসে 'অচ্ছুৎ কন্যা' হচ্ছে। আজই ছবিটা দেখতে হবে। একেবারে পর্দার কাছের বেঞ্চির আসনগুলোর দাম দশ পয়সা। একটা দশ পয়সার টিকিট কাটতে হবে। তবু এক আনা পয়সা হাতে থাকে। অন্তত এক খিলি সাঁচি পান কিনে গলাটা ভিজিয়ে নিলে হয়; কিন্তু থাক। জমিয়ে জমিয়ে আর একটা সিনেমা দেখা যাবে।

তন্ময় হয়ে ছবি দেখছি। হঠাৎ পিছন থেকে কে একজন আমার মাথাটা এক পাশে সরিয়ে দিল। ফিরে দেখি, একটি স্ত্রীলোক। মুখভরা পান। কপোল বেয়ে ফুলেল তেল গড়িয়ে পড়ছে-- সেই অন্ধকারেও দেখা যাচ্ছিল। আর মুখশ্রী? সে কথা না বলাই ভালো। কি আর করি; এক পাশে ঘাড় কাত করে ছবি দেখতে লাগলাম। পুরাতন প্রিন্ট। স্থানে স্থানে ঝরঝরে হয়ে গেছে; কিন্তু এত ভালো লাগছে যে ছবিটা দেখবার জন্য যেন এক জোড়া চোখই যথেষ্ট নয়।

আবার বাধা পড়ল।

এবার বিপরীত পার্শ্ব দিয়ে দ্বিতীয় আর একজন মাথাটিকে তার মূল অবস্থানেই ফিরিয়ে দিল।

দেখলাম, তিনিও স্ত্রীলোক, এবং প্রথমোক্তার সখি ও সঙ্গিনী। এ পাশে মাথা রাখলে এঁর এবং ওপাশে মাথা রাখলে ওঁর ছবি দেখতে অসুবিধা হচ্ছে।

যাই হোক, ছবি তবু আমি দেখবই।

একটু পরই এক তৃতীয় ব্যক্তি—স্পর্শ থেকেই অনুমান করলাম ইনি পুরুষ—তাঁর হাত দিয়ে আমার মাথাটি আমারই বুকের ওপর নাবিয়ে দিলেন। বুঝলাম এবার তাঁর দৃষ্টিপথের বিঘ্ন দূর হলো।

এবার আর পশ্চাতে ফিরে দেখলাম না। উঠে পড়লাম। আমার এই সাময়িক প্রতিবেশীত্রয়ের সম্মিলিত হাসি পালের বাতাসের মতোই ধাক্কা দিয়ে আমাকে দরজার বাইরে

নিয়ে এলো।

হলের বাইরে যখন বেরিয়ে আসি, রোদ তখন ঝাঁ-ঝাঁ করছে। আমিও বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। পা আর কিছুতেই উঠতে চায় না। পকেটে এক আনা পয়সাও আছে, ট্রামে উঠে পড়লেই হয়; কিন্তু কতটুকুই আর পথ। এরই জন্য ট্রামে উঠব? ফজুল পয়সা খরচ করতে মন ওঠে না।

ঠিক এই সময়টিতেই একটা ট্রাম এলো। আর কিছু না ভেবে ট্রামে উঠে পড়লাম।

সামনের সিটেই মামা বসে আছেন—আপন মামা, একমাত্র মামা; কিন্তু আমাদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা নেই। তিনি ডিপুটি সাহেব।

কন্ডাক্টর এসে বললো, টিকিট!

আমি আমার বহু কষ্টের আনিটা বের করে দিলাম।

—আর একটা আনি দিন। এটা অচল!

অচল! আর একটা আনি! আর একটি আনি পাব কোথায়?

ট্রামের মধ্যে একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। আজকালকার ছেলেরা কী দ্রুত অধঃপাতে যাচ্ছে, ঠকাবার কত কৌশল আবিষ্কার করেছে, সকলের মুখে সেই আলোচনা।

আমার মন-প্রাণ তখন একটিই মোনাজাত করছিল : হে খোদা আমাকে কোনোমতে অশরীরী করে দাও। তুমি সব পার। আমি আর কোনোদিন তোমার কাছে কিছু চাইব না।

কিন্তু খোদা গোনাহ্‌গারের কথা শুনবেন কেন?

অশরীরী হবার কোনো লক্ষণই যখন দেখলাম না, তখন বড়ই আশা হতে লাগল, মামু নিশ্চয়ই পয়সাটা দিয়ে দেবেন।

মামু কিন্তু ফিরেও তাকালেন না। সোজা নাক বরাবর তাঁর দৃষ্টি—জানালার বাইরে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত।

কন্ডাক্টর ঘাড় ধরে আমাকে নাবিয়ে দিল।

পথের ওপর নেবে এলাম। ট্রাম চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল; কিন্তু এতক্ষণ যা দেখি নি, এইবার তাই চোখে পড়ল।

একদম সামনের আসনে বসে আছে সেলিনা!

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা মামু টহল দিতে দিতে আমাদের বাড়ি উপস্থিত হলেন।

সোজা আম্মার কাছে এসে একটা মোড়া টেনে বসলেন।

কোনোরকম ভূমিকা না করেই বলে গেলেন : তোমার ছেলেদের চালচলনের জন্য আমরা যে বাস্তায় মুখ দেখাতে পারি না।

—কেন? কি হলো।

মামু যে কি বলে গেলেন তার সবটা আমার কানেও গেল না। টোস্ট, অমলেট আর দু'কাপ চা খেয়ে মামু বিদায় নিলেন।

মামু চলে যাওয়ার পর আম্মা আমার কাছ থেকে ব্যাপারটা সবিস্তারে জানতে চাইলেন। আমি বললাম।

আম্মা আর কিছু বললেন না।

কেবল একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন।

ষোলো

মামাবাড়ির সাথে এই উপন্যাসের নায়কের পরিবারের সম্পর্ক সঠিকমতো বুঝতে হলে এইখানে একবার পিছনের দিকে ফিরে দেখা আবশ্যক। এইখানে যে আখ্যায়িকার অবতারণা করতে চলেছি তা-ও লোকমুখেই শোনা। তবে ঘটনাগুলোকে এই উপন্যাসের প্রয়োজন অনুসারে সাজিয়ে-গুছিয়ে নিতে হয়েছে।

আজ থেকে দুই পুরুষ আগেকার জামানায় আমাদের ফিরে আসতে হবে।

তেত্রিশ নম্বর কোমেদান বাগান লেনে তখন খান বাহাদুর আবদুস সানী সাহেবের বাস। তিনি কলকাতা পুলিশের এ্যাসিসটেন্ট কমিশনার। সেই বৃটিশ আমলের এ্যাসিসটেন্ট কমিশনার, বাঙালিদের মধ্যে প্রথম। যেমন তাঁর দাপট তেমনি প্রতাপ, তেমনি নামডাক।

সেই জামানায় কলকাতার রেড রোড ছিল শ্বেতাঙ্গদের খাস এলাকা। 'আউট অফ্ বাউন্ডস টু ইন্ডিয়ান্স!' শ্বেতাঙ্গ ছাড়া প্রবেশ নিষেধ, বিশেষ করে সন্ধ্যার পর।

একদিন সন্ধ্যায় ফোর্ট উইলিয়ম থেকে সাড়ে ছ'ফিট লম্বা আর বিয়াল্লিশ ইঞ্চি চওড়া একটি লোক ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেরিয়ে এলো—সে সাহেব নয়।

অথচ কে বলবে সাহেব নয়।

ঘোড়সওয়ার আস্তে আস্তে রেড রোডের দিকে এগিয়ে এলো।

পাশের ময়দানে তখন বহু বাঙালি হাওয়া খাচ্ছিলেন। ঘোড়সওয়ার তাঁদের অনেকেরই পরিচিত। কিন্তু রেড রোডের দিকে যায় যে' পাশের লোকেরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এখুনি না জানি কি ঘটবে। রেড রোডে পা দেয়ার অপরাধে বহু বাঙালিকে পিঠের ছাল রেখে আসতে হয়েছে।

ঘোড়সওয়ার অকম্পিত, বেপরোয়া—সন্ধ্যার হাওয়ায় তার বুকটা আরো ফুলে ফুলে উঠেছে।

ঠিক সেই সময় এক বাঙালি সন্তানের কাতর চিৎকারে সন্ধ্যার বাতাস কেঁপে উঠল। শ্বেতাঙ্গদের নির্যাতন।

ঘোড়সওয়ার রাশ টেনে ধরল!

আর্তনাদ অনুসরণ করে তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল, লুঙ্গি পরা এক যুবকের ওপর। ভাবলেশহীন মুখে ঘোড়সওয়াব নাবল।

—হ্যান্ডস অফ দি ম্যান।

—হোয়াই? উই থট ইউ ওয়ার এন ইংলিশম্যান!

—মাই নেম ইজ সানী। সন অফ আবদুল গফফার। ডাজ দ্যাট কনভে এনিথিং টু ইউ?

—সন অফ এ বিচ। দ্যাট কনভেজ দিজ।

এই বলে একজন হান্টার তুলল। হান্টার তাব হাতেই থাকল, আবদুস সানী সাহেবটিকে ছোট ছেলের মতো দুই হাতে তুলে আছাড় দিলেন। রেড রোড সেই প্রথম শ্বেতাঙ্গের রক্তে লাল হলো।

সানী জিগ্যেস করলেন : আর ইউ হার্ট? নিড্ এনি হেল্প্?

সাহেব নিরুত্তর।

সানী লুঙ্গি-পরা ছেলেটিকে ঘোড়ায় তুলে নিলেন।

ততক্ষণে আশেপাশে লোক জড়ো হয়েছে। অবশ্য রেড রোডের সরহদ্দের বাইরেই সতর্ক সমাবেশ!

একজন বললেন : এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি। কেন বাবু, এত রাস্তা থাকতে রেড রোড দিয়েই চলতে হবে, এটা কেমন গোঁ!

আর একজন : তা বটে। সাহেবরা একটা নিয়ম করেছে, তো মানলে ক্ষতি কি। কথায় কথায় নিয়মভঙ্গ করলে শাসনকার্য চলে না।

তৃতীয় জন : খান বাহাদুর ধরে পিটেছে, বেশ করেছে। নিয়ম একটা করলেই হলো! হাইকোর্ট আছে না!

সানী কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করলেন না। আবার ঘোড়ার পিঠে উঠে তেমনি অবিচলিতভাবে এগিয়ে গেলেন।

জনতাও এই বলে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল :

—চলো হে চলো। সাহেবটা লাশের মতো পড়ে আছে। আবার কোন ফ্যাসাদে পড়ব।

প্রহৃত ছেলেটির নাম হাবিব। দেশ বর্ধমান। কলকাতায় এসেছিল ভাগ্যান্বেষণে। তার পরই এই বিপত্তি।

হাবিবের জন্য সানী একটি কামরা ছেড়ে দিলেন। হগস্ মার্কেটে গিয়ে তার জন্য কাপড় কিনে আনলেন। অন্দরে বিশেষ করে বলে দিলেন হাবিবের খাওয়া-পরার কোনো কষ্ট যেন না হয়। তারপর হাবিবকে ক্যালকাটা মাদ্রাসায় ভর্তি করে দিলেন।

হাবিব অল্পকালের মধ্যেই ক্যালকাটা মাদ্রাসা থেকে ম্যাট্রিক এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই.এ, বি.এ পাস করলেন। তাঁর কপাল ভালো, নমিনেশনে ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে গেলেন।

তখন আব্বার বয়স দশ-এগারো। ব্রুহামে চড়ে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পড়তে যান। সাহেবদের বাচ্চার মতোই সাজ-পোশাক, টানা টানা চোখ-মুখ।

তারপর হাবিব বিয়ে করলেন, বর্ধমানের এক জমিদার-কন্যাকে। বিয়েব পরই সস্ত্রীক চলে যান নওগাঁ কর্মস্থলে।

সানী সাহেবের তখন বয়স হয়েছে, দুই ছেলের ভবিষ্যৎ চিন্তায় শরীরও ভেঙে পড়েছে। হাবিব লেখাপড়া করেন, কলেজ যাতায়াত করেন, এসব খবরই সানী সাহেব রাখেন। কিন্তু এর বেশি কোনো সম্পর্ক হাবিবের সঙ্গে থাকে না। তিনি নামাজ-রোজা আর মেহমানদের আপ্যায়ন নিয়েই থাকেন।

হাবিব ডিপুটি হয়ে বিয়ে করলেন; কিন্তু কনে নির্বাচনের ব্যাপারে সানী সাহেবের সঙ্গে কোনো পবামর্শই করলেন না। সানী সাহেবও কোনো কৌতূহল প্রকাশ করলেন না। বিয়ের উদ্যোগ চলতে থাকে; কিন্তু এক পাশের একটি কামরা থেকে হুঁকো টানার শব্দ ছাড়া সানী সাহেবের কাছ থেকে আর কোনো সাড়া আসে না।

বৌয়ের জন্য গহনা গড়িয়ে দিলেন, বরের বিয়ের পোশাকও কিছু কিছু তৈরি করে দিলেন—এমনকি দেনমোহর কত হওয়া উচিত তা-ও ঠিক করে দিলেন; কিন্তু তার বেশি না।

বরযাত্রী হয়ে নওশার সঙ্গে বর্ধমানও গেলেন না।

কোনো কোনো বন্ধু-বান্ধব হয়তো কখনো-সখনো হাবিবের আচরণের নিন্দা করে কিছু বলেন। সানী সাহেব একটা লম্বা ইজি চেয়ারে তাঁর বিরাট শরীর এলিয়ে দিয়ে একটু উদাস হয়ে বসে থাকেন। সে সম্বন্ধে কোনোই মন্তব্য করেন না।

বছরখানেক বাদেই খবর পাওয়া গেল হাবিবের একটি মেয়ে হয়েছে। হাবিব একটি পোস্ট-কার্ডে দু'ছত্র লিখে সানী সাহেবকে খবর পাঠালেন। বহুদিন পর সানী সাহেবের মুখে

হাসি দেখা গেল।

তিনি স্ত্রীকে বললেন : মেয়েটি খুশনসিব। এই শুনে রাখো আমার কথা।

সানী সাহেব ও খদিজা বিবি হাবিব-কন্যার জন্য গহনা, কাপড় আর খেলনা পাঠিয়ে দিলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই হাবিব আলিপুরের সদর এসডিও হয়ে বদলি হয়ে এলেন।

হাবিব স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে আসবে, সানী সাহেব রোজ সেই আশায় বসে থাকেন।

কিন্তু হাবিব এলেন না।

মাস চারেক বাদে একটা ঘোড়ার গাড়ি তেত্রিশ নম্বর কোমেদান বাগান লেনের ফটকে এসে থামল!

গাড়ি থেকে নাবলেন আলিপুরের এসডিও সাহেব। পরনে কোট-প্যান্ট, এক হাতে একটা ছোট সুটকেস, ঠোঁটের ফাঁকে একটা সিগারেট। সোজা ওপরে উঠে গেলেন। তার আগে সিগারেটটা ফেলে দিলেন।

খান বাহাদুর সাহেব ইজি চেয়ারে শুয়ে একটা বই পড়ছিলেন। মুখে হুঁকোর নল।

হাবিব কদমবুসি করে এক পাশে দাঁড়ালেন।

তাঁর দাঁড়াবার ভঙ্গিটুকুর মধ্যে এক অব্যক্ত কাঠিন্য, এক অনুচ্চারিত ঔদ্ধত্য।

ঘরের ভিতরে বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। বিকেলের সূর্যের আলো বইয়ের আলমারির পিছনেই লুটিয়ে পড়েছে। কামরার ভিতর হুঁকোর তামাক, জীর্ণ বই আর জবাকুসুম তেলের মিশ্র গন্ধ।

সানী সাহেব পাশের চেয়ার দেখিয়ে বললেন, বোসো।

এই বিরাট বিপুল বলিষ্ঠ লোকটির নিকট-সংস্পর্শে হাবিব কতদিন কতবার এসেছেন। কোনোদিন বেশি কথা বলেন নি! বলবার প্রয়োজন হয় নি। বলতে সাহসও করেন নি।

জানালার কাছে সূর্যাস্তের আলোয় আজ তাঁকে ইজি-চেয়ারে শায়িত দেখে, হাবিবের মনে হলো, অতীতের ভয়-ভীতি কতই না অর্থহীন। এই প্রৌঢ়ের কাছে তাঁর ঋণবাধের কল্পনা বাস্তবকে কত দূর ছাড়িয়ে গেছে! তিনি বরাবর স্কলারশিপ পেয়েছেন, কলেজে মাইনে লাগে নি। হ্যাঁ দুটি খেয়েছেন, পরেছেন, বই-পত্তরের জন্য যখন যা দরকার হয়েছে, পেয়েছেন।

পর্দার পিছনে খদিজা বিবির ছায়া পড়ল।

নেপথ্য থেকেই তিনি বললেন : হাবিবকে নাস্তা করে যেতে বলবেন!

সানী সাহেব হেসে বললেন : শুনলে তো। খেয়ে যেও। হাবিব সানী সাহেবকে কোনো দিন এভাবে হাসতে দেখেন নি।

সানী সাহেব আবার চোখ বন্ধ করে ইজি-চেয়ারে তেমনি শুয়ে থাকলেন!

একবার জিগ্যেস করলেন না, হাবিব এতদিন আসেন নি কেন: আর আজ এলেনই যদি স্ত্রী-কন্যাকে একবার আনলেন না কেন!

ঘরের ভিতর সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে এলো।

—জি না। খেয়ে যেতে পারব না। একটু কাজে এসেছিলাম।

সানী সাহেব দ্বিতীয়বার অনুরোধ করলেন না। সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁর মুখভাব গোপন থাকল।

ক্লান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন : কি কাজ?

—এই ক'টা জিনিস রেখে দিন।

এই বলে হাবিব সুটকেসটা এগিয়ে দিলেন।

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ-মাত্র না করে সানী সাহেব পুনশ্চ জিগ্যেস করলেন : কি জিনিস!

তাঁর গলার আওয়াজ একটু চড়ল।

—এই সুটকেসে কিছু গহনা আর দু'হাজার টাকা আছে। আপনার কাছে আমি ঋণী, তাই—

—তাই দেনা শোধ দিতে এসেছ?

ততক্ষণে সানী সাহেব চেয়ারে উঠে বসেছেন, তাঁর পেশিগুলো দড়ির মতো শক্ত হয়ে উঠেছে।

হাবিব কোনো জবাব দিলেন না।

—তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ মনে আছে?

আশ্চর্য শান্ত কণ্ঠে সানী সাহেব আবার জিগ্যেস করলেন।

হঠাৎ বহুদিন আগেকার একটি দৃশ্য হাবিবের চোখের সামনে ভেসে উঠল। সেই যেদিন রেড রোডে এক ঘোড়সওয়ার তাঁকে সাহেবদের অত্যাচার থেকে বাঁচিয়েছিল।

কিন্তু আলিপুরের এসডিও সাহেব এবারো কোনো জবাব দিলেন না। খান বাহাদুর সাহেব সামনের দরজা দেখিয়ে দিয়ে বললেন : যাও!

একটু নত হয়ে সুটকেসটা হাতে নিয়ে হাবিব বেরিয়ে গেলেন। সিঁড়ির দু'ধারে কনস্টেবল আরদালি আর চাকর স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

একমাত্র ইশারার অপেক্ষা—বেয়াদবের হাড় গুঁড়ো হয়ে যেত।

খাঞ্চায় নাস্তা সাজিয়ে খদিজা বিবি আবার পর্দার পাশে এসে দাঁড়ালেন। পরক্ষণেই পর্দা তুলে ভিতরে প্রবেশ করে জিগ্যেস করলেন : হাবিব কোথায়?

—চলে গেছে।

—চলে গেছে!

—হুঁ।

—তার জন্য নাস্তা নিয়ে এলাম।

—কোনো কুত্তাকে দিয়ে দাও।

তখন অন্ধকারে ঘর ভরে গেছে।

সতেরো

বিকেলবেলা সানী সাহেব সহিসকে ডেকে বললেন : গাড়ি বের কর।

তারপর অন্দরে এসে খদিজা বিবিকে জিগ্যেস করলেন : ছেলেরা কোথায়?

—ঘরেই আছে কোথাও।

রান্নাঘর থেকেই খদিজা বিবি জবাব দেন।

রান্নাঘরের দরজার সামনে সানী সাহেব একটু দাঁড়ালেন। অল্পকাল পর একটু হেসে বললেন : তুমি কি দিন-রাত রান্না নিয়েই থাকবে? আর কি কোনো সাধ-আহ্লাদ নেই?

—বাঁদীকে পায়ে ঠাঁই দিয়েছেন, তাতেই সব সাধ পুরা হয়ে গেছে।

—আলমারি ভরা কাপড়-চোপড়, কখনো পরতেও দেখি নি।

কড়াইয়ের গোস্ত চাটু দিয়ে নাড়তে নাড়তে খদিজা বিবিও হেসেই জবাব দিলেন : কেন?

এমনি বুঝি পছন্দ হয় না?

যে ঐভাবে এক পাশে ঘাড় কাত করে চোখের কোণ দিয়ে একটুখানি হেসে কথা বলতে পারে, তারই মুখে এই প্রশ্ন শোভা পায়—যে প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে কোনো সংশয়ই থাকতে পারে না।

মেঘের মতো কালো চুল ঘাড়ের দু'পাশ দিয়ে কোলের ওপর নেবে এসেছে। উনুনের দগদগে আগুনের আভায় ফর্সা মুখখানি নববধূর মতোই রঙিন। কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম মুক্তোর মতো ঝলমল করছে।

সানী সাহেব কিছুকাল নীরবে স্ত্রীর মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকেন।

স্বামীর মনোযোগ যে তিনি সর্বশরীর দিয়ে উপভোগ করছেন, খদিজা বিবির সর্বাঙ্গের ঈষৎ কম্পনই তার সাক্ষ্য দেয়।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হয় ক্বচিৎ, আলাপ-আলোচনা আরো কম।

তাই একটু অবাক হয়েই খদিজা বিবি এবার জিগ্যেস করলেন : আজ আপনার হয়েছে কি? সানী সাহেব প্রশ্নটির সোজা জবাব দিলেন না। বললেন : তোমার ওপর কতদিন রাগ করেছি, সারাদিন ঘরে শিকল দিয়ে বন্ধ করে রেখেছি। মারধোরও যে করি নি, তা নয়। তবু তোমাকে তো কোনোদিন নালিশ করতে শুনি নি।

খদিজা বিবি হেসে ফেললেন। পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে বললেন : যে স্ত্রী স্বামীর হাতের মার খায় নি সে বড় হতভাগী। তাছাড়া কেবল মারটাই কি মনে আছে, আর কি কিছুই মনে পড়ে না? এই যে আলমারি ভরা এত গহনা-কাপড়, এসব এলো কোথা থেকে? মার না খেলে কি ওসব পেতাম?

—বাস্ গহনা-কাপড় পেয়েই সব জ্বালা ভুলে গেলে?

এবার কৌতুকভরা দুটি চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি এসে পড়ল সানী সাহেবের চোখের ওপর। মৃদু হেসে খদিজা বিবি বললেন : কেবল কি গহনা-কাপড়? আর কি কিছুই নয়? মনে নেই, রাগ করে দু'দিনের জন্য বাপের বাড়ি গিয়েছিলাম। নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করে কে বসেছিল? এদিকে দেখতে তো ইয়া পহলওয়ান!

সানী সাহেবও হেসে ফেললেন।

—আমার দিন তো ফুরিয়েই এলো। তাই ভাবছি।

—কি ভাবছেন?

সানী সাহেব হাসতে হাসতেই বললেন : ভাবছি, আমি মরে গেলে তুমি আবার নিকে করবে কি না। আর—

হঠাৎ স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে সানী সাহেব নীরব হয়ে গেলেন।

শ্বেত পাথরের মতোই সাদা আর নিষ্প্রাণ সে মুখ।

—সত্যি! আজ আপনার হয়েছে কি?

এমন সময় কোথা থেকে দুই ছেলে নাসের আর আজিজ ছুটতে ছুটতে উপস্থিত। দুই দিক দিয়ে দুইজন মাকে দখল করল।

—আম্মা আম্মা নাস্তা!

সানী সাহেব সেখান থেকে চলে এলেন।

—বাইরে আমাদের জন্যও নাস্তা পাঠিয়ে দাও। জজ সাহেবও আসবেন।

খজিদা বিবি আর একবার স্বামীর দিকে তাকালেন। সানী সাহেব সেই দৃষ্টির অর্থ বুঝলেন।

এই মেহমানদের জন্যই খদিজা বিবিকে সারাদিন রান্নাঘরে থাকতে হয়। তাঁর হাতের রান্না তামাম কলকাতায় মশহুর। আসেও লোকে কলকাতার চারদিক থেকে, খান বাহাদুরের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন।

জজ সাহেব চলে যাবার পর সানী সাহেবও উঠলেন।

দুই ছেলেকে নিয়ে তিনি অপেক্ষমাণ ব্রুহামে গিয়ে উঠলেন। জুতা মোজা প্যান্ট শার্ট আর গ্যালিস পরা দুই ছেলে এক পাশে, খান বাহাদুর এক পাশে। মাঝখানে পায়ের কাছে বসে আছে বাড়ির এলসেশিয়ানটি।

হাওয়া খেতে চলেছেন। কোমেদান বাগান লেনের পথে যত লোক একবার করে সালাম দিতে লাগল।

গড়ের মাঠে পৌঁছে সানী সাহেব ছেলেদের ছেড়ে দিলেন। তিনি নিজেও ধীরে ধীরে পায়চারি করতে লাগলেন।

নাসের কখনো কুকুরটির পিছনে পিছনে দৌড়ুতে থাকে, কখনো কুকুর নাসেরের পিছনে দৌড়য়।

আজিজ ছোট। সে সবসময়ই অগ্রজ নাসেরের পিছনে ছুটতে থাকে—তার কেবলই ভয় হতে থাকে এই বুঝি কুকুরটি নাসেরকে কামড়ালো।

হ্যালো, খান বাহাদুর।

—হ্যালো!

—নমস্কার স্যার। ভালো আছেন?

—এই যে যতীন বাবু, আপনি কেমন?

কেউ বলে : হুজুর সালাম!

—সালাম সালাম!

দুই ছেলে নিয়ে খান বাহাদুর সাহেব কেল্লার ময়দানে বেড়াচ্ছেন। কিছুটা অন্যমনস্ক। মাঝে মাঝে পরিচিত লোকজনদের সঙ্গে এক-আধটা বাক্য বিনিময়ও হচ্ছে। ধীরে ধীরে মাঠের ওপর অন্ধকার নেবে আসছে। ক্রীড়ারত বালক-বালিকার মুখরিত কণ্ঠ নিস্তেজ নিস্তব্ধ হয়ে আসছে।

এমন সময় অনতিদূরেই হাবিবকে দেখতে পেলেন। তিনিও বেড়াতে এসেছেন। হাবিবকে দেখে নাসের আর আজিজ বাপের কাছে ফিরে এলো। দুইজন বাপের দুই হাত ধরে হাবিবকে দেখতে থাকে। এই লোকটিকে তারা জ্ঞান হওয়া অবধি দেখে আসছে। একটা ঘরে চুপচাপ বসে পড়ছেন। কারো সঙ্গে কোনো কথা বলেন না। কখনো কখনো নাসের আর আজিজকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন, তখনো একটি কথাও বলেন নি। তারাও তাঁকে এড়িয়েই চলেছে।

তারপর হঠাৎ কি ঘটল, সে সম্বন্ধে নাসের আর আজিজের পরিষ্কার কোনো ধারণা নেই। কিন্তু এক রকম করে তারাও বুঝে নিয়েছে এই লোকটির প্রতি তাদের পিতা বিরূপ।

খান বাহাদুর সাহেবকে দেখে হাবিব অন্যদিকে চলে গেলেন। খান বাহাদুর সাহেব ছেলেদের হাত ধরে আবার গাড়িতে এসে উঠলেন। একবার 'হোয়াইটওয়ে লেডল' যেতে হবে। ক'দিন ধরে মুনিরের জ্বর, তার জন্য একটা কম্বল কিনতে হবে। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর কাছে মানুষ। হালে বিয়েও দিয়ে দিয়েছেন। হাইকোর্টে চাপরাশির কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। ব্রুহাম চলছে। খান বাহাদুর সাহেবের মাথায় কতরকম চিন্তা। এই মুনিরেরই তিনি মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলেন।

নতুন বিয়ে দিয়েছেন। বৌ পছন্দ নয়, দুর্ব্যবহার করে।

খান বাহাদুর সাহেব সব লক্ষ্য করেন? কিন্তু কিছু বলেন না।

একদিন রাত্রে মুনিরের কামরা থেকে কান্নার আওয়াজ ভেসে এলো। তখন অনেক রাত। খান বাহাদুর দোতলা থেকে নেবে এলেন। মুনিরের বৌকে বললেন : তুমি একটু সরো তো মা।

তারপর আর কোনো কথা নেই। পায়ের খড়ম খুলে মুনিরের মাথায় এক বাড়ি। মাথা ফেটে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল। মুনিরও কাটা ছাগলের মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল মুনিরের গায়ে একশ' চার ডিগ্রি জ্বর। কলকাতার সবচাইতে নাম করা ডাক্তার এলেন। ফ্র্যাঙ্ক রসের দোকান থেকে ওষুধ এলো। দিনের পর দিন যায়, জ্বর ছাড়ে না।

খান বাহাদুর পনের দিনের ছুটি নিলেন। দিন নেই রাত নেই মুনিবেব মাথার কাছে বসে কেবল শুশ্রূষা। কখনো মাথায় বরফ দিচ্ছেন, কখনো বেডপ্যান সাফ করে দিচ্ছেন।—চোখে এক পলক ঘুম নেই।

বাড়িভরা চাকর, লোকজন, কারো সাহস নেই সাহেবকে বিরত করে।

মুনিরের যখন জ্বর ছাড়ল, তার মাথা তখন খান বাহাদুরের কোলে। মুনিরের মাথা সযত্নে বালিশের ওপর নাবিয়ে রেখে তিনি তার গালে একটা চুমু দিলেন।

—ছিঃ বাবা। বৌয়ের সাথে অমন ব্যবহার করতে নেই।

এইবার সানী সাহেব উঠলেন।

সেই মুনিরের আবার জ্বর এসেছে।

ম্যালেরিয়াই হবে, সানী সাহেব ভাবেন।

কম্বল কিনবার পর সানী সাহেব সহিসকে ভীম নাগের দোকানে যেতে আদেশ দিলেন।

তবক দেওয়া হলদে সন্দেশ : দিলখোশ!

দোকানে মালিক বেরিয়ে এলেন।

—কমিশনার সাহেব, সন্দেশ আজ দুপুরেই তৈরি। বেশি করে নিয়ে যান।

—ঠিক বলছ তো নরেন?

—আজ্ঞে মিথ্যে? তাও আপনাকে?

সন্দেশ নিয়ে খান বাহাদুর সাহেব বিদায় নিলেন।

দোকানের ভিতর থেকে কে একজন বলেন : লোকটা কে? একেবারে বাদশার মতো দেখতে।

ঘোড়ার ক্ষুরের ক্লিপ-ক্লপ ক্লিপ-ক্লপ তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেয়।

আঠারো

ক্রুহামের চাকা ঘুরতে থাকে। বছরের পর বছর গড়িয়ে যায়। হাবিবুর রহমান সাহেব চাকরি জীবনে দ্রুত উন্নতি করতে থাকেন। যে সময়ের কথা বলছি সেই সময় তিনি কলকাতার এডিশনাল চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট।

খান বাহাদুর আবদুস সানী আর মাত্র ছ'মাস পরই রিটায়ার করবেন। পুলিশের এ্যাসিসটেন্ট কমিশনার আর এডিশনাল চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যে প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ হয়। আদালতে, কেল্লার ময়দানে, কনফারেন্সে, আরো কত জায়গায়।

কিন্তু দুটি ঘটনা হাবিব সাহেব কোনোদিন ভুলতে পারেন নি। এক, তার সমস্ত উন্নতির মূলে আছেন খান বাহাদুর সাহেব। দুই, সেই সন্ধ্যার কথা—যে দিন খান বাহাদুর সাহেব দরজা দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

অথচ তাঁর সমস্ত অন্তঃকরণ এই দুই সত্যই অস্বীকার করতে চায়।

কোনো কোনো মামলায় সানী সাহেবকে হাবিব সাহেবের এজলাসে আসতে হয়। তখন তিনি চেয়ারকে স্যালুট দেন। আদালতসুদ্ধ লোক যে স্যালুট দিল তাকেই দেখতে থাকে, যে পেল তাকে তেমন করে দেখে না। তবু সেই সময় এক অনাস্বাদিত-পূর্ব চরিতার্থতায় হাবিব সাহেবের বুক ভরে যায়।

সানী সাহেব অপরিসীম উদাসীন।

এই জীবনে তিনি বহু দেখেছেন। বহু নাটকের তিনি দর্শক, বহু নাটকের তিনি নায়ক। জীবনে ভালোবেসেছেন, ক্ষমা করেছেন, প্রচণ্ড উষ্মায় উন্মত্ত হয়েছেন; কিন্তু কোনোদিন প্রতিহিংসায় খড়্গহস্ত হতে পারেন নি।

চেয়ারে বসা হাবিবকে তাঁর চোখে যাত্রার মঞ্চের রাজার মতোই হাস্যকর মনে হয়। এই লোকটির বিরুদ্ধে তিনি কোনো আক্রোশই বোধ করেন না।

সেদিন অফিস-আদালতে, চায়ের দোকানে, খেলার মাঠে, লোকের মুখে মুখে, সংবাদপত্রের স্তম্ভে, একই কথা।

খান বাহাদুর আবদুস সানী এডিশনাল চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটকে ফেলে দিয়েছে।

সে কি?

হ্যাঁ। আদালতসুদ্ধ লোকের চোখের সামনে পাঁজা কোলা করে তুলে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছে। তখন যদি খান বাহাদুরকে দেখতে! মনে হচ্ছিল, আরব্য উপন্যাসের পৃষ্ঠা থেকে এক দৈত্য বেরিয়ে এসেছে। এডিশনাল চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কি এক অপমানকর মন্তব্য করেছিলেন।

খান বাহাদুর কোনো কথা না বলে দু'হাত দিয়ে তুলে আছাড় দিয়েছে।

'সন অফ আবদুল গফফার! এন্ড এ গ্রেট অফিসার হিমসেলফ।' তার ওপর যথেষ্ট প্রভোকেশন ছিল। তাই খান বাহাদুরের বিশেষ কিছু হলো না। সরকার তাঁকে রিটায়ার করতে বাধ্য করলেন!

কিছুদিন পর পুলিশ কমিশনার এলেন।

—আই কান্ট সে আই ক্যান কনগ্রাচুলেট ইউ। এন্ড ইয়েট, ওয়েল...। ইট ইজ ওয়ান অফ দোজ্ প্যারাডকস এজ।

—নাথিং এলস ওয়ারিজ মি। ওনলি মাই সন্স...

—ইওর সন্স! আবদুল গফফার'স গ্র্যান্ড সন্স! দ্য বৃটিশ গভর্নমেন্ট উইল লুক আফটার দেম।

খান বাহাদুর কোনো জবাব দিলেন না। একটু হাসলেন। বাইরের লোকের সঙ্গে তাঁর সেই শেষ সাক্ষাৎ।

আবার ছয় মাস পর সকলে তাঁকে শেষবারের মতো দেখল। কোমেদান বাগান লেনে লোক আর ধরে না।

জানাজা চলল 'গোরে-গরিবান।' পিছনে শত শত লোক। সবার মুখে এক কথা :

—পাড়ার রাজা চলে গেল।

পুলিশ কমিশনার—সাহেব মানুষ; কিন্তু তাঁর চোখেও পানি।

—এ প্রিন্স এমং মেন! এ মোস্ট ব্রিলিয়েন্ট অফিসার। দ্য এন্ড অফ এন ইনস্টিটিউশন। টেক মাই স্যালুট খান বাহাদুর।

পুলিশ কমিশনার তাঁর টুপি খুলে হাতে নিলেন।

হিন্দু-মুসলমান-খ্রিষ্টান সবাই চলল।

উনিশ

সানী সাহেবের আখ্যান-বর্ণনায় বিমুগ্ধ চোখের বর্ণচ্ছটার প্রভাব হয়তো আছে। অতীতের দিকে কিছুটা বিমোহিত দৃষ্টিতে ফিরে ফিরে তাকানো মানব চরিত্রের একটা পুরাতন দুর্বলতা। যে-কাল মহাকালের গর্ভে চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে, সেই সময়কার দু'একটি ক্ষুদ্র স্মৃতি যখন চিত্তপটের ওপর ছায়া ফেলে, তখন ছোট্ট একটি অশরীরী দীর্ঘশ্বাস বরঞ্চ অতীতের বন্ধন থেকে মুক্তিই এনে দেয়। যাই হোক, সানী সাহেবের কাহিনীর যে-রেশটুকু এখনো কানে বাজছে সেটুকুও শেষ করে দেয়া যাক।

'দ্য বৃটিশ গভর্নমেন্ট' অবশ্য নাসের আর আজিজের একটা কিনার করে দিলেন।

প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের কমিশনার স্যার ডানকান ম্যাকডোনাল্ড নাসেরকে ডেকে পাঠালেন।

—তোমার এখুনি চাকরি দরকার? কিছুদিন অপেক্ষা করতে পার না?

নাসের চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন।

—বুঝেছি!

ডিভিশনাল কমিশনারের ললাটে চিন্তার রেখা। লম্বা পাইপে তিনি ধীরে ধীরে টান দিতে থাকেন।

—সাব-ডিপুটি হবে? এখুনি আর কোনো ভেকেনসি নেই। তবে আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, নেকস্ট্ ভেকেনসিতেই আমি তোমাকে ডিপুটি করে দেব। দু'মাস পরেই ভেকেনসি হবে। তোমার ছোট ভাইকে পোর্ট কমিশনারস অফিসে জুনিয়র অফিসার করে দিচ্ছি।

দু'মাস পর ভেকেনসি হলো। কিন্তু নাসের ডিপুটি হলেন না। তার আগেই পোলো খেলবার সময় স্যার ডানকান ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে মারা যান।

খান বাহাদুর সানীর ইন্তেকালের পর দু'বছর হয়ে গেছে।

সৈয়দ আবু নাসের তখন নওগাঁয়ে আবগারি বিভাগের ছোট সাহেব। সৈয়দ আবদুল আজিজ পোর্ট কমিশনারস অফিসে জুনিয়র অফিসার। উভয়েই অবিবাহিত। খদিজা বিবি থাকেন কলকাতায়, ছোট ছেলের সঙ্গে।

পূজার ছুটিতে নাসের কলকাতা এসেছেন। উদ্দেশ্য : মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আর বাপের কবর জিয়ারত করা।

সেই ছুটিতেই কলকাতা এলেন মালদহের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট খান বাহাদুর মতিন উদ্দিন চৌধুরী—সপরিবারে এসে উঠলেন কলকাতার এডিশনাল চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মি. হাবিবুর রহমানের বাসায়।

দিন দু'-এক পর তেত্রিশ নম্বর কোমেদান বাগান লেনে একটা ব্রুহাম এসে দাঁড়ালো। বহুদিন এই বাড়ির গেটে কেউ ব্রুহাম বা ল্যান্ডো দেখে নি।

গাড়ি থেকে নাবলেন খান বাহাদুর চৌধুরী। বেঁটেখাটো লোক, পরনে হাফ প্যান্ট হাফ শার্ট, চোখে সোনার চশমা, মুখে চুরুট, হাতে সোনার বাঁট লাগানো ছড়ি।

দুটি পায়ে ক্ষিপ্র গতি।

—তোমার নাম কি?

—জি, আজিজ।

চৌধুরী সাহেবের চোখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

—তোমার চাচাজান কোথায়?

—জি, কোন্ চাচাজান?

—প্রিন্সিপাল আবদুল গনি।

—তিনি থাকেন ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেনে।

—বেশ। আমি সেখানেই যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে। চৌধুরী সাহেব যেমন ক্ষিপ্র পদে এসেছিলেন, তেমনি দ্রুতপদে চলে গেলেন।

আজিজ অনেকটা হতবুদ্ধি হয়েই দাঁড়িয়ে থাকলেন।

কিন্তু আবার-দেখা-হবে মানে যে এই তা কি আর তিনি ভেবেছিলেন। দু'কথায় আজিজের সঙ্গে চৌধুরী সাহেবের বড় মেয়ের বিয়ে পাকা হয়ে গেল।

আবু নাসেরের সঙ্গে হাবিবুর রহমানের মেয়ের বিয়ে অবশ্য অত সহজে পাকা হতে পারে নি। চৌধুরী সাহেবেরই মধ্যস্থতায় শেষ পর্যন্ত তাও সম্ভব হলো।

হাবিবুর রহমান বহুদিন পর আবার তেত্রিশ নম্বর কোমেদান বাগান লেনে এলেন। খজিদা বিবির কাছে মাফ চাইলেন। বললেন : আমাকে আপনি মাফ করতে পারবেন না। কিন্তু আমার মেয়েকে দেখলে আপনি রাগ করে থাকতেও পারবেন না। মেয়েটি বড় নেক।

হাবিবুর রহমানকে এখন দেখলে বজ্রাহত বনস্পতির কথাই মনে পড়ে। হয়তো তাতেও খদিজা বিবি রাজি হতেন না।

কিন্তু হাবিবুর রহমান যখন বললেন, মেয়েটি বড় নেক, তখন বহুদিন আগেকার একটি বিস্মৃত প্রায় কথা তাঁর কানে বাজতে লাগল। একটি ছোট পোস্ট কার্ডে এই মেয়েটিরই জন্মবার্তা পেয়ে খান বাহাদুর সানী বলেছিলেন : মেয়েটি খুশনসিব। এই শুনে রাখো আমার কথা।

সুতরাং এই বিয়েও পাকা হয়ে গেল।

খান বাহাদুর আবদুস সানীর দুই ছেলের বিয়ে। ভীম নাগের দোকান থেকে সন্দেশ এলো : কোলুটোলা থেকে এলো মাওয়ার লাড্ডু, আতর আর গোলাপ-পানি, নতুন বাজারের স্টল থেকে এলো ফুল আর নেশাসতার হালুয়া। হোয়াইটওয়ে লেডল দুই নওশাকে সুট বানিয়ে দিল।

প্রিন্সিপাল আবদুল গনি দাম দেয়ার জন্য হাত বাড়ালেন। দুই হাত দিয়ে সেই হাত ধরে ফেলে তাঁরা বললেন : তওবা তওবা। তাও কি হয়। কার ছেলের বিয়ে তা কি আমরা ভুলতে পারি। তাঁর কাছ থেকে অনেক পয়সা পেয়েছি। এ আমাদের তরফ থেকে সামান্য তোহ্ফা।

কোনো আপত্তিই তারা শুনলেন না।

বিয়ে হয়ে গেল।

বিশ

সবে ভাত খেয়ে উঠেছি; ভকত-এর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মুখে একটা পান পুরে, ধারে একটা সিগারেটও কিনে নিয়েছি।

—তাড়াতাড়ি উসুল করে দেবেন বাবু। আমি গরিব মানুষ—পয়সা পাব, তবে আবার মাল আনব।

—হবে রে হবে। ব্যস্ত হতে হবে না তোকে।

রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকতে আর ভয় লাগে না। কি আর হবে। শুনেছি বড় ভাই, মেজ ভাই এঁরাও অল্প বয়সেই সিগারেট ধরেছেন। সামনাসামনি পড়ে গেলে লুকিয়ে ফেললেই হবে; কিন্তু সত্যিই যখন সামনাসামনি পড়ে যাই তখন ভয়ে হাত-পা-বুক সব এক সঙ্গে কাঁপতে থাকে। একবার বড় ভাইয়ের সামনে পড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি আর কোনো উপায় না দেখে পকেটের মধ্যেই জ্বলন্ত সিগারেটটা পুরে ফেলেছিলাম।

ভরা পেটে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়তে কিন্তু বেশ লাগে।

এমন সময় কোথা থেকে মুশতাক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো।

হাঁফাতে হাঁফাতে বললো : শাকের শোন। তোর সাথে কথা আছে।

—বলেই ফেল।

—তুই তো খেলাধুলা ছেড়েই দিয়েছিস, যদিও খেলতিস তুই কড়া; কিন্তু আজ আমার না গেলেই নয়। নারকেলডাঙ্গায় একটা কাপ ফাইনালে আমাকে খেলতেই হবে। এদিকে বুবু ধরেছে, তার সঙ্গে তার কলেজ যেতে হবে সন্ধ্যাবেলা। তাদের কি একটা ভ্যারাইটি-শো আছে। আম্মা কিছুতেই একা যেতে দেবেন না। তুই যা না ভাই। তা না হলে আমার নারকেলডাঙ্গা যাওয়া হবে না।

—আমি যাব?

—লক্ষ্মী ভাইটি আমার!

—তুই যে দেখি মেয়ে মানুষের মতো কথা বলতে শুরু করে দিলি!

তারপব আর কোনো কথার অপেক্ষা না করে মুশতাক এক রকম জোর করেই আমাকে ধরে নিয়ে চলল।

—একটু দাঁড়া রে বাবা। এইভাবে কোথাও যাওয়া যায়! দেখছিস না কাপড়-চোপড়ের ছিরি।

—কিসসু লাগবে না। তুই আয় তো।

বাড়ি পৌঁছেই মুশতাক একটা কিট ব্যাগে খেলবার বুট আর জামা-কাপড় দ্রুত হাতে পুরে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালালো। আমাকে কোনোমতে এখানে উপস্থিত করেই তার কর্তব্য শেষ। মুশতাক যে-ব্যবস্থা করে দিয়ে গেল, সেলিনার চোখ-মুখে কোথাও তার সমর্থন নেই ; মনে হলো মাতা-পুত্রীর মধ্যে একটা বচসাও হয়ে গেল।

—কেন, আম্মা আমি কি একা যেতে পারি না।

—না। একা যাওয়া তোমার হবে না। দিনকাল ভালো নয়। ফিরতে কতো রাত হবে কে জানে! বাড়ির গাড়িও সার্ভিসিংয়ে গেছে। যেতে হলে শাকেরে সঙ্গে যাও।

—এমন জানলে আমি যেতামই না; কিন্তু কথা দিয়ে ফেলেছি। সেলিনা ঘোরতম অনিচ্ছায় সাজতে চলে গেল। একটু পরই তৈরি হয়ে বেরিয়ে এলো। আমি তখনো সেই একইভাবে দাঁড়িয়েছিলাম। আমাকে একনজর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে সেলিনা আরো বেঁকে বসল।

কন্যার মনের কথা বুঝতে পেরে মাতা বললেন : শাকের নাও নাও, তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নাও। এই যে তোমার কাপড়।

আমি যেন একটা পুতুল। সকলেরই ইচ্ছা-অনিচ্ছার দাম আছে, আর আমার যেন ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলে কোনো বস্তুই থাকতে পারে না।

—আমি কোথাও যাব না।

সেলিনা আর চাচি উভয়েই হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

সেলিনাই প্রথমে বললো : যাই আমি কাপড় ছাড়ি গে। কাউকে খোশামোদ করতে পারব না।

—তুই কেমন মেয়েরে সবার যেন মাথা কিনে নিয়েছিস। মুখে যদি একটা মিষ্টি কথা কেউ কখনো শুনেছে।

সেলিনা তেমনি দাঁড়িয়ে থাকল। সরবে বেশ পরিবর্তনের ঘোষণা সত্ত্বেও পরিকল্পনা কার্যকরী করবার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। বেশ বুঝতে পারছিলাম, কলেজের ফাংশনে তাকে যেতেই হবে। সুতরাং আমিই বেশ পরিবর্তন করতে চলে গেলাম।

যাবার আগে চাচি কতগুলো খুচরা আনি-দুয়ানি হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন : তুমি তো আর সেলিনার কাছে পয়সা চাইবে না! এগুলো রেখে দাও। ট্রামের ভাড়া দেবে।

সেলিনা বলে উঠল : আম্মা, আনি-দু'আনিগুলো ভালো করে দেখে দিও, ট্রামে আবার অচল না বেরোয়।

চলতে শুরু করেছিলাম, কি হলো আর যেন পা উঠতে চায় না। তবু এগিয়েই গেলাম। দাঁড়িয়ে থাকলাম না।

ট্রামে আর কোনো কথা হয় না। একেবারে সামনের সিটে দু'জন বসেছি। বিকেলবেলার রোদ সেলিনার চোখে মুখে খোঁপায় আবিরের রঙ ছিটিয়ে দিচ্ছে। পথে লোকজন, গাড়ি-ঘোড়া সবকিছুই আছে; কিন্তু এই সময়টায় কোলাহল কেমন যেন স্তিমিত হয়ে আসে। দিন শেষের লগ্নটিতে অনেকটা অকারণেই সমস্ত মন বিষাদে ভরে যায়।

সামনের খোলা জানালা দিয়ে দমকা বাতাস আসে—উভয়কেই স্পর্শ করে যায়। দামি সেন্টের দুর্লভ সুগন্ধ নাকের চারপাশে ভ্রমণের মতো ঘুরে বেড়াতে থাকে। পার্শ্ববর্তিনীর দু'-একটি চূর্ণ কুন্তল উড়ে এসে বসে কখনো নাকের কখনো চোখের কখনো বুকের ওপর—ফড়িংয়ের মতো।

কলেজে পৌঁছে আমি একেবারে দমে গেলাম। বীটন কলেজ, মেয়েদের অভিজাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অতিথি-অভ্যাগতরা প্রায় সকলেই বিদ্যায়-আভিজাত্যে সব দিক দিয়ে আমার চাইতে বড়। এত দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্বের মুখোমুখি হয়ে আমার অন্তরাত্মা শুষ্ক তৃণের মতো নিষ্প্রাণ হয়ে এলো। আমি হয়তো সেলিনাকে পৌঁছে দিয়েই বাড়ি ফিরে আসতাম। কিন্তু কত রাত্রে উৎসব শেষ হবে জানি না। একা এতটা পথ সেলিনার পক্ষে যাওয়া সত্যিই নিরাপদ নয়। তাই থাকতেই হলো।

কিন্তু একটু পরেই সব ভুলে গেলাম। মঞ্চের আলোকসজ্জা, পাত্র-পাত্রীর রূপসজ্জা, নাটকের ঘটনাচক্রের উত্থান-পতন, সঙ্গীতের আবেদন এইসব কিছু মিলে অন্য সবকিছুরই অস্তিত্ব ভুলিয়ে দিল—এমনকি সেলিনার অভিভাবক হিসেবে আমার কর্তব্য পর্যন্ত।

অবশ্য একটু পরই লক্ষ্য করলাম, সেলিনা কেমন উসখুস করছে। শুধু মঞ্চের ওপর তার চোখ নেই, আর সব দিকেই আছে। অভিনয় চলছে বলে মঞ্চের আলোগুলো ছাড়া আর কোনো

আলোই জ্বলছে না। তাই দর্শকদের আসনগুলো অন্ধকারে ডুবে আছে। তবু সেই আধো-অন্ধকারেই এক সময় দেখলাম, সাদা প্যান্ট আর হাফ শার্ট পরা এক সুন্দর স্বাস্থ্যবান যুবক সেলিনার পিছনে এসে দাঁড়ালো। একটি আঙুল দিয়ে সেলিনার কাঁধ স্পর্শ করল; দুই ঠোঁটের মাঝখানে একটা জ্বলন্ত সিগারেট, তবু তারই ফাঁক দিয়ে হাসির এক ঈষৎ তরঙ্গ বেরিয়ে এলো।

সেলিনা তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ল। আমাকে বললো : শাকের, তুমি নাটক দেখ। আমি এখুনি আসছি!

সুন্দর যুবকটি প্রশ্ন করল : ছেলেটি কে?

সেলিনা জবাব দিল : কোন্ ছেলেটি? ও . ওর কথা বলছ। ও কেউ না। ও শাকের! তারপর তারা চলে গেল।

আমি আবার অভিনয় দেখতে শুরু করলাম। একটু আগেই যতটা ভালো লাগছিল, এখন তেমন লাগল না। আগাগোড়াই কি অভিনয় সমান ভালো হতে পারে। তাই আর তেমন করে মন বসল না।

অভিনয় শেষ হলো। সব ক'টি আলো জ্বলে উঠল। দর্শকদের ভিতর থেকে কারা যেন স্বর্ণপদক ঘোষণা করলেন। হাততালি পেল। সবাই আসন ছেড়ে দাঁড়ালেন। অনেকেই নাটকের ভালো-মন্দ সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করলেন। কেউ কেউ হারিয়ে যাওয়া সঙ্গীকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন।

আবার আলো নিভল। গান শুরু হলো, তাও শেষ হলো।

তবু সেলিনার দেখা নেই।

একে একে সব ক'টি অনুষ্ঠানই শেষ হলো। গেটের কাছে ভয়ানক ভিড়; সবাই এক সঙ্গে বেরিয়ে যেতে চায়। সামিয়ানার নিচে তেমনি গোলমাল; সবাই একসঙ্গে কথা বলতে চায়।

গেটের সামনে ভিড় কমে এলো। একে একে সবাই বিদায় নিলেন, এমনকি শেষধ্বনির বুদ্বুদও মিলিয়ে গেল।

আমি একা আধ-অন্ধকারে নিঃশব্দে এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকলাম। চলে যাব কিনা ভাবছি, এমন সময় যুগলে ফিরে এলেন। সেলিনাই বললো : কিছু মনে করো না ভাই। তোমাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম। বড্ড মাথা ধরেছিল, তাই কর্নওয়ালিস স্কোয়ারে গিয়ে বসেছিলাম।

আমি কোনো কথাই বললাম না।

এবার হাফ শার্ট পরা ছেলেটি সেলিনাকে জিগ্যেস করল : আবার কবে কোথায় দেখা হচ্ছে? ইন থান্ডার লাইটনিং এন্ড ইন রেন?

—ইন থান্ডার লাইটনিং এন্ড ইন রেনই বটে। যাই হোক, জানতে পারবেই।

আমরা বাড়ি ফিরে এলাম।

ক্রিমেটোরিয়াম রোডের কবরস্থানের পাশ দিয়ে হাঁটছি। এই রাস্তাটি রাত্রে বেশ অন্ধকারই থাকে। আমাদের সম্মুখে হাঁটছে আমাদের লম্বা লম্বা দুটি ছায়া—স্তিমিত গ্যাস-লাইটের অপ্রচুর আলোকে সেই ছায়া দুটির অস্তিত্ব যেন আমাদের অস্তিত্বের চাইতেও সত্য মনে হচ্ছিল। পথে লোকজনও অত্যন্ত বিরল। অন্ধকার রাত্রে কবরস্থানের কবরগুলোর সাদা পাথরগুলো ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না। প্রতি পদক্ষেপে আঁধারের বুকে এই শ্বেত পাথরগুলো চোখে পড়ে; আর আমাদের উভয়েরই পদধ্বনি ছাড়া আর কোনো শব্দও কানে পৌঁছয় না! দুই ছায়া পাশাপাশি

হাঁটছে আর দুই জোড়া চরণের ধ্বনি একই তালে বাজছে; পিছনে অতি দূরে দুই পথিকের কথোপকথনের মৃদু গুঞ্জন ছাড়া বহির্বিশ্বের অস্তিত্ব যেন বিলুপ্ত প্রায়। এই পরিবেশে কেমন করে যেন সেলিনার সঙ্গে এক নিবিড় অন্তরঙ্গতার আত্মীয়তা অনুভব করতে লাগলাম। সেলিনা মাথাটা নিচু করে হাঁটছিল, নানান ভাবনাচিন্তাতেই যেন তার মাথা নত হয়ে গেছে; অত্যন্ত অন্যমনস্ক, আপনাতে আপনি মগ্ন।

অন্ধকারের সমুদ্রে বুদ্বুদের মতো আমার কণ্ঠে ভেসে উঠল : ছেলেটি কে? হিন্দু না মুসলমান?

সেলিনা একটু হাসল। বিচিত্র সে হাসি।

—বলতে পার, রূপের কোনো ধর্ম আছে।

—আছে। কারণ যে-আচরণের পিছনে ধর্মের সমর্থন নেই, তা অন্যায়-অসুন্দর।

আবার তেমনি হাঁটতে লাগলাম। কেউ কোনো কথা বলি না। ঐ সামনেই সেলিনাদের বাড়ি। একেবারে বাড়ির কাছাকাছি এসে সেলিনা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল! তার দুটি হাত দিয়ে শক্ত করে আমার হাত চেপে ধরল। আমার চোখের ওপর তার দুটি চোখ তুলে ধরে বললো : কাউকে বলো না, তোমার পায়ে ধরি।

ভীরু কম্পিত শঙ্কিত কণ্ঠস্বর, যা তার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন।

আমি বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম; কিন্তু অবাক হবার আরো বাকি ছিল।

সেলিনার ব্লাউজে তার ফাউন্টেন পেনটা আটকানো ছিল। ক্ষিপ্র হাতে সেটি টেনে বের করে সে আমার হাতে গুঁজে দিল।

—তোমাকে দিলাম!

বলে সে বাকিটা পথ প্রায় দৌগে অতিক্রম করে বাড়ির ভিতব ঢুকে পড়ল।

আমি বিহ্বল দৃষ্টিতে একবার হাতের কলম একবাব অপসৃয়মাণ সেলিনাকে দেখতে লাগলাম।

এক পা এক পা করে কখন দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছি আর কতক্ষণই-বা সেখানে সেইভাবে দাঁড়িযে থেকেছি কিছু জানি না। এমন সময় পিছন থেকে মুশতাক তীরের মতো ছুটে এলো।

—আঁধারে দাঁড়িযে করছিস কি?

বলেই সেও সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁফাতে লাগল।

—শুনেছিস্ খবর শুনেছিস্। এই দ্যাখ টেলিগ্রাম।

স্টেটসম্যানের বিশেষ সংখ্যা। খবর : জাপানিরা পার্ল হারবারে বোমা ফেলেছে—যুদ্ধ ঘোষণা না করেই।

তখন আশ্চর্য বা আতঙ্কিত হবার মতো মনের অবস্থা আমার ছিল না।

একুশ

সেলিনার সেদিনকার ব্যবহারের ঠিক কোন দিকটা আমাকে বিস্মিত আর মর্মাহত করেছিল তখুনি তার হদিস পাই নি। কিন্তু আজ মনে হয় সেলিনা সেই ছেলেটির সঙ্গে উঠে চলে গেল একমাত্র এইটেই তার কারণ নয়। তার জীবনের এক গোপন অধ্যায়ের সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে

আমার পরিচয় ঘটে যাওয়ায় সেলিনা হঠাৎ যে আমার কাছে পরাভব স্বীকার করল, এইটেই আমার বেজেছিল সবচাইতে বেশি। একটি ফাউন্টেন পেন দিয়ে সে আমার জবান কিনে নিতে পারে, তার এই বিশ্বাসের পিছনে কতটা ধিক্কার, কতটা অশ্রদ্ধা ছিল তাও বুঝতে পারি। কিন্তু ঠিক সে কারণেও আমি হতবুদ্ধি হই নি। কেন সে বললে : "কিছু মনে করো না ভাই, কাউকে বলো না ভাই" তার এই দিন মিনতিই তাকে আমার চোখে ছোট করে দিল। সে যেন কর্নওয়ালিস স্কোয়ারে একা একটি যুবকের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েই সম্পূর্ণ অধঃপাতে যায় নি; আমার হাত ধরে কাতর মিনতি করবার পরই যেন তার সত্যকার অধঃপতন ঘটল। এমনই মানুষের স্বার্থ! যাকে চিরটাকাল হেয় করে এসেছি, স্বার্থের জন্য তাঁর হাত ধরতেও মানুষের বাধে না :

সেলিনার রূপ, তার যৌবন, তার নির্মম আচরণ, তার নির্বোধ ক্রোধ সবকিছু মিলে তাকে এক অপার্থিব প্রাণী বলে মনে হতো। তার অহঙ্কার যতই দুর্বিনীত হোক, তার মধ্যেও এক স্পর্শাতীত সৌন্দর্য এক অপ্রতিরোধ্য মাধুর্য ছিল। কিন্তু একটি অপ্রত্যাশিত মুহূর্তের এক অসতর্ক কথায় সে আমার বড়ই কাছাকাছি নেবে এলো। তাকে ভয় করবার, সমীহ করবার, পৃথক মনে করবার যেন আর কোনো কারণই থাকল না।

বাইশ

টেস্ট পরীক্ষা হয়ে গেছে। আজ ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফি দেয়ার শেষ তারিখ। বিকেলবেলা প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের জন্য স্কুলের ছেলেরা এক বিদায় সভার আয়োজন করেছে। স্কুলের পিছনে খোলা মাঠটিতে একটি মঞ্চ তৈরি করা হচ্ছে—চেয়ার এনে বসানো হচ্ছে। ছেলেরা ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে।

বেশ দুঃখই হচ্ছিল। একটি অখ্যাত স্কুলের ছেলে আমরা। দু'-একজন ছাড়া ফাইনাল পরীক্ষায় কারোই ফলাফল তেমন উল্লেখযোগ্য হবে না, তাও জানতাম। তবু এই কটি বছর ধরে আমরা প্রতিদিন এই স্কুলের চারটি দেয়ালের মধ্যে যে-বিচিত্র প্রণালিতে জীবনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম—সেই জগৎটিকে চিরকালের মতো পিছনে ফেলে রেখে আসতে কষ্টই হচ্ছিল।

টেস্ট পরীক্ষায় শেখর হয়েছে ফার্স্ট, আমি সেকেন্ড। অফিস রুমের সামনে বড্ড ভিড়—ছেলেরা ফি দিচ্ছে। আমিও কিউতে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এই এক নতুন নিয়ম হয়েছে—সব কিছুতেই 'কিউ' করা। 'র‍্যাশন শপ' থেকে শুরু করে 'বাসস্ট্যান্ড' পর্যন্ত সবকিছুতেই 'কিউ'। যুদ্ধ বাধবার পর থেকেই এই নিয়মটা চালু হয়েছে। নিয়মটা অবশ্য ভালোই—সকলেরই সুবিধা।

হঠাৎ এক সময় চোখে পড়ল, শেখর এক পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, মুখ অন্ধকার। কিউ ছেড়ে আমি তার কাছে এগিয়ে এলাম।

—কি রে! কি হলো তোর? চুপচাপ দাঁড়িয়ে কেন? ফি দিবি না?

—না। আমার আর পরীক্ষা দেওয়া হবে না।

—সে কি! কেন?

—পরশুদিন আমার এক ভাই হয়েছে। বাড়িতে যা টাকা ছিল খরচ হয়ে গেছে। ফি দেয়ার

টাকা নেই।

ফি দেয়ার টাকা নেই। শেখরের মতো ছেলে পরীক্ষা দিতে পারবে না।

শেখর আবার বললো : মার শরীর এমনিতেই ভেঙে পড়েছে। আমি পরীক্ষা দিতে পারব না বলে কান্নাকাটি করে শরীর আরো নষ্ট করছেন। ছোট ভাইটির গলা টিপে মেরে ফেলতে চাইছিলেন। যত রাগ তারই ওপর।

—থাকগে সে সব কথা। তোর কাছে টাকা আছে কত?

—সাড়ে সাত টাকা আছে।

—লাগবে তো সবসুদ্ধ পঁয়ত্রিশ। তুই এখানেই দাঁড়িয়ে থাক। আমি দেখি কি করতে পারি। খবরদার, কোথাও যাস নে! আমি যতক্ষণ না আসি, দাঁড়িয়ে থাকবি। যতই দেরি হোক...

কাঞ্জিলাল, শিশির প্রমুখের অবস্থা ভালো। তাদের কাছে গিয়ে সবকিছু খুলে বললাম : শেখর পরীক্ষা দিতে পারবে না, যদি না আজকেই কিছু টাকা সংগ্রহ করতে পারি।

কাঞ্জিলাল আর শিশির একটু গম্ভীর হলো, মুখ অন্ধকার করলো, তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল।

টাকা কোথায় পাব! দুঃখিত।

কাঞ্জিলালের কাছে টাকা ছিল। সবসময়ই থাকে। স্কুলের ছাত্র হলে কি হবে, টাকা সবসময়ই থাকে। বড় বাজারে কাঞ্জিলালের বাবার বড় দোকান আছে। বাপের এক ছেলে। ওদের বংশে আর কেউ লেখাপড়া করে নি। সে যখন যা চাইত, তাই পেত। দোকানে গিয়ে ক্যাশ খুলে যখন-তখন টাকা নিয়ে আসত।

শেখরকে উদ্ধার করবার জন্য যে সে টাকা দেবে না, আমি জানতাম। বস্তুত নিজের ক্ষতি করে কাউকে উদ্ধার করবার কথা সে ভাবতে পারে না, তবু তারই কাছে ছুটে গিয়েছিলাম—ছুটে যাবার মতো জায়গা বেশি ছিল না, তাই।

কাঞ্জিলাল বহুক্ষণ ধরে আমার পকেটে গোঁজা কলমটির দিকে ফিরে ফিরে দেখছিল। এক সময় বললো : কলমটি কোথায় পেলিরে! বেশ সুন্দর তো! বিক্রি করবি?

কাঞ্জিলালের ব্যবহারে আমার মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। জবাব দিলাম : ওসব বিক্রি-টিক্রির পেশা আমাদের আসে না। ওসব বড় বাজারেই শোভা পায়।

সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে কাঞ্জিলাল বললো : পরের কাছ থেকে ভিক্ষে করে সাহায্য করার মধ্যে বাহাদুরি কিছুই নেই, ও সবাই পারে। নিজের ট্যাকের পয়সা খরচ করে সাহায্য করলে তবে বুঝি, হ্যাঁ মরদ বটে।

—আমার কাছে টাকা থাকলে তোর মতো ছুঁচোর কাছে আসতাম না। তাছাড়া বাহাদুরি করবার কোনো উদ্দেশ্যই আমার নেই।

—টাকার পথ তো বাতলে দিলাম। কলমটা বিক্রি করলেই টাকা আসে।

—কত দিবি?

—পনের টাকা দিতে পারি।

মাত্র পনের টাকা। এরকম একটা কলমের দাম কত জানিস?

—অত কথা শুনতে চাই না। দিবি তো বল।

তখন যুদ্ধের বাজার। একে তো কলম পাওয়াই যায় না—তার ওপর লাইফ-টাইম শেফার্স। আশি নব্বুই টাকা দিয়েও কলম মিলবে না। একটু ঘোরাঘুরি করলেই বেশি দাম

পাওয়া যায়। কিন্তু সময় কোথায়? আজকেই ফি দেয়ার শেষ দিন।

—আচ্ছা, তাই দে।

কলমটা বিক্রিই করে ফেললাম। সেলিনার কলম সেলিনাকেই ফেরত দেব একেবারে স্থির করে ফেলেছিলাম; কিন্তু ঘটনাচক্রে কিসে যে কি হয়ে গেল বুঝবার আগেই কলমটা হাতছাড়া হয়ে গেল।

—তাহলে বিক্রি-টিক্রির পেশা যে একেবারেই আসে না তা নয়। ঠ্যাকা পড়লে আসে—পকেটে কলমটা গুঁজতে গুঁজতে কাঞ্জিলাল বললো।

—কোথায় আর আসে! তোদের দোকানে কলমটা কি আর নব্বুই একশ' টাকায় বিক্রি হতো না। একে তো বড় বাজার তার ওপর কালো বাজার।

এই বলে আমিও পনেরটি টাকা পকেটে গুঁজলাম। তাবপর দু'জন দু'দিকে চলে গেলাম।

শেখরকে আমি অপেক্ষা করতে বলে এসেছিলাম। ফিরে এসে দেখলাম সে সেই একইভাবে একই জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। চোখ দুটি তার অফিস-রুমের দিকে নিবদ্ধ—যেখানে ছেলেরা ফি দিচ্ছে; কিন্তু তার চোখ দুটি যে কিছু দেখছে মনে হয় না। শেখর এমনই স্থির উদাসীন, সমস্ত সুখ-দুঃখানুভূতির অতীত যে রক্তে মাংসে গড়া মানুষ বলেই তাকে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, একটা পাষাণ মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। তারই পায়ের কাছে একটু ছায়া দেখে একটি বিড়াল নিরুপদ্রব শান্তিতে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঝিমুচ্ছে। শেখরের কাছ থেকে যে কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই, বিড়ালটিও টের পেয়েছে।

—রোদে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

—তুই যে বললি দাঁড়িয়ে থাকতে।

—গাধা কোথাকার। রোদ থেকে সরে ছায়া দেখে দাঁড়াতে পারিস না! তারপর, শোন! সুখবর আছে। পনেরটি টাকা যোগাড় হয়েছে।

—আমিও আরো আড়াইটি টাকা যোগাড় করেছি।

—তুইতো দেখি মুনি ঋষি হয়ে গেছিস। আমি ছুটোছুটি করে হয়রান হয়ে গেলাম, আর তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আকাশ থেকে টাকা পেড়ে আনলি?

—আকাশ থেকে না রে। দেউকী দিয়ে গেল।

—দেউকী? স্কুলের দারোয়ান তোকে টাকা দিয়ে গেল। সে জানল কি করে তোর টাকার দরকার?

—আমাকে এখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে জিগ্যেস করল, সবার মতো আমিও ফি দিচ্ছি না কেন? তুই তো জানিস, ও কত দিনের পুরোনো লোক, ও সব জানে। আমাকে ছেলেবেলা থেকে দেখেছে, আমিও তাকে সব খুলে বললাম।

—সব? তোর ভাই হবার কথা, তোর মার কথা, সব বললি? তোর লজ্জা করল না?

শেখর কিছু বললো না। মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকল। রাগে আমার সমস্ত গা জ্বালা করছিল।

—তোর লজ্জা-শরম কিছু বাকি নেই। একটা দাবোয়ানের কাছ থেকে তুই টাকা নিস' সে ব্যাটা গেছে কোথায়?

—সে তার বাড়ি গেছে! তার কাছে আরো পাঁচটি টাকা আছে, তাই আনতে গেছে। তোর মতো সেও আমাকে এখানে অপেক্ষা করতে বলে গেছে।

শেখর অপরাধীর মতো ম্লান সঙ্কোচে কোনোমতে কথাগুলো উচ্চারণ করল। শেষের দিকে

তার গলা ভেঙে এলো। তবু বললো : লজ্জা করা কি আর আমার সাজে। আমি পরীক্ষা দিতে না পারলে মা মরেই যাবে। ছোট ভাইটিকেও গলা টিপে মেরে ফেলবে। তুই জানিস, আজকাল আমাদের ভালো করে খাওয়া জোটে না! যুদ্ধ যবে থেকে শুরু হয়েছে, চাল-ডালের দাম এত বেড়ে গেছে, আমরা দু'বেলা পেট পুরে খেতে পাই না। দেশে একটু বা জমিজমা আছে তার থেকেও কিছু পাই না। দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। মা-ও একবেলা খায়। মার কষ্ট দেখলে বুক ফেটে যায়। মনে হয় ছুটে যাই, ভিক্ষে করে কিছু চাল-ডাল নিয়ে আসি। শেষ পর্যন্ত পারি না। লজ্জায় মাথা কাটা যায়।

অবাক হয়ে যাই। শেখরের চোখ থেকে একফোঁটা অশ্রুও গড়িয়ে পড়ল না। দুপুরবেলার রোদের মতো চোখ দুটি জ্বলতে লাগল।

—চুপ চুপ। আশেপাশে অনেক লোক আছে। তুই এখানেই দাঁড়িয়ে থাক। আমি একটা ব্যবস্থা করবই।

—আমার আর পরীক্ষা দেওয়া হলো না ভাই।

—হবে রে হবে। তুই এখানেই থাক, আমি এলাম বলে।

এই বলে আমি হনহন করে বেরিয়ে এলাম।

এলাম তো বটে, কিন্তু যাব কোথায়? গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে খানিকক্ষণ ভাববার চেষ্টা করলাম।

বেলা তখন প্রায় দ্বিপ্রহর। সেলিনা এইমাত্র বই ছেড়ে উঠল। তারও আই.এ পরীক্ষা এসে গেল প্রায়। ড্রেসিং টেবিলের ওপর থেকে তেলের শিশিটা তুলে নিল, ছিপি খুলল, তালুর ওপর একটুখানি তেল ঢালল। তারপর একহাতে খোঁপা খুলে, দুই হাত দিয়ে মাথায় তেল ঘষতে যাবে, এমন সময় আমাকে দেখতে পেল।

—হঠাৎ এ সময়?

—আমার কিছু টাকা দরকার।

এক মুহূর্ত সেলিনা বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর তার ওষ্ঠাধরে এক বিচিত্র হাসির তরঙ্গ দেখা গেল—তাও এক মুহূর্তের জন্যই।

অবিচলিত হাত দিয়ে সে বোতলের ছিপি বন্ধ করল। বোতলটি টেবিলের ওপর যথাস্থানে রেখে দিল, তারপর আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে জানালার দিকে এগিয়ে গেল। সেখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সে অল্পকাল কি যেন চিন্তা করল। দেয়াল ঘড়ির টিক টিক শব্দ ছাড়া কামরা নিস্তব্ধ।

এক সময় সেলিনা ফিরে দাঁড়ালো। এগিয়ে এসে জিগ্যেস করল : টাকা? কি করবে টাকা?

—দরকার আছে।

—শুনিই না কি দরকার।

—আছে একটা দরকার।

—আচ্ছা বাবা আচ্ছা। আমি আর প্রশ্ন করব না।

তারপর আবার কোনো কথা নেই।

এক সময় আমার কানের ওপর মুখ নাবিয়ে এনে সেলিনা বললো, ফিসফিস করে :

—দেব। কিন্তু তোমাকে আমার কথা শুনতে হবে। সব কথা। শুনবে তো?

সেলিনার কণ্ঠস্বর সাপের নিশ্বাসের মতোই হিসহিস করে উঠল।

—শুনব। বলেই টাকা নিয়ে আমি সেখান থেকে পালালাম।

ফি দেয়ার দিন শেখর কিছুতেই ছাড়ল না। তাদের বাড়ি ধরে নিয়ে এলো। বেড়া দেওয়া দুটি ঘর। সামনে একটুখানি উঠান, তাও বেড়া দিয়ে ঘেরা। লাউ আর তরি-তরকারির কিছু কিছু গাছ, অনেকগুলো হাতের যত্নের পরিচয় দিচ্ছে।

শেখর বাইরের ঘরে আমাকে বসিয়ে রেখে অন্দরে চলে গেল। একটু পরই ফিরে এসে বললো : চল, ভিতরে চল। মা ডাকছেন।

এবার আমরা বেড়ার দ্বিতীয় ঘরটির সামনে এসে দাঁড়ালাম। একটা মাদুরের ওপর ছেঁড়া বালিশে মাথা রেখে শেখরের মা শুয়েছিলেন। তাঁর কোলের কাছে শেখরের "ছোট ভাই"।

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

শেখর আমার সমবয়সী। তার মার একটা ছবি আমি মনে মনে কল্পনা করে নিয়েছিলাম—আমার আত্মার ছবির সঙ্গে কোথায় যেন তার মিল ছিল।

কিন্তু দৃষ্টির অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমার কল্পিত ছবির কোনোই মিল নেই।

শেখরের মার বয়স কম, অবিশ্বাস্যরকম কম, অন্তত দেখে তাই মনে হয়। গায়ে একটা লাল পেড়ে সাদা শাড়ি; কিন্তু সেই দীন বেশেই তাকে রানীর মতো সুন্দর লাগছিল।

আমি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করছিলাম। তিনি ইশারা করে নিষেধ করলেন। বললেন : না বাবা, তোমাকে ভিতরে আসতে বলব না। এক বাটি চা পর্যন্ত দিতে বলব না—বলতে পারি না। কিন্তু তোমার মাথার ওপর মার আশীর্বাদ রইল। দেখবে তুমি বড় হবে, অনেক বড় হবে।

অবাক হবার আরো বাকি ছিল। একটি চৌদ্দ পনের বছরের মেয়ে, অবিকল শেখরের মায়ের মতো দেখতে, একটা পেয়ালায় গরম দুধে ফুঁ দিতে দিতে ঘরে প্রবেশ করল। পেয়ালাটি মার শয্যাপার্শ্বে রাখল। দুটি চোখ তুলে একবার আমাকে দেখল।

আমি বেরিয়ে এলাম। শেখর আমার পিছনে পিছনে বেরিয়ে এলো। বললো : ঐ মেয়েটি আমার বোন। আমার পিঠাপিঠি।

সারাটা দিন বড়ই উত্তেজনায় কেটেছে। সারাটা পথ আমার মাথার মধ্যে নানান চিন্তা আনাগোনা করছে—কানের মধ্যে নানা কথা বাজতে থেকেছে। সেলিনার কথা "আমার সব কথা শুনতে হবে। শুনবে তো?" বারবার ভাবতে চেষ্টা করলাম, কি সে কথা, কি তার রহস্য, আবার শুনতে পাই শেখরের মার কণ্ঠস্বর : "এক বাটি চা-ও দিতে বলব না—বলতে পারি না!"

কেন এক পেয়ালা চা-ও দিতে বলতে পারেন না? তাঁরা গরিব বলে? আমি মুসলমান বলে?

নিশ্চয়ই আমি মুসলমান বলেই। এই সময় আর একদিনের কথা মনে পড়ল। সেদিন কি কারণে স্কুল হঠাৎ ছুটি হয়ে গিয়েছিল। আমি, শিশির আর মহেন্দ্র নামে একটি ছেলে গল্প করতে করতে শিশিরদেরই বাড়ি পৌঁছে গেলাম। রৌদ্রে হাঁটবার পর আমাদের সকলেরই ভয়ানক তেষ্টা পেয়ে গিয়েছিল। মহেন্দ্র শিশিরকে বললো : "এক গ্লাস জল খাওয়া তো রে!" তৎক্ষণাৎ ভিতর থেকে কাঁসার গ্লাসে এক গ্লাস পানি এলো। এবার আমি বললাম : "আমিও খাব।" হঠাৎ শিশিরের মুখ শুকিয়ে গেল—আমার কণ্ঠের চাইতেও শিশিরের মুখ অধিক শুষ্ক মনে হচ্ছিল। সে অত্যন্ত বিব্রত হয়ে আমতা আমতা করে কোনোমতে বললো : "জল কি খাবি! চল, তোকে ভালো জিনিস খাওয়াব। পাশের পানের দোকানে চল, বোতল থেকে লেমনেড খাবি।"

অকস্মাৎ আমারও দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে গেল। আমি বললাম : "থাক। লেমনেড খেতে আর ভালো লাগবে না।" বলেই সেদিন বিদায় নিয়েছিলাম।

তেমনই কোনো বাধা নিশ্চয়ই শেখরের মায়েরও স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহশীলতার অথবা

কৃতজ্ঞতাবোধের—উৎস মুখ রুদ্ধ করে দিয়েছিল।

যখন বাড়ি ফিরলাম তখন ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় আমি কাতর।

আম্মা বারান্দার একপাশে চুপচাপ বসেছিলেন। এমনিতেই তিনি গম্ভীর, আজ আরো গম্ভীর।

—ফি দিলি?

—দিলাম। বড্ড খিদে পেয়েছে। কিছু খেতে দাও।

আঁচল থেকে আম্মা এক আনা পয়সা বের করে দিলেন।

—যা বাবা। আজকের মতো কিছু মুড়ি-মুড়কি কিনে খেয়ে নে।

—মুড়ি-মুড়কি? মুড়ি-মুড়কি দিয়ে দুপুরের খাবার?

—হ্যাঁ বাবা। আজকে আর চুলো ধরে নি।

—চুলো ধরে নি? কেন ধরে নি শুনি?

—বাজারে কয়লা পাওয়া যাচ্ছে না। যবে থেকে লড়াই শুরু হয়েছে একটা না একটা হাঙ্গামা লেগেই আছে।

—তুমি কিছু খেয়েছ?

—হ্যাঁ খেয়েছি। বকাস নে যা।

—উঁহু। তুমি খাও নি। তোমার মুখ দেখেই টের পাচ্ছি।

—ভারি লায়েক হয়েছ তুমি, তাই না! মুখ দেখেই টের পাচ্ছ?

আম্মার প্রশ্নের কোনো জবাব দিলাম না। দেয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। আম্মার পায়ের কাছে বসে পড়লাম। কেউ কোনো কথা বলি না। এইভাবেই অনেকটা সময় কেটে যায়। আমিই এক সময় বললাম : আমি আর পড়ব না। চাকরি করব।

এত দুঃখেও আম্মার মুখে হাসি এলো। চেয়ে চেয়ে তাঁর এই হাসিই দেখতে লাগলাম। তাঁকে যেন কিছু স্পর্শ করে না—কোনো দৈন্যই যেন তাঁকে ম্লান করতে পারে না।

—তোকে চাকরি দেবে কে শুনি?

আমি এবারও কোনো জবাব দিলাম না। কিন্তু আমার দুটি ওষ্ঠের এক বিবিক্ত ভঙ্গিমা এই বলতে চাইল, চাকরি সংগ্রহের মতো অনায়াসসাধ্য কাজ আর কিছুই নেই।

—কি রে, কথা বলছিস না যে।

—চাকরির অভাব। যুদ্ধের সময় কত জায়গায় সেধে লোক নিচ্ছে। ইচ্ছে করলে কালকেই 'এ-আর-পি'তে জয়েন করতে পারি।

এতক্ষণ আম্মার আচরণের মধ্যে কিছুটা প্রচ্ছন্ন কৌতুক ছিল। মুখে যতই লম্ফঝম্প করি, চাকরির বাজার বড়ই কঠিন তিনি তা জানতেন। কিন্তু যুদ্ধের বাজারে চাকরি যে বাস্তবিকই সস্তা হয়ে গেছে আমার কাছ থেকে তারই ইঙ্গিত পেয়ে তিনি শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

—ছিঃ বাবা। ও-সব কথা মনে আনতে নেই। যুদ্ধ আজ আছে কাল নেই। যুদ্ধের চাকরিও আজ আছে কাল নেই। তখন করবি কি? লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে এক্ষুণি কাজে ঢুকলে তখন পথে বসবি। এখন মন দিয়ে পড়াশোনা কর। যতই কষ্ট হোক, আর কোনো কথাই ভাববি না। লেখাপড়া কর, তারপর যদি তোকে মোটও বইতে হয়, তার মধ্যেও ইজ্জত আছে।

—আচ্ছা আচ্ছা, সে হবেখন।

এই বলে উঠে পড়ি।

বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে ঘুমাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পেট খালি থাকলে পোড়া চোখে

ঘুমও আসতে চায় না। একটু পরেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। গোসলখানায় গিয়ে ঢুকলাম। কাপড় ছেড়ে ভালো করে মাথায় পানি ঢালতে লাগলাম।

—তুই করছিস কি! অত পানি খরচ করিস নে। অত পানি পাবি কোথায়?

কি জ্বালা। একটু আয়েস করে গোসল করব সে উপায়ও নেই।

যুদ্ধের পর থেকে পানি সরবরাহ পর্যন্ত কমে গেছে। তাড়াতাড়ি গা মুছে কাপড় পরে গোসলখানা থেকে বেরিয়ে আসি।

—এই এলি, আবার যাচ্ছিস কোথায়? একটু সবুর কর, দেখি রান্নার ব্যবস্থা করতে পারি কি না।

—আমি এই এলাম বলে।

এই বলে বেরিয়ে পড়লাম। আধঘণ্টা পর একটা ঠোঙায় করে কিছু খাবার কিনে বাড়ি ফিরলাম। ঠোঙাটা আম্মার সামনে তুলে ধরলাম।

—হালুয়া-কচুরি কোথায় পেলি?

—কোথায় আবার পাব! কিনে আনলাম।

আম্মাকে আর কোনো প্রশ্ন করবার অবসর না দিয়েই তাঁর হাত ধরে দু'জনেই মাটিতে বসে পড়লাম।

—এই নাও, খাও।

—তুই খা, আমি খেয়েছি।

—ওসব চালাকি চলবে না। তুমি খাও নি আমি জানি।

—আচ্ছা বেশ। আগে তুই খেয়ে নে। আমার জন্য একটু রেখে দিস। আমি হাতমুখ ধুয়ে এলাম বলে।

কলম-বিক্রি এবং "সব করব" এই প্রতিশ্রুতি-লব্ধ উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে কেনা কচুরি খেতে বসে গেলাম।

আম্মা একটু পরই আঁচলে হাতমুখ মুছতে মুছতে ফিরে এলেন। সারাদিনের অনাহারে ক্ষুৎপিপাসাতুর মুখ এখন অনেকটা প্রসন্ন-উৎফুল্ল। ঠোঙাটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিই।

—তুই খেয়েছিস?

—না খেয়েই তোমাকে দেব, আমাকে অমন মহাপুরুষ পেয়েছ!

—আচ্ছা বীর পুরুষ, দে!

আম্মা ঠোঙাটা হাতে নিলেন।

এমন সময় কোথা থেকে হঠাৎ মেজ ভাই উপস্থিত হলেন। এক নিমেষে আম্মার হাত থেকে ঠোঙাটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে খেতে শুরু করে দিলেন। আমি বা আম্মা কেউ বাধা দিলাম না।

এই মেজ ভাই কিছুদিন থেকে আজব বেয়াড়া হয়ে গেছেন। কারো কথা শুনবেন না, কারো মানা মানবেন না। মাথাটা বেজায় গরম। একটা ঝড়ো হাওয়ার মতো সবসময় ঘরের ভিতর ঘুরে বেড়াবেন—হাতের কাছে যখন যা পাবেন তাই তছনছ করে দেবেন। লেখাপড়া সব ছেড়ে দিয়েছেন। হয় সারাটি ঘর দাবড়ে বেড়াবেন নয় বিছানায় গুম হয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকবেন, দিনের পর দিন কোনো কথাই বলবেন না। মুখে একটি কথা নেই, চোখে পলক নেই, সারাটি দিন উন্নেত্র হয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে থাকবেন। বহুদিন পর যখন মৌনভঙ্গ হবে, তখন তাঁর প্রথম বাণী: 'আমি ভীম ভাসমান মাইন' সবাই বলাবলি করেন : মেজ ভাইয়ের মাথাটাই না কি গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

মেজ ভাই বিনা রণেই জয় করলেন—এটা তাঁর মনঃপূত হলো না। আম্মার ভাগের হালুয়া-কচুরি কিছুটা খেয়ে নিয়ে তাঁর কি মনে হলো—ঠোঙাটা আম্মাকে ফেরত দিলেন।

আম্মা বললেন : তুই খা না।

বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে উত্তর এলো : না তুমি খাও। আমি খেয়েছি। তুমি পয়সা দিয়েছিলে।

—তাতে কি বাবা। তুই খা। তোর পেট ভরে নি।

—না। তুমি খাও বলছি।

এমন সময় হঠাৎ মেজ ভাই আম্মাকে দুই হাত দিয়ে কোলে তুলে নিয়ে নাচতে শুরু করে দিলেন।

—আরে থাম থাম। করছিস কি। পড়ে যাব যে।

যেমন হঠাৎ কোলে তুলে নিয়েছিলেন তেমনি অকস্মাৎ কোল থেকে নাবিয়ে দিয়ে কঠোর কণ্ঠে তিনি আম্মাকে প্রশ্ন করলেন : তোমাকে তো লোক ভালোই মনে হয়। কিন্তু তোমার ভাইটি অমন চামার কেন?

—ছিঃ বাবা ছিঃ। তোর মুরুব্বি না! লোকে বলবে কি?

মেজ ভাই অনেকক্ষণ আম্মার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর গালে একটা চুমু দিয়ে যেদিক দিয়ে এসেছিলেন সেদিকেই চলে গেলেন। কেবল সিগারেটের ধোঁয়ার মতো মুখ থেকে একটু পরপর বেরুতে লাগল : ভীম ভাসমান মাইন।

হালুয়ার ঠোঙাটা যে কখন মাটিতে পড়ে গেছে কেউ খেয়াল করে নি। কয়েকটি কাক তারই ভাগ নিয়ে কাড়াকাড়ি মারামারি করছিল।

আম্মা একটা ছোট্ট নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

আমরা ম্যাট্রিক পাস করলাম। পরীক্ষার ফলাফল মোটের ওপর ভালোই হলো। মুশতাক আর কাঞ্জিলাল প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলো, আমি আর শেখর রিপন কলেজে। আমি আর মুশতাক আর্টস। শেখর আর কাঞ্জিলাল সায়েন্স। শিশির আর বদ্রি গেল সেন্ট জেভিয়ার্সে, উভয়েই আর্টস। মফিজ গেল ইসলামিয়া কলেজে, সেও আর্টস।

সেলিনা আর অনিমাও আই.এ পাস করল। সেলিনা নিল ইংরেজিতে অনার্স, অনিমা ইকনমিকসে—উভয়েই বীটন কলেজেই থেকে গেল।

দ্রুত সময় কেটে যেতে লাগল। যুদ্ধ ঘরের কাছাকাছি চলে এলো, আর দুর্ভিক্ষ দ্বারে দ্বারে।

তেইশ

সেদিন ঘরে আর কেউ ছিল না। আমি চলে আসছিলাম, সেলিনা বাধা দিল।

—যেও না। দাঁড়াও।

—আমার কাজ আছে।

—তর্ক করো না। মনে আছে সেদিন কি কথা দিয়েছিলে?

—কি কাজ বলো, করে দেব; কিন্তু বসতে পারব না।

—তোমাকে বসতে বলেছি আপাতত এইটেই তোমার কাজ। আমি গা ধুয়ে এখুনি আসছি।

ভয়ানক গরম পড়েছে। গায়ে কাপড় রাখা যায় না। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে, তবু ছটফট

করতে লাগলাম। কখন যে তন্দ্রায় চোখ বন্ধ হয়ে গেছে টেরও পাই নি।

বাইরে কতগুলো কুকুর প্রাণপণে চেঁচামেচি আর কামড়াকামড়ি করছে, তারই বিকট শব্দে তন্দ্রা কেটে গেল।

চোখ মেলে সোজা হয়ে বসলাম।

সামনে সেলিনার ঘরের দরজা খোলা, একটা শুধু পাতলা পর্দা ঝুলছে। এক সময় পর্দাটা হাওয়ায় সরে গেল। সেলিনা প্রকাণ্ড দেয়াল আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে প্রসাধন করছে, আমার দিকে পিঠ। তখনো তার সাজসজ্জা অসম্পূর্ণ। হঠাৎ আয়নাতেই আমার চোখের ওপর তার চোখ পড়ল। কাঁধের ওপর আঁচলটা ভালো করে টেনে নিয়ে সে ঝট করে সেখান থেকে সরে গেল। অল্প পরেই খট করে দরজা বন্ধ করবার শব্দ হলো।

আমি সেখানেই বসে বসে ঘামতে লাগলাম। উৎকট গরম পড়েছে এবার কলকাতায়। পাখাটা পুরো দমে ছেড়েছিলাম; কিন্তু তাও কি গরম কমে!

মিনিট পনের পর সেলিনা বেরিয়ে এলো। ফিরোজা রঙের শাড়ি গায়ে, মুখে যৎসামান্য প্রসাধনের চিহ্ন; কিন্তু সেই অল্প বয়সেও, অথবা হয়তো বয়স অল্প বলেই মনে হলো, এত রূপ বুঝি আর কোথাও দেখি নি, কোথাও কখনো দেখব না।

আমি তবু তেমনি বসেই থাকলাম।

—অমনভাবে বজ্রাহতের মতো বসে আছ কেন? কেউ দেখলে ভাববে ভূত দেখেছ!

বলে সেলিনা একটুখানি হাসল।

—কোথায় যেতে হবে?

—আমি যেখানে যাব।

—সে জাহান্নামটি কোথায়?

—সেলিনা হাসল। আশ্চর্য সে হাসি।

—সত্যিই জাহান্নাম। আমি অস্বীকার করব না; কিন্তু তোমাকে আমার সাথে আসতে হবে।

আমি যন্ত্রচালিতের মতো উঠলাম।

ট্রাম এসে এসপ্ল্যানেড পৌঁছল। সেলিনা বললো : আমরা যাব খিদিরপুর। কিন্তু তার আগে চলো কে-সি-দের দোকানে বসে কিছু স্পঞ্জ রসগোল্লা খেয়ে নি। কি বলো?

মনে মনে বললাম : আমি তো দোজখে যাবার জন্যই বেরিয়েছি, রসগোল্লা খাব সে আর এমনকি বড় কথা।

তখন যুদ্ধ চলছে। মার্কিন সৈনিকদের আনাগোনায় এসপ্ল্যানেড চৌরঙ্গী ফুটপাত, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, ট্রাম-বাস, পথঘাট সবই জনাকীর্ণ। বোমা পড়ার ভয়ে কলকাতার অধিকাংশ গৃহই তখন গৃহীহীন, এমনকি আমরাও শিগগিরই কলকাতা ত্যাগ করব সেই রকম কথা চলছে। তবে গৃহের বাইরে তেমনি ভিড়।

সেলিনা আমার হাত ধরে এগিয়ে এসেছিল। কে-সি-দের দোকানেও অসম্ভব ভিড়। কোথাও একটা চেয়ারও খালি নেই, অনেকে আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই এটা-ওটা-সেটা কিনছেন, খাচ্ছেন। একটি কোণে একটি অনভ্যস্ত দৃশ্য চোখে পড়ল; অনভ্যস্তই-বা বলি কেন, এই রকম দৃশ্য একটু একটু করে অভ্যস্ত হয়ে আসছিল। এক বিদুষী বাঙালি-কন্যা এক শ্বেতাঙ্গ সৈনিকের সঙ্গে বসে একাকী চা পান করছেন। এই দৃশ্যটি আরো একটি কারণে মনে আছে। কচুরি-রসগোল্লা-তরমুজা প্রভৃতি খাদ্যের প্রতি সমুদ্রপারের এই আগন্তুকদের রুচি কেবলমাত্র তখনই দৃষ্টিগোচর হতে শুরু হয়েছে।

সেলিনা বললো : চলো। আমাদের আর খাওয়া হলো না।

তারপর চলতে চলতে বললো : মেয়েটি কে জান? আমার সঙ্গে পড়ত। গোল্লায় গেছে।

—গোল্লায় কি কেবল সে একাই গেছে?

এক পাশে চৌরঙ্গী আর এক পাশে সবুজ মাঠ। ট্রাম হু-হু করে ছুটে চলল। অনেকক্ষণ কারো মুখে কোনো কথা নেই। এতক্ষণে সেলিনা আমার প্রশ্নের জবাব দিল।

—না। সে একাই নয়। আমিও গেছি।

বলে সে আবার অধোবদন হয়ে বসে থাকল।

আবার সে-ই বললো : তার গলার আওয়াজ সত্যকার অনুশোচনায় ভারাক্রান্ত হয়ে এলো।

—আমি জানি, আমি যা করছি তা মন্দ, তা অত্যন্ত মন্দ আর গর্হিত। কিন্তু কি যেন হয়, আমি কিছুতেই স্থির থাকতে পারি না। বারবার তার কাছে ছুটে যাই।

—যার কাছে যাও, আর এখনো যাচ্ছ, তাকে আমি একবারই দেখেছি। সে তোমার অযোগ্য।

—তা-ও মানি।

—তবে?

—সে তুমি বুঝবে না।

—আজ তার কাছে না গেলেই নয়?

—আজ তার আম্মা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

—তাঁকে আগে কখনো দেখেছ?

—না। তাঁর আম্মা আছেন কি না, আর কে কে আছেন কিছুই জানি না।

একবালপুর রোডের কাছে এসে আমরা ট্রাম থেকে নেবে পড়লাম। এ-গলি ও-গলি পেরিয়ে আমরা ছোট্ট একটা প্রিন্টিং প্রেসের সামনে এসে দাঁড়ালাম। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এমন এক অঞ্চলে সেলিনার কি কাজ থাকতে পারে আমি কিছুমাত্র অনুমান করতে পারলাম না। কড়া নাড়তেই সেলিনার বন্ধু—সেই হাফ শার্ট পরা বন্ধু—দরজা খুলে দিল। সামনে প্রেস—পাশে দুইটি ঘর।

—তুমি এখানেই থাকো না কি?

হ্যাঁ।

—তোমার আম্মা কোথায়?

—আছেন ভিতরে।

সেলিনা মুহূর্তকাল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। হঠাৎ তার চোখে কিসের যেন সন্দেহের ছায়া নেবে এলো।

আরো দুই দীর্ঘ মুহূর্ত ইতস্তত করে বললো : আচ্ছা চলো।

কিন্তু এ বাড়িতে কোনো স্ত্রীলোক থাকে বলে মনে হলো না। অথচ সেই সেলিনা সেই ছেলেটির আম্মার সঙ্গে দেখা করতে ভিতরে চলে গেল। আমি একটা টুলের ওপর বসে মশা তাড়াতে লাগলাম, তাই সময়টা কেটে গেল।

কতটা সময় যে কেটে গেল জানতেও পারলাম না। অন্ধকার ভয়ানক গাঢ় হয়ে এলো। কোথাও কোনো সাড়া-শব্দ নেই। এক সময় মনে হলো কোথায় যেন একটা আর্ত চিৎকার শুনলাম "না না না"। মনে হলো বহুদিন আগে এক দুঃস্বপ্নে শোনা দূরাগত শব্দ—অথচ অন্ধকারের বুকে এই শব্দটি যেন হাতুড়ি মারতে লাগল।

কিছুটা সময় কেটে গেল। বেশি না। কিন্তু আমার বয়স এক নিমেষে এক যুগ করে বাড়তে লাগল। একটু পরেই সেলিনা বেরিয়ে এলো।

—চলো আমরা যাই।

তার গলার আওয়াজ বাদলের মতো সিক্ত। পিছনের ঘরটিতে একটি হারিকেন জ্বলছিল। খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে যতটা আলো আসে তারই সাহায্যে দেখলাম, সেই ছেলটিও পিছনে এসে দাঁড়ালো। ছেলেটির পিছনেই বিকট অন্ধকার, তাই তাকে ভালো দেখা যায় না। শুধু সেই অপ্রচুর আলোতে তার মুখের যে ছায়া দেয়ালে প্রতিফলিত দেখলাম তা অত্যন্ত বিকৃত মনে হলো।

আমাদের পিছনের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম।

আমার পা টলছিল, কেন জানি না। এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় সাবাটা শরীর থরথর করে কাঁপছিল; এক অনুপলব্ধ বেদনায় চোখের অশ্রু অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছিল। গলার কাছে এক প্রকার অবর্ণনীয় ব্যথা অনুভব করতে লাগলাম—গলায় সুপারি আটকে গেলে যেমন করতে থাকে।

সেলিনা নীরবে হাঁটছিল। এক সময় তার দুটি হাত ঝড়ের বুকে ঝরাপাতার মতো কাঁপতে কাঁপতে আমার দুটি হাত চেপে ধরল। তার পা দুটি এমন ভয়ানক কাঁপছিল যেন ভেঙে পড়ে যাবে।

—ধরো। আমাকে শক্ত করে ধরো। আমি পড়ে যাব। আমার শরীর ভয়ানক খারাপ লাগছে। মাথা ঘুরছে।

—কি হয়েছে?

আমি প্রশ্ন করলাম।

সেলিনা নিঃস্বের মতো উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আমারই প্রশ্নের প্রতিধ্বনি করল : কি হয়েছে।

তারপর দুই হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে সেই রাস্তার মাঝখানেই হু-হু করে কাঁদতে শুরু করে দিল। কেবল পাগলের মতো বলে যেতে লাগল : বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও, সারা জীবন তোমার কেনা হয়ে থাকব।

সেলিনার অন্যান্য বহু আচরণের মতো তার এ কথারও সঠিক অর্থ বুঝলাম না।

রাস্তার লোক চলাচল কম বটে; কিন্তু তবু মাঝে মাঝে দু' একটি পথিক বিস্মিত চোখ একবার এদিকে তুলে আবাব নিজ নিজ গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

কিন্তু এক মাঝবয়সী লোক এগিয়ে এলেন। তিনি কিছু বলবার আগেই আমি বললাম : আমার বোন। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

ভদ্রলোক চলে গেলেন; কিন্তু তবু দু'-একবার ফিরে ফিরে আমাদের দেখতে লাগলেন। আমি তাড়াতাড়ি সেলিনার হাত-ব্যাগ হাতড়ে দেখে নিলাম। হ্যাঁ আছে; ট্যাক্সি ভাড়া আছে।

সারাটা পথ কারো মুখে কোনো কথা নেই। সেলিনা এক পাশে মাথা কাত করে চোখ বন্ধ করে পড়েছিল। মাঝে মাঝে তার গলার ভিতর দিয়ে "ওঃ; ওঃ; ওঃ"—এই রকম এক কাতরোক্তি বেরিয়ে আসছিল।

কিন্তু বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে সে নিজেকে অনেকটা সামলে নিল।

সেলিনার আম্মা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি যেন দেখলেন।

—তোরা এতক্ষণ ছিলি কোথায়?

—সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম।

সেলিনা জবাব দিল।

আমি বললাম : মিথ্যে কথা। খিদিরপুরে একটি ছেলের বাসায় গিয়েছিলাম।

সেলিনা ঘুরে দাঁড়াল। তার দুই চোখভরা ভয় আর মিনতি।

আমার দৃষ্টিও কঠোর হয়ে এলো কিন্তু আর একটি কথাও না বলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে চলে এলাম।

চব্বিশ

সেদিন কলেজের পর শেখর কিছুতেই ছাড়ল না। তাদের বাড়িতে যেতেই হবে। ক্লাস ছিল মাত্র দুটি। অগত্যা আমরা দু'বন্ধু এনটালীর দিকে হাঁটতে লাগলাম। সামান্য পথ—অন্যমনস্কভাবে গল্প করতে করতে এগুতে লাগলাম। হঠাৎ একটা ট্যাক্সি আমাদের পাশেই আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল।

আরে সলিল যে।

—তোরা চললি কোথায়?

—বিশেষ কোথাও না। আমাদের বাসায়।

—এই বুঝি তোদের বাড়ি ফেরার সময়? সারা কলকাতা ছুটছে গড়ের মাঠের দিকে, আর তোরা না কি দুটি গাভীর মতো গৃহাভিমুখে! খেলা দেখবি না।

—খেলা আর কি করে দেখব। পকেটও যে গড়ের মাঠ। টিকিট কাটবার পয়সা দেবে কে?

—এই বুঝি তোমাদের সমস্যা! কুছ পরোয়া নেই। সলিল চাটুয্যে এখনো বেঁচে আছে।

বস্তুত সলিলের ভোলই গেছে বদলে। সে বরাবরই একটু বাবু গোছের ব্যক্তি ছিল; কিন্তু এখন রীতিমতো সাহেব। প্যান্ট-শার্ট পরনে, হাতের কবজিতে দামি ঘড়ি—গায়ে একটু মাংসও হয়েছে। মানিয়েছেও দিব্যি। ঘন-ঘন রুমাল বের করে শুষ্ক নাসিকা রক্তিম করে তুলছে—প্রতিবারই সুন্দর একটা গন্ধ নাকে এসে ধাক্কা মারছে।

—তুই এখন কি করিস রে!

সলিল এক কথায় জবাব দিল।

—বিজনেস।

—বিজনেস তো বুঝলাম, কিন্তু কিসের বিজনেস?

—আগে ট্যাক্সিতে উঠে পড়, তারপর সব বলব।

সেই যে সলিল স্কুল ছেড়ে চলে গেল, তারপর তার সঙ্গে এই প্রথম দেখা। যুদ্ধ বাধবার পর সে ব্লেড আর পেরেকের কি এক জাতীয় ব্যবসা করে প্রচুর পয়সা করেছে। যুদ্ধের কাছে সলিল অপরিসীম কৃতজ্ঞ। সে দুই হাত তুলে তার ভগবানকে ধন্যবাদ জানায়। তাছাড়া সে চাল ডাল চিনির র‍্যাশন শপও খুলেছে একটা—সেখান থেকেও পয়সা নেহাৎ মন্দ আসে না। মোটের ওপর আজ সলিল একটা মোটা অঙ্কের মালিক। আমরা দুই ছাত্র যেন আরব্য উপন্যাস শুনছি, এমনই অতৃপ্ত আগ্রহে সলিলের জীবনেতিহাস শুনতে লাগলাম। আমি মুগ্ধ কণ্ঠে বললাম : তুই বলিস কি! এতসব নিজের চেষ্টায় করেছিস!

সলিল একটা সিগারেট ধরালো। তারপর মুখের ভিতর থেকে এক মুখ ধোঁয়া সম্মুখের

দিকে ছুঁড়ে দিয়ে, সে পিছনের গদিতে হেলান দিয়ে আরো একটু আরাম করে বসল। তারপর জবাব দিল :

—নিজের চেষ্টায়? তুই পাগল হয়েছিস! মা কালীর ইচ্ছা না থাকলে কেউ কিছু করতে পারে না।

ট্যাক্সি ততক্ষণে গড়ের মাঠ পৌঁছে গেছে।

মোহামেডান স্পোর্টিং বনাম মোহন বাগানের খেলা। এই খেলাটিতে জিততে পারলেই মোহামেডান স্পোর্টিং চ্যাম্পিয়ন হবে। ট্যাক্সি থেকে নাবতে নাবতে সলিল বললো : আমি কালীর মন্দিরে মানত করেছি, 'মোহামেডান' হারলে জোড়া-পাঁঠা বলি দেব।

আমি অল্প একটু বিস্মিত হয়ে, নেহায়েতই যৎসামান্য বিস্মিত হয়ে সলিলের দিকে একবার তাকালাম। সলিলও এক দ্রুত চলমান মুহূর্তের জন্য বিব্রত হয়ে পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিল। তাড়াতাড়ি বললো : চল রে। একটু পা চালিয়ে চল। টিকিট তো পাওয়া যাবেই না। গেটে জামাইবাবু থাকবেন, তিনিই আমাদের মাঠের ভিতর নিয়ে যাবেন। নে চটপট কর।

জামাইবাবু মোহন বাগান ক্লাবের কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তি। তিনি গেটের কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন। এক সময় সুযোগ বুঝে ইশারা করতেই আমরা তিনজন মাঠের ভিতর চলে এলাম।

যাকে বলে লোকে লোকারণ্য তাই। গ্যালারিগুলোতে তিল ধারণের স্থান নেই। র‍্যামপার্টের বাইরে ফোর্ট উইলিয়মের ওপরও জনসমুদ্র। এমনকি মাঠের চারপাশের গাছের ডালপালায় শাখা মৃগের মতো ঝুলতে ঝুলতে খেলা দেখবার মতো উৎসাহী ফুটবলরসিকও অসংখ্য।

খেলা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে মোহামেডান স্পোর্টিং-এর সেন্টার ফরোয়ার্ড পাঁচজন বিপক্ষ খেলোয়াড়কে কাটিয়ে একক চেষ্টায় এক স্বপ্নতুল্য গোল দিয়ে দিলেন। দলেরর সমর্থকদের গগনবিদারি চিৎকার মিলিয়ে যাবার আগেই আর একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে গেল। রেফারি বললেন : গোল হয় নি! সেন্টার ফরোয়ার্ড, যিনি পাঁচজনকে কাটিয়ে গোল দিলেন, তিনি না কি অফসাইড ছিলেন। সেই রৌদ্রস্নাত অপরাহ্নে মেঘ-চিহ্ন-হীন আকাশ থেকে বজ্রপাত হলেও দর্শকরা এতটা বিস্মিত হতেন না। তবু এটা রেফারির 'ডিসিশন'—এবং ফুটবল খেলা না কি স্পোর্টস, সুতরাং সেই বিচারকের সিদ্ধান্তই শিরোধার্য করে আবার খেলা শুরু হলো। অবশ্য শেষ পর্যন্ত মোহামেডান স্পোর্টিং দলই জিতল।

সলিল শেখরকে বললো :

—যাই বলিস। এই নেড়েরা কিন্তু খেলা কাকে বলে জানে। আমরা শালা চিংড়ি মাছ খাব, আর বাড়িতে বৌকে ঠ্যাঙাব। আরে বাবা, চিংড়ি খেয়ে ফুটবল মাঠে নাবা যায়।

সলিল একবার আড় চোখে আমাকেও দেখে নিল! তার চোখের কোণের যতটুকু দৃষ্টিগোচর হলো ততটা যে কারণেই হোক রক্তিম। কিন্তু আমার উপস্থিতি সে এতটুকু গ্রাহ্য করল না, তার এতটুকু মর্যাদা দিল না। দ্রুত পদক্ষেপ করতে করতে শেখরকেই উদ্দেশ করে বললো : এবার চলি ভাই। শালার মনটাই খারাপ করে দিল। এখন পেটে একটু 'হুইস্কি' না পড়লে কিছুই ভালো লাগবে না। হ্যাঁ ভালো কথা। শেখর, তোর মা কেমন আছেন?

—ভালোই।

—আর চন্দ্রা?

—সেও ভালো।

—আচ্ছা এবার আসি। যাব একদিন তোদের বাড়ি। ... ট্যাক্সি, 'উইণ্ডসর—বার'।

শেখর আমার সঙ্গে চলতে লাগল, তার মাথাটি নত। এক সময় সে অনেকটা অন্যমনস্কের মতো বললো : যাই বলিস। সলিলের মনটা কিন্তু খুব ভালো। এত পয়সা ওদের, কিন্তু এতটুকু দেমাক নেই।

আমি ভালো-মন্দ কিছুই বললাম না।

একটু পর শেখর আবার প্রশ্ন করল :

—কি রে। যাবি না আমাদের বাড়ি?

—না ভাই। আজ থাক। আর একদিন যাব।

আমি এবার চৌরঙ্গী ধরে পার্ক স্ট্রিটের দিকে হাঁটতে লাগলাম। মাঠ-ফেরত লোক বন্যার স্রোতের মতো এগিয়ে চলছে। সবার মুখেই খেলার কথা।

একজন বললো : কিছুতেই ঠেকানো গেল না। শালা রেফারি দ্বিতীয় গোলটাও ডিস-এলাউ করতে পারল না।

দ্বিতীয়জনের জবাব : আর কত করবে বাবা। একটা জলজ্যান্ত গোল নামঞ্জুর করল। তাছাড়া দিব্যি দেখলাম একটা পেনালটি দিল না। আসল কথা—ওদের সঙ্গে পারা অসম্ভব। সে তুমি যতই চাবিকাঠি ঘুরাও না কেন!

ততক্ষণে আমি পার্ক স্ট্রিটে পৌঁছে গেছি।

শ্বেতাঙ্গদের আনাগোনা, উজ্জ্বল বিজলি বাতি, সুন্দর খোলা হাওয়া।

এতক্ষণে বুকভরে নিশ্বাস নিলাম।

সেদিন সকালবেলাই শেখরদের বাড়ি এলাম।

শেখরের বোন তাদের বেড়ায়-ঘেরা বাগানের লাউ গাছগুলো তদারক করছিল। কোমরে তার আঁচল জড়ানো। চওড়া লাল পেড়ে সাদা শাড়িটা আঁটসাঁট করে পরা। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ। লম্বা একটা ছুরি নিয়ে সে একটা লাউগাছের দিকে এগিয়ে গেল। মাথার এক রাশ চুল খোঁপা করে জড়ানো। কিছুক্ষণ চেষ্টা করেও সে লাউগাছের নাগাল পেল না। আমি আস্তে এগিয়ে গিয়ে ডালটা নাবিয়ে দিলাম।

—ওমাঃ আপনি! কখন এলেন?

—তুমি আমাকে চেন?

তার ডাগর দুটি সরল চোখের পূর্ণ দৃষ্টি আমার ওপর এসে পড়ল।

—চিনি না আবার! দাদার এত বড় বন্ধু কেউ নেই। আপনার সাহায্য ছাড়া দাদা পরীক্ষাই দিতে পারত না।

—তোমার নাম কি?

—চন্দ্রা।

—তুমিই চন্দ্রা?

—হ্যাঁ। আপনি আমার নাম শুনেছেন না কি।

নাম শুনেছি, কিন্তু কোথায় শুনেছি সরাসরি বললাম না। বললাম :

—বাঃ সেদিন যে দেখলাম।

—তা বটে।

—তোমার হাতে-পায়ে ময়লা ভরা। যাও ধুয়ে এসো।

—যাই। অমনি দাদাকেও খবর দিই গে।

—একটু দাঁড়াও। তুমি পেয়ারা খাও?

—পেয়ারা? খাই না আবার!

—খাবে? ভালো ডাঁসা পেয়ারা আছে আমার কাছে!

চন্দ্রা সোৎসাহে হাত বাড়িয়ে দিল, পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে হাত সরিয়ে নিল।

—না খাব না। আপনি না মুসলমান। মা রাগ করবে। আপনি হাসছেন যে...

—তোমার কথা শুনে!

—হাসির কথা বলি নি। আমি সত্যিই খাব না।

—খাও, কিচ্ছু হবে না। পেয়ারা খেলে জাত যায় না।

—ঠিক বলছেন?

—ঠিক বলছি।

—আচ্ছা তাহলে দিন। কিন্তু খবরদার মাকে বলবেন না।

—তুমি আগে মুসলমান দেখ নি।

—বেশি না।

—তবু কাদের দেখেছ?

—আমাদের বাড়ির সামনেই যে মাংসের দোকান আছে, সেই দোকানের কসাইকে দেখেছি। আর দেখেছি ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ানকে। তাদের বড্ড ভয় করে। মা সামনে যেতে দেয় না।

—ভয় কেন করে? ওরা কি করেছে।

—কিছুই করে নি। কসাই বেচারা তো আমাকে মা বলে ডাকে। তবু আমার মা এমন করে বলে যে আমি কিছুতেই স্বস্তি পাই না।

—আমিও তো মুসলমান। আমাকে ভয় করে না?

—বাঃ আপনাকে কেন ভয় করবে?

—আমিও যে মুসলমান।

—ধ্যেৎ। আপনাকে একটুও ভয় করে না।

একটা বেঞ্চির ওপর বসে দু'বন্ধু আলাপ করছিলাম। মাটির ভাঁড়ে আমাদের জন্য চা এলো—ঠোঙায় গরম মুড়ি।

চন্দ্রা বলে গেল : খাওয়া হয়ে গেলে, দাদা, ভাঁড় আর ঠোঙা বাইরে ফেলে দিয়ে এসো। মা বারবার করে বলে দিয়েছে।

ছুটির দিন। আমরা যেখানটায় বসেছিলাম তার ঠিক সম্মুখেই রান্নাঘর। সেখানে শেখরের মা রান্না করছিলেন। বেড়া দিয়ে তৈরি রান্নাঘর। আব্রুর বড্ড অভাব। স্থানে স্থানে বেড়া খসে পড়ে গেছে। চট দিয়ে সেই অনাবৃত স্থানগুলো ঢাকবার চেষ্টা করা হয়েছে। রান্নাঘরের পাশেই—একই উঠানের মধ্যে—আর একটি ঘর। সেখানে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক—মিশমিশে কালো গায়ের রঙ—দাঁতন করছিলেন। তাঁর দুটি চোখে অপরিচ্ছন্ন দৃষ্টি, আর চোখ দুটি রান্নাঘরের দিকে স্থির নিবদ্ধ।

শেখরই বললো : কালি বাবু লোকটি ভারি বদ।

—কেন?

শেখর কোনো জবাব দিল না। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলাম সে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছে। খানিক বাদে সে-ই বললো : ভদ্রলোক ইছাপুরে কাজ করেন। মা রান্নাঘরে এলেই ভদ্রলোক ঐখানটিতে এসে দাঁড়াবেন।

হঠাৎ শেখরের মা-ও কালি বাবুকে দেখতে পেলেন। তাড়াতাড়ি গায়ে কাপড় টেনে নিয়ে বললেন :

—শেখর চটটা ভালো করে টেনে দেতো বাবা।

কালি বাবু ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলেন। দাঁতন করা দাঁতের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে থুথু চিবুক পর্যন্ত নেবে আসছে। নোংরা চোখ দুটিতে ভরা পিচুটি। কালো ভুঁড়ির ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম।

আরো একদিনের কথা। চন্দ্রা সেদিনও তেল-মাখানো মুড়ি নিয়ে এলো। কিন্তু সেদিন আর কাগজের ঠোঙায় নয়—কাঁসার বাটিতে।

—শিগগির খেয়ে ফেল। মা দেখতে পেলে আমায় আস্ত রাখবে না।

—কি দেখতে পেলে?

—তোমায় বাটিতে খেতে দিয়েছি।

—তাহলে এমন কাজ করলে কেন? একটা ছোটখাটো বিপ্লব ঘটাতে চাও?

—আমার ইচ্ছা। অত বকবক করতে পারি না।

আমি এক মুঠি মুড়ি তুলে নিয়ে মুখে পুরলাম।

—সামনের দোকানের কসাইকে দেখলে তোমার ভয় করে—কালি বাবুকে ভয় করে না?

—ওমা, কসাই আর কাকাবাবু বুঝি এক হলেন।

—কালি বাবু বুঝি তোমার কাকা?

—তাবলে সত্যিকার কাকা নন। পাশেই থাকেন, তাই কাকা বলি।

—তোমার মা বারণ করেন না?

—কি বারণ করেন না?

—কালি বাবুর সঙ্গে মিশতে।

—ও মা, তুমি কি গো! বারণ করবেন কেন? দাও দাও আমি বাটিটা চট করে মেজে আনি।

চন্দ্রা প্রায় বাটিটা ছিনিয়ে নিয়ে দৌড় দিল। একটু পরই সে ফিরে এলো। কপালে টিপ, তৈল-মসৃণ কেশ খোঁপা করে বাঁধা, গায়ে ফর্সা শাড়ি। নিঃসন্দেহে এক ফুটফুটে মেয়ে।

—গা ধুয়ে এলাম। তুমি রোজ চান কর না!

—করি।

—কর? তোমরা শুনি রোজ চান কর না!

—এই তোমরাটা কে?

—চন্দ্রা কি একটা উত্তর দিতে উদ্যত হয়েও হঠাৎ অন্য কথা বললো :

—আজ কখন করবে?

—করব এক সময়।

—বাড়ি যাবে না?

—কেন? তুমি চাও আমি চলে যাই!

চন্দ্রা নত চোখে দাঁড়িয়ে থাকল। আঙুল দিয়ে আঁচল জড়াতে লাগল। ফর্সা মুখের ওপর একটা অন্ধকার ছায়া পড়ল। এইভাবে অনেকটা সময় কেটে গেল। তারপর চন্দ্রাই বললো : হ্যাঁ। তাই চাই। তুমি আসা-যাওয়া কর, পাড়ায় কথা উঠেছে।

—কথা উঠেছে। কে তুলেছে কথা?

—কালি কাকা!

—বেশ, আর আসব না।

চন্দ্রা মুখ তুলল। তার দুটি চোখ ততক্ষণে সিক্ত হয়ে গেছে। এগিয়ে এসে সে আমার একটি হাত ধরল। বললো :

—সত্যি এসো না। দাদাই তোমাকে মানা করত; কিন্তু পারে নি। মাও চান না তুমি আস। তাই আমিই বলছি। কি হবে এভাবে এসে।

—আচ্ছা তাহলে উঠি এবার।

—একটু দাঁড়াও। জানো আজ রাখী উৎসব। তোমাকে প্রণাম করি।

চন্দ্রা আমার হাতে একটা রাখী বেঁধে দিল। আমি যার বলে একবার উঠে পড়েও আবার বসে পড়লাম। চন্দ্রাকে পাশে বসিয়ে বললাম : তুমি হুমায়ুন বাদশা আর কর্ণবতীর গল্প জানো?

—না! কি গল্প।

—বলি শোনো। কর্ণবতী ছিলেন চিতোরের রানী। বাহাদুর শাহ চিতোর আক্রমণ করতে এগিয়ে এলেন—সঙ্গে হাজার সৈন্য-সামন্ত। কর্ণবতী প্রমাদ গুণলেন। তাঁর এত শক্তি কোথায় দুর্ধর্ষ বাহাদুর শাহকে বাধা দেবেন। তখন অসহায় কর্ণবতী মোগল বাদশাহ হুমায়ুনের কাছে দূত পাঠালেন। আর তার সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন একটা রাখী। হুমায়ুন স্বয়ং সেই মুহূর্তে শের শাহের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। কিন্তু মোগল সম্রাট এক অসহায় নারীর ডাকে সাড়া না দিয়ে পারলেন না। নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে কর্ণবতীর পাশে ছুটে এলেন। এই আমার গল্প।

—এ গল্প না সত্যি।

—এ ইতিহাস।

হুমায়ুন কর্ণবতীর পাশে এসে দাঁড়ালেন?

—বীর মোগল সম্রাট আর্ত নারীর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারেন নি।

—আমার বিপদের দিনে যদি আমি ওমনি করে তোমাকে ডাকি, তুমিও আসবে?

—আসব। কিন্তু তোমার তো আর রাজ্য নেই। তোমার আবার বিপদ কিসের?

চন্দ্রা সে কথার কোনো জবাব দিল না। অন্যমনস্কের মতো বললো : ডাকলে এসো কিন্তু।

কথাগুলো যেন বহুদূর থেকে ভেসে এলো।

মুসলমান ছেলেদের জন্য কতগুলো বৃত্তি ধার্য ছিল। বহুদিনের আন্দোলনের পর মুসলমান ছাত্ররা এই সুবিধাটুকু পেয়েছিল। ম্যাট্রিক পরীক্ষার সার্থক পরীক্ষার্থীদের তালিকায় যোগ্যতা অনুসারে আমার স্থান কোন অতলে ছিল জানি না; কিন্তু কেমন করে যেন এই বিশেষ বৃত্তিগুলোর একটি অর্জন করতে পেরেছিলাম। সেদিন তিন চার মাসের বৃত্তি এক সঙ্গে হাতে আসায় অনেকগুলো টাকা পেলাম।

কি খেয়াল হলো একটা রিকশা ভাড়া করে চড়ে বসলাম। বৃদ্ধ রিকশাঅলা, কিন্তু কি সুঠাম শরীর।

—রিকশা টানতে তোমার কষ্ট হয় না।

আমার অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে বৃদ্ধ একটু বিস্মিত হলো; কিন্তু রিকশা টানতে টানতেই বললো : খুব কষ্ট হয় বাবু। কষ্ট আবার হয় না।

—তাহলে কেন রিকশা টান?

—পেটের জন্য।

—আর কিছু করতে পার না?

—সবখানেই ভিড়। গরিব মানুষ লেখাপড়া করি নি, আর কিইবা করব।

—তোমার বয়স কত?

—আমরা জাহেল মানুষ। বয়সের হিসাব রাখি না। তবে বয়স অনেক হবে। তিন কুড়ি তো হবেই।

—সারা দিনে কত আয় কর?

সামনে একটা মোটর আসছিল। বৃদ্ধ সন্তর্পণে পাশ কাটিয়ে বাম দিকের গলিতে ঢুকে পড়ল। তারপর বললো : আয় বাবু সাত টাকা হয়।

—মাসে দু'শ টাকার বেশি রোজগার কর, অবস্থা তোমার ভালোই বলতে হবে।

—আল্লাহ্‌র মর্জি আছি এক রকম। সাত টাকার মধ্যে রিকশার মালিককে তিন টাকা দিতে হয়। তাও চলে যায় মন্দ না।

—পয়সা-কড়ি কিছু জমাও নি? একটা রিকশা কিনে নিলেই তো পার।

জমাব? বাবু কি যে বলেন। তবে ধারকর্জ করে না হয় কোনোমতে যোগাড় করলাম, কিন্তু গরিব মানুষ আমাদের লাইসেন্স দেবে কে? ওসব বড় লোকরাই পারে।

ছড়ছড় ঠুনঠুন শব্দ করে রিকশা এগিয়ে চলল। পিচের রাস্তা স্থানে স্থানে গরমে গলে গেছে। মাথার ওপর দাউদাউ করে সূর্য জ্বলছে। নির্বিকার বৃদ্ধ রিকশা কাঁধে করে দৌড়ে চলছে।

—বাবু একটু দম নিতে দেবেন। এক গেলাস সরবত খেয়ে নি। আমিও সরবতের দোকানের সামনে পাতা বেঞ্চির ওপর বসে পড়লাম।

—বাড়িতে তোমার কে কে আছে?

—দুই ছেলে, এক মেয়ে আর বিবি। বড় ছেলে হোটেলে কাবাব তৈরি করে। মাসে দেড়শ টাকা রোজগার করে। ছোট ছেলে স্পোর্টিং দলের টেনিস মাঠে বল কুড়ায়। বকশিশ-টকশিশ নিয়ে সেও পঁচাত্তর একশ' টাকা কামিয়ে নেয়। মেয়ে আমার দেখতে ভালো। আমাদের পাড়ার খলিফার ছেলের সঙ্গে বিয়ের কথা হচ্ছে।

—বাঃ। তোমাদের তো দেখি বেশ সুখের সংসার।

—খোদার শোকর। আছি এক রকম। তবে রিকশা আর টানতে পারি না। বুকে ব্যথা করে। মাঝে মাঝে এত ব্যথা করে রাত্রে শুতে পারি না। আমার ছোট ভাই, সেও রিকশা টানত। মাশাল্লা দেখতেও ছিল ইয়া হাঁট্টা-গোট্টা। হঠাৎ একদিন মুখ থেকে রক্ত উঠল। তিন দিনের মধ্যে সব খতম। ছেলেপুলে হয় নি। ভাইয়ের জেনানা ক'দিন খুব কাঁদল। হালে আবার নিকে করেছে। বলতে গেলে আমিই এক রকম জোর করে নিকে বসিয়ে দিয়েছি। তা আমাকে মুরুব্বির মতো মানেও বটে।

ততক্ষণে বৃদ্ধ আবার কাঁধে রিকশা তুলে নিয়ে ছুটতে শুরু করে দিয়েছে। আমি বললাম : আবার নিকে করেছে। তাতে দোষ কি!

—না। দোষ আবার কি। নিকে করলেই কি আর দোষ হয়। আমার এই রিকশাতেই এত তামাশা হতে দেখেছি যে এখন আবার মাথার পিছনেও দুটি চোখ গজিয়েছে, সব দেখতে পাই।

আউটরাম ঘাটে পৌঁছে গেলাম। পুরো একটি টাকা বের করে বৃদ্ধকে দিয়ে দিলাম।

রিকশাঅলা তার দুটি অভিজ্ঞ চোখ তুলে এই যেন প্রথম আমাকে ভালো করে দেখল।

—আট আনা পয়সা আপনি ফেরত নিন।

—না না। তুমি গোটা টাকাটাই নাও।

—না বাবু। আপনি আট আনা ফেরত নিন।

এবার আমি হেসে ফেললাম।

—তোমরা তো জানি ভাড়া পেয়ে কখনো খুশি হও না। আজ আবার এ কি।

—বাবু আপনি ছেলে মানুষ বেশি কেন দেবেন?

তারপর রিকশাঅলাও হেসে ফেলল। বড় সুন্দর সে হাসি। বললো : বাবু হাঙ্গামা কি আপনারাই কম করেন? তিন মাইল পথ রোদে চরকির মতো ঘুরিয়ে নিয়ে চার আনা পয়সা গুঁজে দেন। সব মানুষ কি আর এক রকম। ভালো-মন্দ সবার মধ্যেই আছে।

হাস্যরত দুটি চোখ দিয়ে বৃদ্ধকে দেখতে লাগলাম।

—সালাম। চলি।

বৃদ্ধ আবার কাঁধে রিকশা তুলে নিল। যতক্ষণ না সে গলির মোড়ে অদৃশ্য হলো, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে লাগলাম।

হয়তো এই বৃদ্ধই অন্য কোনো সময় তার ন্যায্য ভাড়ার চাইতে বেশি দাবি করবে। সেই অন্যায় দাবি মেনে না নিলে অশোভন বচসা শুরু করে দেবে। হয়তো আমিই তাকে তার প্রাপ্য ভাড়ার চাইতে কম দিতে চেষ্টা করব। তবু আজকের এই মুহূর্তটি বেশ লাগল।

শিবপুরের টিকিট কেটে বোটানিক্যাল গার্ডেনের জাহাজে উঠে পড়লাম। গার্ডেনে প্রবেশ করবার পর মুহূর্তেই অনেকগুলো পরিচিত মুখ চোখে পড়ল।

—সেলিনা, অনিমা, মুশতাক এবং আর একটি চতুর্থ মুখ যা চেনা ছিল না। অনিমা আর মুশতাক, প্রায় সমস্বরে এবং কলস্বরে চেঁচিয়ে উঠল : শাকের যে!

অনিমা এগিয়ে এলো, তার চোখে-মুখে স্মিতহাসি।

—তোমাকে বহুদিন দেখি নি। রোজই ভাবি খোঁজ করব কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে না। তুমিও তো মাঝে মাঝে খবরটবর নিলে পার।

অপরিচিত ছেলেটি একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। পরনে সাদা ধবধবে ফিনফিনে ধুতি, গায়ে গিলে করা পাঞ্জাবি, চোখে সানগ্লাস, মাথায় এক ঝাঁকড়া চুল নিখুঁতভাবে ব্যাকব্রাশ করা। এবং চোখেমুখে নম্র বিনীত হাসি।

—সুনীল রায়, স্কটিশ চার্চে বি.এ পড়ছেন, ফিলজিতে অনার্স। আমরা এক সঙ্গেই বি.এ দেব। আর এর নাম শাকের। খুবই ব্রিলিয়েন্ট ছেলে। এবার আই.এ দেবে।

—ব্রিলিয়েন্ট ছেলে! কেন আমার দুর্বল ঠ্যাং ধরে টানাটানি করছ।

—ইংরেজি ইডিয়মের বাংলা পরিভাষা তুমি উদ্ভাবন কর মন্দ না।

—পরিভাষার আর প্রয়োজন কি, কোদালকে তো কোদালই বলি।

—হ্যাঁ তা বল বটে, এবং অসুবিধায় পড়লে তোমার বিপদটিকে হাঁসের গায়ের পানির মতোই ঝেড়ে ফেল।

এবার সকলেই হেসে উঠল। এতক্ষণে সুনীল দু'হাত তুলে আমাকে নমস্কার করল। আমি মনে মনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলাম, যথারীতি সালাম দেব। কিন্তু অনিমা আর সুনীলের দু'জোড়া চোখের সামনে কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে গেলাম। বিশেষ করে এইমাত্র অনিমা আমার সম্বন্ধে যেসব প্রীতিকর বাক্য উচ্চারণ করল তারপর তার কাছে অপ্রীতিকর হতে পারে এমন কোনো আচরণের কথা ভাবতে পারলেও তা শেষ পর্যন্ত কার্যকরী করতে পারলাম না। অর্থাৎ—সত্য কথা বলতে কি, আমারও দুটি হাত যন্ত্রচালিতের মতো নমস্কারের ভঙ্গিতে উঠে এলো।

সেলিনা ফ্লাওয়ার আইল্যান্ডের পাশে তারের ফেনসিং-এ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ঘাটে ভেড়া জাহাজটির চিমনির ওপর তার নজর। চিমনির ঠিক উপরেই একটা ঈগল পাখি উড়ে বেড়াচ্ছিল। অকস্মাৎ জাহাজ ছাড়ার তীব্র সঙ্কেতে চকিত হয়ে অনেক দূরে উড়ে চলে গেল।

আমরা হাঁটতে লাগলাম।

হাঁটতে হাঁটতেই অনিমা আবার বললো : সুনীল, তোমাকে কিন্তু শাকেরের সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় নি। শাকের রীতিমতো ভালো গান করতে পারে—এবং সে মুসলিম লীগের একজন আদর্শ প্রচারক।

সুনীল বললো : তাই না কি। তারপর আমাকে উদ্দেশ করে যোগ করল : আপনার শেষোক্ত পরিচয়টাই কিন্তু ভয়ানক।

—ভয়ানক? ভয়ানক কিসে?

মুশতাক উসখুস করছিল। সে হঠাৎ অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠল—দু'মিনিটও আলাপ হয় নি, এরই মধ্যে রাজনীতি শুরু হয়ে গেল। তার চাইতে চলো আমরা সকলেই কলকাতা ফিরে যাই। একটা ভালো কোনো ছবি দেখলেও হয়।

অনিমাও সোৎসাহে সায় দিল, কিন্তু পরক্ষণেই বললো : কলকাতায় ফিরে যাবে কি করে শুনি? ডানা তো নেই যে উড়ে যাবে। ফিরবার জাহাজ আবার ক'টার সময় পাব কে জানে!

মুশতাক আঙুল তুলে আউটরাম-ঘাট অভিমুখী একটি জাহাজের দিকে আমাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

—ঐ জাহাজটি দেখেই প্রস্তাবটি আমার মনে এলো। তাড়াতাড়ি কর। জাহাজ এখুনি ঘাটে ভিড়বে।

জাহাজে সবাই স্থির হয়ে ভালো করে বসতে-না-বসতেই আবার মুশতাকের কথায় আমাদের সকলের উৎসাহ কমে এলো।

—চললাম তো দল বেঁধে টিকিট পাব কি না কে জানে। অসহ্য অবস্থা করে তুলেছে এই যুদ্ধ। সিনেমায় যাও টিকিট পাবে না, হাউসফুল। চা খেতে যাও কোথাও বসবার জায়গা পাবে না। ট্রামে ওঠ; পাদানিতে পর্যন্ত ঠ্যাং রাখবার স্থান নেই। এমনকি রাস্তায় চল, ধাক্কা খাবে, ধাক্কা দিয়েছ বলে গলাধাক্কা খাবে। এখন সিনেমায় যাব, টিকিট তো পাবই না, মাঝ থেকে মন মেজাজই যাবে বিগড়ে।

অনিমা একটুখানি হেসে উঠে চলে গেল। যাবার আগে বললো :

—দাঁড়াও দেখি, তোমার মন-মেজাজের দাওয়াই আনতে পারি কি না—একেবারে অব্যর্থ মহৌষধ।

আবার একটু পরেই ফিরে এলো। তার পিছনে সাত আট বছরের একটি নেপালি ছেলের হাতে একটি ট্রে; ট্রেতে ছোট ছোট গ্লাসে গরম চা, আর লম্বা লম্বা মিঠা বিস্কুট।

—তোমার ও চা-বিস্কুট খেলে আর দেখতে হবে না, এক্ষুণি কলেরা হবে।

মুশতাকের মন্তব্য।

অনিমাও সহাস্যে জবাব দিল, তোমার মাথা হবে।

—তোমাদের আর কোনো কাজ নেই, কেবল খাই খাই। এই বলে মুশতাক গোটা চারেক বিস্কুট আর গেলাস দুই চা ট্রের ওপর থেকে তুলে নিল।

—এইমাত্র না কলেরার ভয়ে তোমার হাত-পা সব সেঁধিয়ে যাচ্ছিল!

দু'গাল ভরা বিস্কুটের পাহাড়ের পাশ দিয়ে কোনোমতে এই কথাগুলো বেরিয়ে এলো কলেরা যখন হবেই, তখন এক-আধখানা বিস্কুট খেয়ে কেন মরি, পেট পুরেই খেয়ে নি।

এই বলে মুশতাক আরো গোটা চারেক বিস্কুট টেনে নিল।

এতক্ষণে সেলিনা কথা বললো :

—কি করছ মুশতাক, সব কিছুতেই তোমার বাড়াবাড়ি!

মুশতাক কোনো জবাব দিল না। তার লম্বা জিহ্বা বের করে ভগ্নিকে সম্ভাষণ করল। জিহ্বায় পুরু হয়ে বিস্কুটের ভগ্নাবশেষ জমে আছে।

নেপালি বাচ্চাটা জিহ্বার এমন দর্শনীয় ব্যবহার দেখে পুলকে উছলে উঠল। মুশতাক সজোরে ধমকে উঠল। নেপালি সন্তানের হাসি তাতে এতটুকু সংযত হলো না।

মুশতাক হঠাৎ বালকটির হাত ধরে কাছে টেনে নিল। বললো : শোন্ রে। আর কিছু আছে খাবার? দিবি এনে?

ছেলেটি তার বিচিত্র মিশ্র ভাষায় কি বললো ঠিক বোঝা গেল না, কিন্তু দৌড়ে চলে গেল। একটু পরেই একটি থালায় বিভিন্ন প্রকার তেলে-ভাজা এনে হাজির করল।

মুশতাক থালাটি তার কোলের ওপরে টেনে নিয়ে তৎক্ষণাৎ সৎকার্যে মনোনিবেশ করল। বাকি পথটা তার মুখে কোনো কথা ছিল না।

বস্তুত ছোট স্টিমারটির ইঞ্জিনের শব্দ, আদিগন্ত বিস্তৃত আকাশে নানারকম ছোট-বড় পাখার বিচরণ, নদীর দুই তীরে সবুজ মাঠ, ছোট-বড় গাছ, কলকারখানার চিমনি থেকে উত্থিত ধূম্রকুণ্ডলী এবং সারাদিনের ক্লান্তির সমগ্র প্রভাবে কথা বলতে কারই ভালো লাগছিল না। নদীর পানি কেটে স্টিমার চলেছে, চোখে-মুখে বাতাসের স্পর্শ, এই পরিবেশে নীরবতাই ভালো লাগছিল। পাখির পক্ষ সঞ্চালনের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম কিনা জানি না; কিন্তু শুনতে পাচ্ছিলাম কল্পনা করতে বেশ লাগছিল।

এক সময় অনিমা বললো :

—আমার ডান হাতের তালুটা সকাল থেকে চুলকাচ্ছে। ডান হাত চুলকালে কি হয় রে?

সেলিনা জবাব দিল :

—শুনেছি অনেক টাকা আসে।

অনিমা তবু সন্দিহান হয়ে আবার প্রশ্ন করে : টাকা আসে। না, বিদেশ যেতে হয়।

—না রে। পা চুলকালে বিদেশ-যাত্রা!

এবার সুনীল বললো :

—আমি তো জানি, ডান হাতই হোক আর বাম হাতই হোক, চুলকালে আরটিকেরিয়া, এগজিমা, পাঁচড়া এইসব হয়।

—তুমি বড্ড বেরসিক। দেখ তো আরটিকেরিয়া বা এগজিমার কোনো লক্ষণ দেখতে পাও কি না।

অনিমা উঠে এলো, সুনীলের দিকে দুটি হাতই প্রসারিত করে দিল। সুনীল দুই হাত দিয়ে অনিমার ডান হাতটি চোখের সামনে টেনে আনল। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল।

সেলিনার চোখে-মুখে হাসি, বললো : সুনীল, লক্ষণগুলো আবিষ্কার করতে সময় বড় বেশি লাগছে না?

অনিমা এক ঝটকায় তার হাত টেনে নিল। আমাদের পিছনে এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক চুপচাপ গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন। তিনি পর্যন্ত হেসে উঠলেন।

মুশতাক ঠিকই বলেছিল। কোনো সিনেমাতেই টিকিট পাওয়া গেল না।

অগত্যা যে-যার গৃহাভিমুখে প্রস্থানের সিদ্ধান্ত করলাম। একটা ট্যাক্সিতে উঠবার আগে অনিমা বললো : শাকের আগামী সোমবার আমার জন্মদিন, না এলে কিন্তু ভারি রাগ করব।

সেলিনার সঙ্গে একটি কথাও হলো না। এমনকি তারা চলে গেল, তবু একটা বিদায় সম্ভাষণ পর্যন্ত না।

যখন বাড়ি ফিরে এলাম তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। কিছুই ভালো লাগছিল না। মনে করেছিলাম, শোবার ঘরে গিয়ে চুপচাপ আরাম করব। সিঁড়ি দিয়ে উঠছি, বাম দিকের অন্ধকার কামরা থেকে মেজ ভাইয়ের ডাক ভেসে এলো : শাকের শুনে যা!

বহুদিন এই ঘরটায় আসি নি। বিছানার চাদর-বালিশ সবকিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে আছে, আর তেমনি নোংরা ঘরের কোণে একটা সোরাই রাখা আছে, তার মুখটা খোলা, এবং তার চারদিক পানিতে ভেজা। কাছেই একটা গেলাসও ভেঙে পড়ে আছে। ঘরে আলো জ্বালানো হয় নি; কিন্তু খোলা জানালার ভিতর দিয়ে স্ট্রিট ল্যাম্পের আলো ঘরের ভিতরটাও আলোকিত করে দিয়েছে। মেজ ভাইয়ের মুখে এক মুখ দাড়ি, কত দিন যে দাড়ি কামানো হয় নি তার হিসাব নেই।

—তুই সারাদিন কোথায় থাকিস রে!

কোনো জবাব দিলাম না।

—আচ্ছা বোস। এই চেয়ারটায় বসে পড়। না না, ও চেয়ারটায় বসিস না। ওর একটা পা ভাঙা। বিছানার এই কোণটায় বসে পড়।

আমিও তাই করলাম। মেজ ভাই সেইভাবেই বহুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকলেন। তাঁর মুখেও কোনো কথা নেই, আমিও নীরব।

তুই 'জুড দি অবস্‌কিওর' পড়েছিস?

—জি না।

এবার মেজ ভাই রেগে উঠলেন, ভয়ানক রেগে উঠলেন।

—তোর মতলব বুঝেছি। তুই আমার কাছে বসতে চাস না। আচ্ছা যা। যা বলছি। এক্ষুণি চলে যা।

আমিও ভয়ে ভয়ে উঠে পড়লাম।

আশ্চর্য, মেজ ভাই তৎক্ষণাৎ আবার শান্ত হয়ে গেলেন।

—যা। কিন্তু আসবি আবার মাঝে মাঝে। বড্ড একা একা থাকি রে।

—একা থাকেন কেন? বাইরে গেলেই তো পারেন।

—বাইরে যাব? কোথায় শুনি? তুই জানিস, আমার এই কামরাটার বাইরে গোটা দুনিয়াটাই পাগলাখানা। তুই ওসব বুঝবি না। যা...

পঁচিশ

আজ সোমবার। অনিমার জন্মদিনের নিমন্ত্রণ আজকেই। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ইতস্তত করছিলাম, যাব কি না। কত রকমের লোক থাকবে—তাদের মধ্যে নিঃসঙ্কোচ হতে পারব কি

না, সে চিন্তাও ছিল। তাছাড়া একটা কিছু উপহারও দিতে হয়। এইসব চিন্তা করছি, এমন সময় মুশতাক উপস্থিত। আমাকে তখনো শায়িত অবস্থায় দেখে সে প্রায় চিৎকার করে উঠল।

—তুই এখনো তৈরি হস নি! নাঃ তোকে দিয়ে কিছু হবে না।

—তোর কথা একশ'বার মানি। বিশেষ করে এই নিমন্ত্রণ-রক্ষা কিছুতেই হবে না। আমায় মাপ কর ভাই। অনিমাকে ছাড়া তাদের বাড়ির আর কাউকেই চিনি না।

মুশতাকের পক্ষে যতটা গাম্ভীর্য আয়ত্ত করা সম্ভব—খুব বেশি কোনোদিনই সম্ভব হয় নি—তার সমস্তটাই একত্র করে সে আমার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকল। তার ভাবটা এই; আমার মতো অদ্ভুত অশোভন আর অচিন্তনীয় কথা সে কোনোদিনই শোনে নি,—এমনকি আমার কাছ থেকেও নয়। মুশতাকের গাম্ভীর্যময় মুহূর্তগুলো, সেগুলো খুব বিরল বলেই, আমি বরাবরই বড্ড উপভোগ করতাম। বস্তুত তার চরিত্রের অনেকটা মাধুর্যই তার এই ধরনের সারল্যের মধ্যে নিহিত ছিল।

আমি বললাম : রাগ করিস কেন বাছা। তুই কেমন বেয়াড়া রকম মোটা হয়ে যাচ্ছিস, তার খবর রাখিস?

—সত্যিই বড্ড মোটা হয়ে গেছি, তাই না? কি করি বলতো? মুশতাক এবার হেসে ফেলল। তার গাম্ভীর্যের পর্বত বরফ হয়ে গলে গেল।

—কি আর করবি। খাওয়া কমিয়ে দে।

মুশতাকের মুখ আবার গম্ভীর হয়ে গেল—এইবারের গাম্ভীর্যটুকু একেবারেই অকৃত্রিম। তার বুক ভেঙে গেছে. এমনই করুণ সুরে বললো : খাওয়াই যদি কমিয়ে দিলাম, তাহলে বেঁচে আর সুখ কি। তার চাইতে বল, গলায় দড়ি বেঁধে গাছ থেকে ঝুলে পড়ি।

—বৎস, তুমি খাও, যত খুশি খাও, আর মোটা হও; কিন্তু দোহাই তোমার দড়ি-টড়ির কথা চিন্তা করো না। তোমার মতো ছেলে গাছ থেকে ঝুলছে, এমন অবিশ্বাস্য দৃশ্য চোখে পড়লে আমার হাসিই পাবে; মনে হবে বুঝি এ কোনো প্রহসনের দৃশ্য।

—হাসি পাবে! আমার মৃত্যুতে তোর হাসি পাবে। তুই তো দেখি খু-উ-ব হাস্যরসিক হয়েছিস!

—শোন শোন। রাগ করিস নে। জরা, মৃত্যু, শোক, তাপ এই ধরনের কতগুলো অবস্থার সঙ্গে তোর কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে তা আমি ভাবতেই পারি না। তুই হচ্ছিস যাকে বলে চির বসন্ত।

—চির বসন্ত? চির কচু! তুই আমাকে যতটা বোকা ভাবিস আসলে আমি কিন্তু ততটা বোকা নই। না হয় একটু বেশি খাই। আসলে তুই আমাকে একটা ক্লাউন মনে করিস!

সত্যকার দুঃখ আর ক্রোধে মুশতাকের মুখভাব এক বিচিত্র রূপ ধারণ করল।

—অমনি রাগ হলো? তোর সঙ্গে একটু তামাসাও করতে পারব না?

—ওসব কথা এখন থাক। যাবি কিনা তাই বল। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে।

এরপরও যদি 'না' বলি তাহলে মুশতাক যে আমাকে চিরকালের মতো ত্যাগ করবে তা একেবারে অবধারিত। কিন্তু মুশতাককে ত্যাগ করবার কোনো অভিপ্রায়ই আমার ছিল না। তাই আর কোনো প্রতিবাদ না করে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলাম।

উভয়েই এসপ্লানেডের ট্রামে উঠলাম। তখনো আমির আলী এভিনিউ,০ গড়িয়াহাট রোডে ট্রাম লাইন বসে নি। তাই পার্ক সার্কাস থেকে এসপ্লানেড ঘুরে বালীগঞ্জ যেতে হতো। অবশ্য

দশ নম্বর বাস ধরতে পারতাম; কিন্তু বাসে এত ভিড় যে সে প্রস্তাব মনেও আসে না। এসপ্লানেড পৌঁছলে মুশতাক বললো : আগে একবার নিউ মার্কেট যেতে হবে।

—কেন? আবার নিউ মার্কেট কেন?

—কেন? একটা কিছু উপহার দিতে হবে না!

—তুই কি দিবি রে!

—ফুল। তুই কি দিবি!

—আমিও তো ভেবেছিলাম ফুল দেব। সস্তাও বটে, আর ফুল জিনিসটা ভালো নয় এমন কথাও কেউ বলতে পারবে না।

—বেশ। তুই-ই ফুল দে। আমি না হয় অন্য কিছু কিনে নি।

আমি ফুলের একটা তোড়া কিনলাম। মুশতাক কিনল ভ্যানিটি ব্যাগ। তারপর দু'জনেই গিয়ে উঠলাম বালীগঞ্জের ট্রামে।

আমরা উভয়েই নীরব। মুশতাক অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর। এক সময় মুশতাকই বললো : আমাকে মোটা বলা হয়। নিজের চেহারাটা একবার দেখেছিস! ম্যাট্রিক পাস করার পর থেকেই তুই কি রকম মোটাতে শুরু করেছিস, কখনো খেয়াল করে দেখেছিস।

আমি বললাম : আমার স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে। তুই হয়েছিস যাকে বলে মোটা তাই।

কিন্তু মনে মনে।

গেটের সামনেই অনিমা দাঁড়িয়েছিল। তার পশ্চাতে সেলিনা, সুনীল এবং আরো গোটা কয়েক ছেলেমেয়ে। গেটের ভিতরে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই অনিমা আমাদের দু'বন্ধুর হাতে দুটি বেলফুলের মালা পরিয়ে দিল। বিনা আড়ম্বরে এবং স্বল্প প্রসাধনে অনিমা অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়েছে। এই মিষ্টি মেয়েটিকে চারদিক দিয়ে যেন এক প্রকার প্রসন্ন অনুচ্চারিত সৌন্দর্য বেষ্টন করে আছে।

বাড়ির লোহার গেটের দুই পাশে দু'জন দারোয়ান মোটা লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। নিমন্ত্রিতদের সালাম জানাতে অবশ্য তারা কসুর করছিল না; কিন্তু তাদের সত্যকার ভূমিকা কিছুটা ভিন্ন রকম ছিল। গেটের ঠিক বাইরেই অসংখ্য দুর্ভিক্ষতাড়িত বুভুক্ষু লোলুপ-দৃষ্টিতে উন্মুখ হয়ে এই বাড়িটির অন্দরের দিকে তাকিয়ে ছিল। অলোক-সজ্জা, সুসজ্জিত নর-নারী, কল-হাস্য প্রভৃতির বাহুল্য দেখে আর শুনে তারা সহজেই অনুমান করেছে, এ-বাড়িতে আজ ভোজের আয়োজন আছে। তাদের সম্মিলিত চাপে গেট যখন ভাঙবার উপক্রম হলো, তখনই দারোয়ান দুটিকে লাঠিসহ মোতায়েন কবা হলো।

মুশতাক অনিমাকে উদ্দেশ করে বললো : শাকের আর তোমার উৎসবে অংশ নেবে না।

—কেন? অনিমার প্রশ্ন।

—দেশে দুর্ভিক্ষ, আর তুমি এমন উৎসব করছ।

—দেশের লোক খেতে পাচ্ছে না এমন দৃশ্য দেখে আমি আনন্দ পাই, শাকের আশা করি সে রকম কিছু বিশ্বাস করে না!

—আনন্দ পাও না, সেটাই যথেষ্ট নয়!

—তবে?

—রীতিমতো ব্যথা পেতে হবে। দুঃখে কাতর হতে হবে। অনাহারে থাকতে হবে।

—আমি অনাহারে থাকলেই যদি দেশসুদ্ধ লোকের খাদ্য জুটত তাহলে আমি অন্ন স্পর্শ করতাম না।

এতক্ষণ মুশতাক আর অনিমার মধ্যেই কথা হচ্ছিল। এবার অনিমা সোজা আমাকেই প্রশ্ন করল : শাকের সত্যিই তোমার এই মত? দেশে দুর্দিন, তাই কোনো উৎসব করা চলবে না।

—এ সম্বন্ধে আমার সুবিবেচিত কোন মতই নেই। একটু অসহিষ্ণু কণ্ঠেই আমি জবাব দিলাম।

—তাহলে?

—তাহলে কি?

—তুমি উৎসবে অংশ নেবে না কেন?

—অংশ নেবই না যদি, তো এলাম কেন?

—তাহলে মুশতাক এমন কথা বলছে কেন?

—এ প্রশ্নের উত্তর মুশতাকই ভালো দিতে পারবে।

মুশতাকের এই একটা অভ্যাস ছিল। কোনো কোনো সময় আমার উপস্থিতি সত্ত্বেও সে আমারই মুখপাত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সে অনায়াস অবলীলায় ও দুর্মর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে আমার বক্তব্য কি হতে পারে বলে যেতে থাকত। তার এই অভ্যাসের জন্য আমি প্রায়ই বিপদগ্রস্ত হতাম। এ অভ্যাসটিও তার চরিত্রের এক প্রকার সরলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। মনে মনে তা স্বীকার করলেও, ঠিক সেই মুহূর্তে আমার এত রাগ হতো যে তার কথার প্রতিবাদ পর্যন্ত করতাম না। ফলে তার বক্তব্যই যে আমারই বক্তব্য শ্রোতাও সেইটেই বিশ্বাস করত।

তাকে এ সম্বন্ধে কিছু বললে সে পরম ঔদাস্যভরে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলত : সরি।

বলতে ভুলে গেছি, মুশতাক হালে সিগারেট ধরেছে, ডি লুক্স টেনর!

—তাই বলো! মুশতাক পরিহাস করছিল।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে অনিমা বললো। আমি জবাব দিলাম :

—হ্যাঁ। তাই।

লনের ওপর কার্পেট, কার্পেটের ওপর কুশন দেয়া চেয়ার, এবং চেয়ারের ওপর বিভিন্ন বয়সের নারী ও পুরুষ বসেছিলেন।

—এদিকে নয়, ওপরে চল। আমাদের আড্ডা সেখানেই। সুচিত্রা মুখোপাধ্যায়ের আসবার কথা আছে। যদি আসে, গান জমবে।

ওপরে একটি মাঝ-সাইজের কামরায় উপস্থিত হলাম। সেখানে সাত আটজন ছেলেমেয়ে বসে গল্প করছিল। অর্থাৎ একজন আর একজনের রুমাল কেড়ে নিচ্ছিল; তৃতীয়জন চতুর্থজনের চোখ টিপে ধরছিল; পঞ্চমজন ষষ্ঠের সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা করছিল : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চতুষ্কোণ'। কামরার বাইরে একটি বড় বারান্দা, সেখানে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে টেবিল-টেনিস খেলছিল। এক কোণে দেখলাম আমাদের স্কুলের বন্ধু কাঞ্জিলালও উপস্থিত আছে। একবার আমাকে দেখে নিয়ে সে যেমন তাসের ম্যাজিক দেখাচ্ছিল তেমনি ম্যাজিকই দেখাতে লাগল। আমার দিকে দ্বিতীয়বার ভ্রূক্ষেপ করল না।

পরিচয় বিনিময় হয়ে গেলে আসন গ্রহণ করলাম। আমার পাশেই বসেছিল দিলীপ কুমার, প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাসে অনার্স পড়ছে—সে না কি বন্ধুমহলে ডি-কে নামেই পরিচিত। এতদিন পরও সবচাইতে আগে তার চোখের রিমলেস চশমাটার কথাই মনে পড়ে। এক কথায় যাকে বলে 'লাটুবাবু' ডি-কে-কে দেখেই তাই মনে হলো।

অনিমা বললো : তোমরা আলাপ কর। আমি এই এলাম বলে। একটু কাজ আছে। আর

হ্যাঁ, ভালো কথা, আমাদের শাকের একজন উৎসাহী মুসলিম লীগার।

অনিমা নিতান্তই রহস্যচ্ছলে এই পরিচয়টুকু দিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা গেল বন্ধ হয়ে; রুমাল কাড়াকাড়ি স্থগিত থাকল; চোখ টেপাটেপি ক্রীড়ার উৎসাহও এক নিমেষে নিঃশেষ হলো; পিং-পং টেবিলে বল আছাড় খেয়ে পড়বার শব্দও আর শোনা গেল না। এতগুলো ছেলেমেয়ের চোখ এক সঙ্গে একই মুহূর্তে আমার ওপর এসে পড়ল।

একমাত্র মুশতাক অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। বোধ করি কাঞ্জিলালের ম্যাজিকও ভুল হয়ে গেল।

অনিবার্যভাবেই পাকিস্তান-প্রসঙ্গ এসে পড়ল।

ডি-কে তার চশমাটি রুমাল দিয়ে পরিষ্কার করতে শুরু করল। কিন্তু তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হতে লাগল, চশমা তো নয়, যুদ্ধের আগে অস্ত্র শানিয়ে রাখছে। তার সমস্ত মুখ এক অব্যক্ত প্রতিজ্ঞায় কঠিন আকার ধারণ করল। তারপর সে তার চেয়ারটি আমার আরো কাছাকাছি টেনে আনল।

—আপনারা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার চান, তাই না?

চিকিৎসক অন্তিম মুহূর্তে একটা ইঞ্জেকশন দেয়ার পর যেভাবে রোগীর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেন, প্রথম প্রশ্ন-বাণটি নিক্ষেপ করবার পর, ডি-কে অনেকটা সেইভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। যখন দেখলো রোগী বেশ শক্তই, তখন আর একটি অস্ত্র নিক্ষেপ করবার ভঙ্গিতে দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছুঁড়ে মারল :

—জানতে পারি কি, এই আত্ম বলতে আপনারা কি বোঝেন?

কেবল বক্তব্য নয়, বাচনভঙ্গি পর্যন্ত মারমুখ।

আমি জবাব দিলাম : আপনার প্রশ্নে "আপনারা" বলে যে সম্প্রদায়ের উল্লেখ করলেন, তাদেরকেই বুঝি।

—অর্থাৎ?

ডি-কের ললাটের ওপর একটা প্রশ্ন চিহ্ন অঙ্কিত হয়ে গেল।

—অর্থাৎ ভারতবর্ষে মুসলমান বলে যে জাতি আছে তাদেরকেই বুঝি। একটা বিখ্যাত নটের বাচনভঙ্গি অনুকরণ করে ডি-কে আবার বললো :

—তেমন কোনো জাতি আছে না কি। ভারতবর্ষীয় বলে একটা জাতির উল্লেখ ইতিহাসে আছে বটে।

—যে ইতিহাস ইংরেজ আর হিন্দু লিখিত সেই ইতিহাসে!

এবার ডি-কে একটা সিগারেট ধরাল। তারপর একটু হেসে, একটু কেশে, চেয়ার একটু নড়েচড়ে, চশমাটা আর একবার মুছে নিয়ে, সে আবার এক প্রশ্ন করল :

—জিগ্যেস করি, এই আমাদের সঙ্গে—বোধকরি, 'কাফের' নামেই আপনি আমাদের ভালো চিনবেন— সে যাই হোক, এই অধমদের সঙ্গে আপনাদের পার্থক্যটা কোথায় যে পৃথক জাতিত্বের দাবি করছেন।

তারপর একটু থেমে, এবং একটা অভ্রভেদী হাসি হেসে ডি-কে পুনশ্চ যোগ করল : আর যদি কিছু মনে না করেন, আপনার বৃদ্ধ-প্রপিতামহের নামটা কি ছিল একবার স্মরণ করলেই, পার্থক্য সম্পর্কে আপনার যেটুকু চৈতন্য আছে, তাও লোপ পাবে। আপনি বোধ করি জানেন, পঞ্চাশ ষাট বছর আগেও এখনকার বহু মুসলমানই আর যাই থাকুক না কেন, ঠিক মুসলমান ছিলেন না।

একটা সমবেত হাসি ডি-কের বক্তব্যকে সংবর্ধিত করল।

—আগে আপনার প্রথম প্রশ্নের জবাব দিয়ে নি। আমরা সৈয়দ—এবং আপনারা আমাদের এতই আপন যে সৈয়দ শব্দটির তাৎপর্য কি বোধ করি তাও জানেন না। আর যদি জানেনই, তাহলে আমার বৃদ্ধ-প্রপিতামহের নামটা নাইবা শুনলেন, উচ্চারণ করতে পারবেন না, আপনার কণ্ঠই আড়ষ্ট হয়ে যাবে। আপনার দ্বিতীয় ইঙ্গিত : বাঙালি মুসলমানেরা কয়েক পুরুষ আগেও অমুসলমান ছিলেন। হয়তো ছিলেন; কিন্তু তাঁরা হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন এ কারণে নয় যে হিন্দু-মুসলমান এক। পৃথক বলেই এক ধর্ম ত্যাগ করে, অন্য ধর্ম গ্রহণ করবার প্রশ্ন ওঠে। অবশ্য হিন্দুরা দলে দলে ধর্ম-ত্যাগ করেছে এই ঐতিহাসিক সত্যটি স্মরণ করে আপনি দুঃখিত আর বিচলিত হবেন, এটা স্বাভাবিক!

ডি-কে একটু আগেই একটা সিগারেট ধরিয়েছিল। তার হাত কাঁপতে লাগল। সে তার জ্বলন্ত গোটা সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পরক্ষণেই আর একটা সিগারেট ধরাল। তারপর বক্র-হাসি হেসে বললো : আপনি কি বলতে চান, ধর্ম আলাদা হলেই জাতি আলাদা হয়।

—হ্যাঁ। অনেক সময় তাই হয়।

—দ্বিজাতিত্বের একটা ভিত্তি থাকতে হবে তো। আপনাদের ভিত্তিটা কি? আবার জিগ্যেস করি : আমাদের সঙ্গে আপনাদের পার্থক্যটা কোথায়?

—পার্থক্য সর্বত্র। একটা প্রমাণ দিতে পারি। এত বড় বাংলা সাহিত্য—অথচ মুসলিম জীবনের চিত্র কোথাও দেখতে পান।

—সে চিত্র তুলে ধরবার দায়িত্ব মুসলমান সাহিত্যিকদের, আমাদের নয়। আপনাদের জীবন সম্বন্ধে আমরা ভালো জানি না।

—আমাদের জীবন সম্বন্ধে আপনারা ভালো জানেন না সে কথা খুবই সত্য। কিন্তু এ কথার আর একটি অর্থ এই যে আমাদের জীবন আপনাদের জীবন থেকে পৃথক, তাই জানেন না। তাই নয় কি? সুতরাং পার্থক্যটা যে-কোথায় আমাকে আর সে প্রশ্নের জবাব দিতে হবে না। তাছাড়া পার্থক্য বিশ্লেষণ আর ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, কারণ জাতিত্বের সর্বাধুনিক আর সর্বাপেক্ষা বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা অনুসারে কোনো এক দল লোক যদি নিজেদের এক বলে অনুভব করে তাহলেই তাদের এক পৃথক জাতি বলে স্বীকার করতে হবে। ভারতীয় মুসলমানরা তাই অনুভব করে।

—না! তারা তা করে না।

এবার আমি হেসে ফেললাম। আমি সাধারণত সিগারেট খাই না; কিন্তু এই সময় এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম যে মুশতাকের কাছ থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরালাম। মুশতাক সোৎসাহে সিগারেট ধরিয়ে দিল—যেন যুদ্ধের জন্য নতুন রসদ হাতের কাছে এগিয়ে দিল। তারপর অলক্ষ্যে তার বাম হাত দিয়ে আমার হাতের ওপর একটু চাপ দিল।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে, ডি-কে-কে উদ্দেশ করে বললাম :

—আমরা নিজেরা শতবার শতরূপে বলছি আমরা আলাদা, আমরা স্বতন্ত্র, তবু আপনি বলবেন, আলাদা নই। আপনাদের এই হাস্যকর জেদের জন্যই আমাদের রাজনৈতিক অচলাবস্থার কোনো মীমাংসা হচ্ছে না। নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আপনারা খুব সৌভ্রাতৃত্বের কথা বলেন। অথচ একটু পূর্বেই যে-সাহিত্যিকদের উল্লেখ করলেন তাঁদের উক্তি কি ভুলে গেছেন। আপনারা যাঁকে মহর্ষি বলেন সেই বঙ্কিমচন্দ্রের কথা না হয় নাই তুললাম; এমনকি অমন যে দরদী শরৎচন্দ্র আর মনীষী রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মতটাও মনে রাখবেন।

—আপনি রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রকেও এই বিতর্কের ঊর্ধ্বে মনে করেন না।

—না, করি না। মনে আছে, এই শরৎচন্দ্রই বলেছিলেন; "বস্তুত মুসলমান যদিও কখনও বলে—হিন্দুর সহিত মিলন করিতে চাই, সে যে ছলনা ছাড়া আর কি হইতে পারে, ভাবিয়া পাওয়া কঠিন। একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই। সেদিন কেবল লুঠ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্ব হানি করিয়াছে, বস্তুত অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের পরে যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায়, কোথাও কোন সঙ্কোচ মানে নাই।"

এই যে কথাগুলো উদ্ধৃত করলাম সেগুলো দরদী শরৎচন্দ্রের। মুসলমান সম্বন্ধে তাঁর মত তিনি আরো পরিষ্কার করে বলেছেন। তা এই : "হিন্দু নারী হরণ ব্যাপারে সংবাদপত্রওয়ালারা প্রায়ই দেখি প্রশ্ন করেন, মুসলমান নেতারা নীরব কেন? তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকেরা যে পুনঃ পুনঃ এতবড় অপরাধ করিতেছে, তথাপি প্রতিবাদ করিতেছেন না কিসের জন্য? মুখ বুজিয়া নিঃশব্দে থাকিবার অর্থ কি? কিন্তু আমার ত মনে হয় অর্থ অতিশয় প্রাঞ্জল। তাঁরা শুধু অতি বিনয়বশতই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন না, বাপু, আপত্তি করব কি, সময় ও সুযোগ পেলে ওকাজে আমরাও লেগে যেতে পারি।"

এই যে কথাগুলো শুনলেন এগুলোও বলেছেন সাহিত্য-সম্রাট শরৎচন্দ্র,—যাঁকে আপনারা মুসলিম হিতৈষী বলেন। বাকি থাকলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর বক্তব্য স্মরণ করতে পারেন? মনে আছে—"মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস" নিবন্ধে তিনি কি বলেছেন।

—আপনি কি রবীন্দ্রনাথকেও মুসলিম-বিদ্বেষী বলতে চান না কি। তাঁর সম্বন্ধেও আপনার মনে কোনো শ্রদ্ধা নেই।

—রবীন্দ্রনাথেব কাব্য-প্রতিভাক আমি শ্রদ্ধা করি, বোধ করি আপনার চাইতে বেশিই করি; কিন্তু সে কেবল তিনি অতুল কাব্য-প্রতিভার অধিকারী বলে। মুসলমানকে তিনি কোনোদিন আপন মনে করেন নি। তিনি মুসলমানকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন।

অনিমা কখন যে ফিরে এসেছে আমরা কেউই লক্ষ্য করি নি; সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের বাদানুবাদ শুনছিল গভীর মনোযোগ দিয়ে। এবার সে বললো : গত দু'শ বছর আমরা এক বিদেশী প্রভুর দাসত্ব করেছি, একইভাবে সমানে লাঞ্ছিত হয়েছি, একই সাথে পাশাপাশি শত শত বৎসর বাস করেছি, পরস্পরের সুখ-দুঃখে অংশ নিয়েছি, তবু আমরা এক নই, এত বড় আশ্চর্য।

অনিমার বক্তব্যে যুক্তির চাইতে আবেগ বেশি, তাই তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারলাম না। তবু এক সময় বললাম : না, আমরা পরস্পরের সুখ-দুঃখে অংশ নেই নি। আমাদের মধ্যে সত্যকার সম্প্রীতিও কোনোদিনই ছিল না। আমরা কেউ কাউকে বিশ্বাসও করতে পারি নি। হিন্দুরা মুসলমান রাজত্বের তুলনায় বরঞ্চ বৃটিশ রাজত্বকেই কাম্য বলে মেনে নিয়েছে; স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র অকপটে সে-কথা স্বীকার করেছেন; এবং হিন্দুরা বৃটিশদের স্বাগতম করেছে বলেই এ দেশে বৃটিশ-রাজ সম্ভব হয়েছে। এরপর কোনো উন্মাদও সুস্থ বুদ্ধিতে বলতে পারবে না যে হিন্দু-মুসলমান এক জাতি।

অনিমা আবার বললো : তুমি আমার ভাই নও, এ কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করব না।

—দেখ, ব্যক্তিগত সম্পর্কের প্রশ্ন তুলে কোনো বৃহৎ সমস্যার সমাধান হয় না। ফরাসি, জার্মান, ইংরেজ, মার্কিন এদের পরস্পরের বন্ধু সংখ্যা নিতান্ত কম হবে না, হয়তো প্রয়োজন হলে এক বন্ধু আর এক বন্ধুর জন্য প্রাণও দেবে; কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তারা এক জাতিত্বের

কথা চিন্তা করবে না। তাছাড়া পৃথক হলেই আমাদের শত্রুভাবাপন্ন হতে হবে, এমন কথা মনে করবার কোনো কারণই নেই। কায়েদে আযম বহুবার বলেছেন : Live and let live পাকিস্তান হবার পর দুই রাষ্ট্রের মধ্যে পরম মিত্র ভাব গড়ে তোলা হবে, কায়েদে আযম সে আশাই করেছেন।

—তোমাদের পাকিস্তানে হিন্দুদের কি দশা হবে?

—কি আবার হবে। তারা থাকবে। পাকিস্তানে সকলেরই স্থান হবে—হবে না কেবল রাষ্ট্রদোহীর, সে যেই হোক।

—দেখ শাকের, তুমি হয়তো তর্কে জিতছ, কিন্তু আমার মন বলছে তুমি ভুল করছ, ভুল বলছ। এ কখনো হয়েছে? একটা দেশকে দু'ভাগ করে দু' রাষ্ট্র করবার কথা আগে কেউ ভেবেছে?

—বিশ্ব ইতিহাস আমার নখ-দর্পণে নয়, সুতরাং কখন কি হয়েছে না হয়েছে বলতে পারব না। তবে একটা কথা বলতে পারি; আগে যা হয়েছে চিরকাল তাই হতে থাকবে। আগে লোকে যা ভেবেছে চিরকাল তাই ভাবতে থাকবে, এ যদি হতো, তাহলে প্রগতি শব্দটির কোনো অর্থ থাকত না।

অনিমা তবু বললো :

—মুশতাক আর সেলিনাকে দেখ। তারাও তো মুসলমান। কোথায় পার্থক্য আমাকে বুঝিয়ে দাও।

চোখ তুলে এই ভাই-বোনকে দেখলাম। মুশতাকের পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। সেলিনার পরনে অবশ্যই শাড়ি; মাথার খোঁপায় বেলফুলের মালা জড়ানো; কপালে লাল টিপ। বহিরাবরণটাই যদি মিল আর গরমিলের মাপকাঠি হয়, তাহলে পার্থক্য নেই। তবু আমার দৃষ্টির সামনে মুশতাক কেমন সঙ্কুচিত হয়ে গেল। সেলিনাও তার চেয়ারে একটু নড়ে বসল।

ডি-কে এতক্ষণ নীরব ছিল,—এক প্রকার হিংস্র নীরবতা। এবার সে বললো : জবাব দিন। অমিল কোথায়? অবশ্য আপনার সঙ্গে কোনো প্রকার সামঞ্জস্য বা মিল আমরা দাবি করছি না। কিন্তু মুসলমান সমাজেও এখনো কোনো কোনো সুস্থ লোক আছেন যাঁদের সঙ্গে ওঠা-বসা করতে আমরা বিন্দুমাত্র অসুবিধা বোধ করি না।

এই বলে ডি-কে সেলিনার কাছে উঠে গেল। সেলিনা তাকে সহাস্যে সংবর্ধনা জানিয়ে পাশের চেয়ারটিতে বসতে অনুরোধ করল।

আমি জবাবে বললাম : আপনারা যাতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা বোধ না করেন সেই উদ্দেশ্যে এই সুস্থ মুসলমানগণ তাঁদের স্বকীয়তার সব চিহ্ন সচেষ্ট হয়ে বর্জন করে আসেন। মুশতাক আমার বন্ধু, তার সম্বন্ধে এর বেশি আমি কিছু বলতে চাই না।

এইবার মুশতাক আমার দিকে তাকালো। তার মুখ কালো হয়ে গেছে।

আমি তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আবার অনিমাকে বললাম :

—তাছাড়া কেবল বাইরের মিলটুকু দেখে সবসময় বিচার করা ঠিক নয়। চার্চিল আর রুজভেল্টের মধ্যেও কোনো অমিল আছে, আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় না। অথচ একজন ইংরেজ এবং অপরজন আমেরিকান।

ডি-কে প্রস্তাব করল : মুশতাককেই প্রশ্ন করা হোক, কোনো পার্থক্য আছে বলে সে মনে করে কি না।

এবার মুশতাকের অন্ধকার মুখ আরো অন্ধকার হয়ে গেল। অনিমা একবার তার দিকে

তাকিয়ে দেখল। সে কি মনে করল সেই জানে কিন্তু মুশতাককে প্রশ্নের জবাব দিতে পীড়াপীড়ি করল না। সে বরং বললো : এবার শেষ করতো তর্ক। মাথা ধরে গেছে। চলো কিছু খাওয়া-দাওয়া করা যাক।

সকলেই উঠে পড়লাম। মুশতাক কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে অনিমাকে ধন্যবাদ জানালো।

খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে আমরা সকলেই বাইরে এসে চেয়ারে বসলাম। লোকের ভিড় আর তিক্ত তর্কের মধ্যে থেকে আমিও হাঁফিয়ে উঠেছিলাম। এক সময় উঠে পড়লাম এবং নির্জন কোণে একটি গাছের নিচে এসে দাঁড়ালাম। গাছের বিপরীত পার্শ্ব থেকে দু'জনের কথা বলার শব্দ ভেসে এলো। সেলিনা মুশতাককে বলছে : আজ তোমার বন্ধুর কীর্তি দেখে লজ্জায় মাথা তুলতে পারছি না।

মুশতাক জবাব দিলো : কেন? শাকের অন্যায় কিছুই বলে নি। যা বলেছে হক কথা বলেছে। ওর সৎ সাহস আছে, আমাদের নেই। আমরা সবকিছুই করি আমাদের স্কুল-কলেজের বন্ধুদের খুশি করবার জন্য।

সেলিনা আর কিছু বললো না। রাগে সেখান থেকে দ্রুত চলে গেল।

প্রায় ঠিক সেই মুহূর্তেই অনিমা আর সুনীল বিপরীত পার্শ্ব দিয়ে সেইখানেই উপস্থিত হলো। অনিমা বললো : শোনো শাকের! তোমার মতের সাথে আমার মতের মিল নেই। কিন্তু এ কথা আমি বলব তুমি তোমার বক্তব্য অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে নিবেদন করেছ। তোমাদের পাকিস্তান দাবির পিছনে যে কেবল নেতিবাচক বিতর্ক আর মনোমালিন্যই নেই, বরং তার চাইতে অনেক গভীর আর মৌলিক জীবনাদর্শের প্রশ্ন জড়িত আছে, সে কথা আগে আমার কোনোদিনই মনে হয় নি।

আমি আর কোনো মন্তব্য করলাম না। একে একে সকলেই আবার সেই কামরাটিতেই ফিরে এলাম।

আবার সেই একই তর্কের সূত্র ধরে সুনীল বললো : আমরা অতীতে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই বাস করেছি, কখনো পৃথক হবার তো কথাও ওঠে নি।

—পৃথক আমরা চিরকালই ছিলাম। রেল স্টেশনেও বহু নর-বারী একত্র হয়, এক সঙ্গে ওঠা-বসা করে, বাক্য বিনিময়ও হয় কিন্তু যে যার গন্তব্যস্থলের দিকে অগ্রসর হবার পর কি কেউ কারো কথা মনে রাখে?

—উপমা তো আর যুক্তি নয়।

—দেখুন, কতগুলো সত্য আছে, যা প্রমাণ করবার জন্য যুক্তি আবশ্যক হয় না। তাছাড়া এক বছর ধরে আমরা আর আমাদের নেতারা যুক্তি কি কম সরবরাহ করেছি।

সুনীল এবার অনিমারই কথার পুনরুক্তি করে বললো : আমি কিছুতেই মানব না যে আপনি আমার ভাই নন।

এ কথার আর কি জবাব সম্ভব? আবেগ যখন আলোচনার বুনিয়াদ হয় তখন তর্ক করা বৃথা। বরং জবাব দিতে গেলে অনেক সময় অসৌজন্যই প্রকাশ পায়। তাই আমিও বললাম : পিতৃ সম্পত্তি দুই ভাই ভাগ করেই নেয়। সৌভ্রাত্র আর সম্প্রীতি আছে বলেই কেউ কারো দাবি ছেড়ে দেয় না।

হঠাৎ ডি-কে হো-হো করে হেসে উঠল। সে কি দুর্নিবার দুর্বিনীত হাসি। তার হাবভাব দেখে আমরা সকলেই অনুমান করলাম, একবার তার হাসি থামলে সে একটা চিরস্মরণীয় মন্তব্য করবে। তাই কামরাসুদ্ধ লোক তার হাসি থামবার অপেক্ষায় বসে থাকলাম।

—ভারতবর্ষটাকে—হো হো হা হা হি হি—আপনি হি হি পৈতৃক সম্পত্তি হা হা হা—মনে করেন না কি—হো হো হো!

আমি সম্পূর্ণ শান্ত থাকলাম। আমার অধরের কোণে একটুখানি হাসির আভাস হয়তো দেখা গিয়ে থাকবে। মুশতাককে সম্বোধন করে বললাম : মুশতাক একটা সিগারেট দেতো রে।

মুশতাক দ্রুত একটা সিগারেট এগিয়ে দিল, দ্রুততর হস্তে সেটা ধরিয়ে দিল। ঘরসুদ্ধ লোক আমার উত্তর শুনবার জন্য নীরব, ডি-কে পর্যন্ত উৎসুক দৃষ্টিতে অপেক্ষা করছিল। ফাঁসির হুকুম দেবার পর বোধ করি জুরি এইভাবেই আসামির মুখভাব লক্ষ্য করতে থাকে।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে জবাব দিলাম। কবি যখন প্রিয়ার মুখের সঙ্গে চাঁদের তুলনা করেন, তখন চাঁদকেই প্রিয়া মনে করেন না কি!

ডি-কে অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে এক অপ্রত্যাশিত মন্তব্য করল : মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ না বলে আপনাদের বলা উচিত মুসলিম লীগ জিন্নাবাদ!

—আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠার আর সর্বজনমান্য নেতা সম্পর্কে আপনার উক্তি অমার্জনীয় রকম অশোভন আর অযৌক্তিক এইটুকু বলবার পর আপনার সঙ্গে আলাপ করবার আর কোনো স্পৃহা অবশিষ্ট নেই। শুধু একটি কথা বলব! ইতিহাস এক সময় এই রায়ই দেবে যে কায়েদে আযম এশিয়ার সর্বাপেক্ষা দূরদর্শী আর বিচক্ষণ নেতা। আমরা বেশ বুঝি, কায়েদে আযম আমাদের যে পরিমাণ উপকার করেছেন ঠিক সেই পরিমাপেই আপনাদের উষ্মার কারণ হয়েছেন।

ডি-কে আর একটি অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন করল : মুসলমানদের সম্বন্ধে হিন্দু লেখকরা কোথায় কি বিরূপ মন্তব্য করেছেন সব কি আপনার কণ্ঠাগ্রে?

—কণ্ঠাগ্রে থাকবার মতো কথা যে।

এবার সুনীল ডি-কে-কে এক সুপরামর্শ দিল : চলো হেঃ চলো ডি-কে সাহেব, নিচে চলো। গান-টান শোনা যাক।

বোমার মতো ফেটে পড়ে ডি-কে অপরিসীম রূঢ় কণ্ঠে ঝড়ের বেগে বলে গেল : যাও যাও। একজন নেড়েকে ডেকে এনে বাড়ির মেয়েদের মধ্যে ভিড়িয়ে দিতে তোমাদের লজ্জা করে না। যখন কাউকে নিয়ে ইলোপ করবে তখনই তোমাদের শিক্ষা হবে।

অনিমা ত্রস্ত হরিণীর মতো ভীত চকিত দৃষ্টিতে তৎক্ষণাৎ আমার দিকে একবার তাকালো! আমিও একবার তার দিকে তাকালাম। একটুখানি হাসতেও ভুলে যাই নি।

অনিমা তার মাথা আর দৃষ্টি দুই নত করে নিল।

ছাব্বিশ

অনিমাদের বাড়ির গেটের বাইরে অন্নপ্রার্থীর ভিড়ের কথা আগেই বলেছি। জন্মদিনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে যখন বাইরে বেরিয়ে এলাম, দেখলাম অদূরেই একটা মিষ্টান্নের দোকানের কাছে বেশ কিছুসংখ্যক পুলিশ এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। যুদ্ধ চলছে। পথে আলোকের অভাব। কিন্তু সেই আলোতেই দেখতে পেলাম, মিষ্টির দোকানটির সামনের কাচ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। রাস্তায় টুকরো টুকরো কাচ ইতস্তত পড়ে আছে। একটু আগেই একদল ভিখিরি দোকানটি লুট করেছে। পুলিশ এসে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে, দু'-একজনকে

ধরেও নিয়ে গেছে।

বেশ রাত হয়ে গেছে। রাস্তা অন্ধকার। তার ওপর আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ। হাঙ্গামার পর এই পথটিতেও লোকজনের যাতায়াত অত্যন্ত বিরল। স্ট্রিট লাইটে অর্ধ-অবগুণ্ঠিত আলোকে ভাঙা কাচগুলোর ফাঁক দিয়ে দোকানটি কেমন শূন্য রিক্ত মনে হচ্ছিল। পথের ওপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কাচের খণ্ডগুলো চিকমিক করছিল—মাছের আঁশের মতো।

আমি দ্রুত পা চালিয়ে দিলাম। এখুনি শেষ ট্রাম ছেড়ে দেবে। আধ-অন্ধকারে আধ-আলোকে পথ চলতে চলতে এক প্রকার অবর্ণনীয় অনুভূতি সমস্ত মনটিকে আচ্ছন্ন করে রাখল। সেই গভীর রাত্রেও ভিখিরি পথে পথে এদিকওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। নারীদের কোলে শিশু, পরনের জীর্ণ বস্ত্র নগ্নতাকে আরো উন্মোচিত করছে। অনেকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। কি চায়? ভিক্ষা? আমি আরো দ্রুত পা চালিয়ে দি। কেমন যেন প্রেতাত্মার ছায়ার মতো মনে হয় এই দুর্ভিক্ষতাড়িত লোকগুলোকে। অন্ধকার জনবিরল পথে ছায়ার মতো ঘুরে বেড়ায়।

মাঝে মাঝে ট্রামের শব্দ কানে আসে। এখনো ট্রাম চলছে; তবে দিনের মতো সন্ধ্যার মতো অত ঘন-ঘন নয়। অনেক পরপর। পাশের হোটেল থেকে চায়ের দোকান থেকে তখনো মাঝে মাঝে উত্তেজিত উল্লসিত কণ্ঠস্বর অন্যমনস্ক পথিককে হঠাৎ সচকিত করে দেয়। যুদ্ধের বাজারে নিশাচরের সংখ্যা বেড়েছে। জানালার শার্সির ভিতর দিয়ে হোটেলের আলো আর মদ্যপায়ীর মস্তক চোখে পড়ে। বোতল খুলবার শব্দ পর্যন্ত কানে ভেসে আসে। বহুদূরে একদল সৈনিক সমতালে পা ফেলে কোথায় যেন চলেছে। তাদের পায়ের ভারি আওয়াজও দূরত্বের সমুদ্র অতিক্রম করে কিছুটা হালকা হয়ে কানে বাজতে থাকে।

আজ রাত্রির ঘটনাগুলোর কথা চিন্তা করতে করতে এক সময় ট্রামে উঠলাম, তারপর বাড়ি পৌঁছলাম। নিদ্রিত গৃহের শান্তি অব্যাহত রেখে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম।

অনিমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পথে হাঁটছি, এমন সময় কানে এলো : শোনো।

হঠাৎ ঠিক কানের কাছেই এই ডাক শুনে আমি বিদ্যুৎ-গতিতে ঘুরে দাঁড়ালাম।

তারপরের আবিষ্কারে অপরিসীম বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। এত রাত্রে এইখানে, একাকী সেলিনাকে দেখতে পাব এমন সম্ভাবনার কথা কখনো মনে আসে নি।

আকাশে মেঘ গর্জন করে উঠল। চকিতে একবার বিদ্যুৎ আকাশের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত নৃত্যের ছন্দে এগিয়ে গিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। ক্ষণকালের সেই আলোকেই সম্মুখের বিস্তৃত পথটি একবার চোখের সামনে ভেসে উঠল। কালো পিচের রাস্তা অভ্রভেদী অন্ধকারের মতো চোখের ওপর নিমেষের জন্য ভেসে উঠে আবার তিমিরের গর্ভে মিলিয়ে গেল। মাথার ওপর ঢোলকের গুরুগম্ভীর আওয়াজের মতো আবার মেঘ ডেকে উঠল। সিক্ত-বাতাসের একটা ঢেউ এসে সমস্ত শরীরে কাঁপনও ধরিয়ে দিল। তারপর মাথার ওপর বৃষ্টি ভেঙে পড়ল।

—একটু তাড়াতাড়ি পা চালাও। একেবারে ভিজে যাব।

আমি এমন মোহাবিষ্ট, সমস্ত অনুভূতির অতীত, এমন এক আচ্ছন্ন অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিলাম যে প্রতিটি শব্দেই চমকে উঠছিলাম। পিছনে একটা রিকশার ঠুনঠুন শব্দেও ভয়ানক চমকে উঠলাম—চোর যেভাবে অন্ধকার কোণে গৃহস্বামীর পদশব্দ শুনে চমকে ওঠে।

—এই রিকশাতেই উঠে পড়।

কখন যে রিকশায় উঠলাম কতদূর যে এগুলাম, কি কি কথা হলো, আমি কোনো জবাব দিলাম কি না, বহুক্ষণ যেন সে সম্বন্ধে আমার কোনো জ্ঞানই ছিল না। কেবল রিকশা এগিয়ে

চলেছে, আর রিকশার হলুদ আলোটি অন্ধকারের বুকে এক অজ্ঞাত অতিকায় সাপের চোখের মতো দপদপ করে জ্বলছে, কেমন করে যেন এই চেতনাটুকুই ছিল।

আশ্চর্য এই আমি।

ফুটবল মাঠে, বিতর্ক-সভায়, স্কুল-কলেজে আমি পরম আত্মনির্ভর, কিন্তু যে-মুহূর্তে আমি সেলিনার সঙ্গে একাকী, তক্ষুণি এক অসহায় নিরুপায় অক্ষমতায় আমার সমস্ত শরীর-মন পঙ্গু হয়ে যায়। প্রথম দর্শন থেকেই সেলিনাই হয় প্রবল পক্ষ। তার কারণ কি কেবল এই, সেলিনার আচরণে আমি পরম্পরার সূত্র দেখতে পাই না। তার কারণ কি এই, সেলিনার আচরণে আমার প্রতি এক নিদারুণ ধিক্কার দেখতে পাই; তার কারণ কি এই, তার গতিবিধি মতামত আমি অনুমোদন করি না?

কোনো একটি কারণে আমি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ি না, তা ঠিক। তবে আমার ভয় হতো, সেলিনার পদক্ষেপ এত দ্রুত যে আমি তার সমতালে অগ্রসর হতে পারব না। হতে চাইও না। তাই সেলিনার সংস্পর্শে এলে এক অজ্ঞাত আতঙ্ক আমাকে নিবিড়ভাবে বেষ্টন করে ফেলে।

আজ রাত্রে সেলিনাও যেন আতঙ্কিত, চিন্তিত, এবং এমনকি আমার কাছে পৌঁছে যেন কিছুটা আশ্রিতও বোধ করছিল।

রিকশায় উঠে সেলিনা অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে আমার হাত ধরল। এক সময় আমিই প্রশ্ন করলাম : আমরা যাচ্ছি কোথায়?

—চলোই না। আমাকে বিশ্বাস করতে পার না?

লঘুভাবে জবাব দিয়ে সেলিনা এক রহস্যময় হাসি হাসল। তার পরই আবার ভয়ানক গম্ভীর।

—আমরা এক ডাক্তার বাড়ি যাব। এক্ষুণি আমার অপারেশন করানো দরকার।

—অপারেশন?

আমার কণ্ঠে যারপরনাই বিস্ময়।

সেলিনা জবাব দিল : হ্যাঁ। আজ রাত্রেই।

সেই মুহূর্তে একটি ট্রাক দুরন্ত বেগে ছুটে চলে গেল। রিকশা এগিয়ে চলেছে। তাকে কোথায় যেতে হবে সেলিনা হয়তো বলে দিয়েছে কিন্তু কখন বলেছে আমি শুনতে পাই নি। কিন্তু সে একটি অন্ধকার গলি পেরিয়ে এগিয়েই চলেছে। নিস্তব্ধ নিশীথে রিকশাঅলার ঘণ্টার শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। মাঝে মাঝে হঠাৎ এক-আধটা বাড়ির এক-আধটা কামরায় বাতি জ্বলছে দেখা যায়।

রিকশার মধ্যে আমরা দুটি প্রাণী পরস্পরের নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাই।

—কিসের অপারেশন?

সেলিনার কথার জবাবে তৎক্ষণাৎ এই প্রশ্ন করলাম; কিন্তু মনে হলো মাঝখানে যেন একটা গোটা যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে।

সেলিনা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। অনেকক্ষণ নীরব থাকল। তারপর বললো : সেই রাত্রের কথা মনে আছে? সেই যে খিদিরপুর থেকে ফিরে এলাম?

মনে মনে বললাম : সে রাত্রের কথা জীবনে কোনোদিন কি ভুলতে পারব!

সেলিনাই বলে চলল: আমার সর্বনাশ হয়েছে। অপারেশন করে ফেলে দিতে হবে।

এই বলে সেলিনা আরো জোরে আমার হস্ত-পীড়ন করল।

আমার সমস্ত শরীর পাথর হয়ে গেল। মেয়েটা বলে কি! নিজের কানকে যেন বিশ্বাস

করতে পারছিলাম না। এই কি সেই সেলিনা, যে মুশতাকের বোন, যে আমাদের সঙ্গে উঠেছে-বসেছে, এক সঙ্গে বসে ক্যারাম খেলেছে! এ কি সর্বনেশে কথা তার মুখে।

আমার হৃৎপিণ্ড কাটা ছাগলের মতো লাফাতে শুরু করল, এক্ষুণি যেন গলা থেকে বেরিয়ে আসবে।

রিকশার চাকার ঘড়ঘড় ছড়ছড় শব্দ ছাড়া চতুর্দিক নীরব। কেমন করে সেই শব্দ শুনে মনে হচ্ছিল, জল্লাদ তার অস্ত্র শাণিত করছে।

এক দুঃসহ আতঙ্কে সমস্ত পৃথিবীটাই আমার চোখের সামনে দুলতে আরম্ভ করে দিল। অপারেশন করতে গিয়ে সেলিনা যদি মারা যায়? এই গভীর রাত্রে অজানা-অচেনা জায়গায় আমি তখন কি করব? তার মৃত্যুর কি কৈফিয়ত দেব? এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর সময় তার শয্যাপার্শ্বে আমার উপস্থিতির ব্যাখ্যাটাই-বা কি হবে? সেলিনা তো মরেই খালাস! তারপর আমার অবস্থাটা কি হবে? আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, আইন-আদালত সবার চোখে এই আমিই অপরাধী হয়ে থাকব।

সহসা এক নিদারুণ ঘৃণায় আমার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। আচ্ছা স্বার্থপর এই মেয়েটি! এমন এক চরম অন্যায় প্রস্তাব সে করে কি করে—কাদা ঘাঁটবার সময় আমাকে আহ্বান কেন করে! আমি তার কে যে তার জন্য এত বড় ঝুঁকি নিতে যাব?

কিন্তু ততক্ষণে রিকশা একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। রিকশা থেকে নাবতে নাবতে সেলিনা বললো : মুশতাক বাড়ি চলে যাবার পর আমি তোমার পিছু পিছু চলে আসি। সে কিছুই জানে না। আশা করি কোনোদিনই জানবে না। কি বলো? বাড়িতে বলে এসেছি অনিমার সঙ্গে দিন সাতেক থাকব।

—অনিমা জানে?

সেলিনা কোনো জবাব দিল না।

রিকশা থেকে রাস্তায় নেবে একবার সভয়ে চারদিক চোখ বুলিয়ে নিলাম—কোথাও আমাদের এই অভিযানের সাক্ষী আছে কি না।

দরজার কাছে এগিয়ে এসে সেলিনা কড়া নাড়ল। মনে হলো বড় বেশি শব্দ হচ্ছে।

—আস্তে কড়া নাড়। পাড়ার লোক উঠে পড়বে।

—আরো আস্তে নাড়লে ডাক্তার আবার শুনতে পাবে না।

—এই ডাক্তারের সঙ্গে তোমার পরিচয় হলো কোথায়?

সেলিনা এ প্রশ্নেরও কোনো জবাব দিল না।

দরজা খুলে গেল। ঘরের ভিতরের আলো খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে অন্ধকার রাস্তার ওপর টর্চের আলোর মতো এসে পড়ল।

ডাক্তার ইশারা করলেন, আমরা অন্দরে প্রবেশ করলাম।

শিখ ডাক্তার। অল্প বয়স। অত্যন্ত সুপুরুষ। হাত দিয়ে চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে আমাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। তারপর অল্প একটু হেসে মন্তব্য করলেন : So, this is the young man. But...well, he is younger than I thought.

আমার সমস্ত চোখ-মুখ রাঙা হয়ে গেল।

আমাদের বসতে বলে ডাক্তার ভিতরে চলে গেলেন। বলে গেলেন এক্ষুণি ফিরে আসছেন।

সেলিনা বললো : আমাদের বোধ হয় ঘণ্টা দু'-এক লাগবে। তুমি ততক্ষণ এখানেই বসে থাক।

আমি প্রশ্ন করলাম : এখান থেকে আমরা যাব কোথায়?

—অনিমাদের বাড়ি।

—তার বাবা-মা বলবেন কি!

—ব্যবস্থা করে এসেছি, কেউ জানবে না।

সেলিনার দিকে অবাক দৃষ্টিতে একবার তাকালাম। এমনকি তার স্থির শান্ত আত্ম-প্রত্যয় লক্ষ্য করে এক প্রকার ভক্তিও হলো। কিন্তু আমার দৃষ্টির মোকাবিলাতেও তার মুখের কোনো ভাবান্তর দেখলাম না।

এক সময় ডাক্তার ফিরে এলেন।

সেলিনা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। আশ্চর্য, মাথার ওপর ঘোমটা টেনে দিল। আমার কাঁধের ওপর অল্প একটু চাপ দিয়ে শুধু বললো : চললাম!

ডাক্তার একটা ছোট্ট গ্লাসে কি এক প্রকার পানীয় নিয়ে এসে আমার সামনে টেবিলের ওপর রেখে দিলেন। বললেন, Have some gin, It will steady your nerves.

তারপর উভয়েই ভিতরে চলে গেলেন।

সেলিনার আঁচল পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হবার পর মুহূর্তেই আমার সমস্ত শরীর অসহ্য ভয়ে কাঁপতে শুরু করে দিল। মনে হলো, এক্ষুণি বুঝি ফিট হয়ে যাব।

সেলিনা তো বললো : চললাম। কিন্তু এই চললামটা কোথায় ভালো করে উপলব্ধি করবার পরই আমার গোটা শরীর ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করল : চোখের সামনে সবকিছুই নাগরদোলার মতো ঘুরতে শুরু করে দিল। মাথা গরম হয়ে এলো, গলা কাঠ। বুকের কাছে আবার সেই অনুভূতি, একটা গোটা সুপারি সেখানে আটকে গেলে যেমন করে। এইভাবে কতক্ষণ কাটল সঠিক বলা কঠিন। কিন্তু আরো কিছুক্ষণ সেইভাবে বসে থাকতে হলে আমি সত্যি সত্যিই অজ্ঞান হয়ে যেতাম।

কিন্তু দু'ঘণ্টার আগেই—অনেক আগেই ডাক্তার-রোগী উভয়েই ফিরে এলো। উভয়ের চোখে-মুখেই স্বস্তির প্রশান্তি।

ডাক্তার বললেন : False alarm, young lady. But be careful in future. The same to you young man.

ডাক্তারের কথা শুনে এত দুঃখেও আমার হাসি এলো—বড়ই তিক্ত সে হাসি।

সেলিনা আর আমি উভয়েই আবার রাত্রির অন্ধকারে বেরিয়ে এলাম। রিকশায় উঠবার পর ডাক্তার যখন দরজা বন্ধ করে দিলেন, তখন সেলিনা বললো : দেখতো, কি কাণ্ডটা করলাম। মিছিমিছি।

তারপর প্রসঙ্গটা সামান্য একটু বদলে সে আবার বললো : তুমিই দ্বিতীয় প্রাণী জানলে। আর কেউ জানবে না তো।

আমি কোনো জবাবই দিলাম না। বস্তুত আমার পার্শ্বের এই মেয়েটির স্পর্শ আমার কাছে তখন অসহ্য মনে হচ্ছিল।

এমন সময় সেলিনা এক কাণ্ড করল।

হঠাৎ দু'হাত দিয়ে আমাকে সজোরে জড়িয়ে ধরে আমার দুই ঠোঁটের ওপর একটা দীর্ঘ চুম্বন দিল—আমার মনে হতে লাগল, এ চুম্বন যেন শেষ হবে না।

আমি সজোরে নিজেকে মুক্ত করে নিলাম। রিকশা ভয়ানকভাবে নড়ে উঠল! রিকশাঅলা প্রতিবাদ করে বললো : এ রকম করলে রিকশা চালাব কি করে।

রিকশাঅলা হয়তো এ ধরনের বহু দৃশ্যেরই সাক্ষী, তাই আর কিছু বললো না।

সেলিনা এবার স্থির হয়ে বসল। আমিও বহুক্ষণ ধরে কোনো কথা বললাম না, বলবার প্রবৃত্তি হলো না। তারপর প্রশ্ন করলাম :

—কি তোমার পেশা?

—পেশা।

—হ্যাঁ পেশা। তাই তো মনে হয়। হয় তুমি দানবী, নয় তুমি উন্মাদ। আজকের পরিবেশে তোমাকে দেখে আমার বারবার মনে হচ্ছিল, তুমি স্বচ্ছন্দে শীতল মস্তিষ্কে মানুষ খুন করতে পার।

এরপর আর একটি কথাও হয় নি। একেবারে অনিমাদের বাড়ির গেটের সামনে এসে আবার যখন রিকশা দাঁড়ালো, তখন আর একবার পার্শ্বে সেলিনার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। এও কি সম্ভব? সেলিনার চোখে অশ্রু। রিকশার কোণে মাথা কাত করে অঝোরে কাঁদছে।

একটি কথাও না বলে সে নেবে পড়ল, তারপর সোজা এগিয়ে গেল গেটের দিকে। খোলা দুটি গেটের মাঝখানে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে সে বললো : হয়তো তোমার কথাই ঠিক।

তারপর অত্যন্ত দর্পিত ভঙ্গিতে ভিতরে অদৃশ্য হলো।

ঘুম ভাঙলে দেখলাম আমার গোটা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। অদ্ভুত স্বপ্ন! এমন স্বপ্নও লোকে দেখে! যাই হোক, একটা স্বস্তির নিশ্বাস বুকটাকে হালকা করে দিল।

আশ্চর্য, এর কিছুদিন পরই কলেজের ঠিকানায় একটা চিঠি পেলাম। সেলিনার চিঠি। সে লিখেছে : "তোমার সাথে কথা আছে। অনেক কথা। তুমি আমার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানো। আবার অনেক কিছুই জানো না। সবটাই তোমাকে শোনাতে চাই—সবটুকু শুনলে তোমার ধারণা হয়তো একটু অন্যরকম হবে। মুখোমুখি না বলে, চিঠিতেই সব খুলে বলতে পারতাম; কিন্তু চিঠি তোমার হাতে যদি না পৌঁছয়? তাই সাক্ষাতেই বলতে চাই।

তুমি ভাবছ, বলবার প্রয়োজন কি? হয়তো প্রয়োজন কিছুই নেই। তবু তুমি আমার জীবনের অমাবস্যাটাই কেবল দেখলে, আর কিছুই জানলে না, এই চিন্তাটুকু আমাকে পীড়িত করে।

আমার কথা বুঝি বিশ্বাস হতে চায় না? দোষ তোমার নয়। কেনই-বা বিশ্বাস হবে।

আমার জীবনের এক গোপন গলিতে অপ্রত্যাশিতভাবে তোমার সঙ্গে দেখা। দেখা না হলেই ভালো হতো। অথবা হয়তো এ-ই ভালো হয়েছে। সকলের চোখে আমি অপরূপ সুন্দরী, অন্তত একজন থাক যে আমাকে স্বরূপে দেখেছে।

তোমার সঙ্গে আমার গোপন কথা ভাগাভাগি করে নেব। মনের বোঝাও হালকা হবে। নেবে সেই দুঃসহ ভারের কিছুটা?

জানি তুমি আসবেই। তেইশ তারিখে, ছটার সময়, মেট্রো সিনেমায়। আসবে তো? আমি অপেক্ষা করে থাকব। টিকিট কাটা থাকবে।

তোমার পরীক্ষা সামনে। ভালো করে পড়াশোনা করো। তোমার সুন্দর জীবনটা নষ্ট হতে দিও না। কিছুতেই না।

বয়সে আমি কিছু বড়। মেধায় তুমি। তবু আমি নারী। তোমার চাইতে বেশি বুঝি। আর আমার অভিজ্ঞতা? তার কিছুটা পরিচয় তো পেয়েছ? তুমি বড় হবে, অনেক বড় হবে। চিঠিটা ছিঁড়ে ফেল। কিছুতেই যেন ভুল না হয়।"

এইখানেই সেলিনার চিঠি শেষ হয়েছে। এই দ্বিতীয়বার শুনলাম, আমি না কি বড় হবো।

চিঠিটা ছিঁড়ে ফেললাম, কুচিকুচি করে। এইভাবেই এত সহজেই যদি সেলিনার জীবনের

গোপন গলিটার অস্তিত্বও শেষ করা যেত! তারও মনে আছে! সেও দুঃখ পায় কষ্ট পায়, বিপদের সময় সঙ্গ চায়?

সেও বিরূপ ধারণার সম্ভাবনা চিন্তা করে বিচলিত হয়? তারও বন্ধু প্রয়োজন—বিশেষ করে আমার মতো বন্ধু!

কিন্তু সেলিনাকে চিনবার তখনো অনেক বাকি ছিল।

যাই হোক সেলিনার এই নিমন্ত্রণ আমি রক্ষা করি নি। বস্তুত সেই রাত্রের বিভীষিকা আমি ভুলতে পারি নি। জীবনে আর কোনোদিন কোনো প্রলোভনইবা কোনো প্রয়োজনই আমাকে সেলিনার কাছে নিয়ে আসতে পারবে না, মনে মনে এমনই এক ভীষণ প্রতিজ্ঞা করে বসেছিলাম; কিন্তু মানুষের প্রতিজ্ঞা।

কয়েকদিন পর আবার সেলিনার চিঠি পেলাম। এবার সে লিখেছে : "তুমি শেষ পর্যন্ত এলে না। তোমার পথের দিকে চেয়ে চেয়ে আমার চোখ ক্ষয়ে গেল, তবু তুমি এলে না! আমি একা মেয়েমানুষ রাজ্যের পুরুষের মাঝখানে কতক্ষণ যে বসেছিলাম, তা যদি জানতে। কত লোক এলো-গেল, কতজন আমার চারপাশে ঘুরে বেড়ালো, লেমনেড-বিয়ার সেবন করল, এক একটা করে ঘণ্টা পড়ল, সকলেই এক এক হলের ভিতর প্রবেশ করল, আমি তবু টিকিট হাতে করে তোমার আশায় বসেই থাকলাম। বারের বেয়ারারাও আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। তারা হয়তো মনে করল : সবাই আসে-যায়, ছবি শুরু হবার সময় হলো, সবাই অডিটোরিয়ামে প্রবেশ করে, অথচ এই মেয়েটি সেই যে ঠায় বসে আছে, সে আর উঠবার নাম করে না কেন। আমার পিছনেই দু'জন হুনোমুখো সাহেব ট্রালালা করে গান জুড়ে দিল। তবু আমার চোখ বারবার সিঁড়ি দিয়ে নাবতে থাকে, বারবার আমার মন বলতে থাকে, তুমি আসবে, তুমি নিশ্চয়ই আসবে, তুমি না এসে থাকতে পারবে না। সিঁড়িতে পদধ্বনি হয়, আমার দুটি কান খাড়া হয়ে ওঠে এই বুঝি তুমি এলে!

কিন্তু তুমি তো এলে না! সত্যিই এলে না?

কেনই-বা আসবে!

তবু আমি আবার অপেক্ষা করব। কাল রবিবার। তুমি চাইনিজ ফুড খেতে ভালোবাস। কাল দুপুর সাড়ে বারোটায় আমি চীনে পাড়ার নানকিং হোটেলে তোমার জন্য অপেক্ষা করব। চীনে পাড়া আমার বাসা থেকে অনেক দূর। তাছাড়া আজকালকার দিনে একাকী একটি মেয়েমানুষের জন্য নিরাপদও নয়। তবু আমি একাই অপেক্ষা করব।

এরপরও কি তুমি আসবে না?

পুনশ্চ—পড়া হলেই এই চিঠিটিও ছিঁড়ে ফেল। আশা করি কিছুতেই ভুলবে না।

চীনে পাড়া এক নতুন দুনিয়া। সরু সরু আঁকাবাঁকা গলি, খাটোখাটো ছোট-ছোট বাড়িঘর, যেমন অন্ধকার তেমনি নোংরা। চামড়ার আর গাঁজার আর কোকেনের গন্ধ, অধিবাসী চীনাদের বিচিত্র আর সন্দিগ্ধ চোখ-মুখ, পথের ওপরই রকম-বেরকমের পণ্যের সম্ভার—দেখেশুনে মনে হয়, এই অঞ্চলটি কলকাতার জনসমুদ্রে এক অচেনা দ্বীপ। রাত্রে তো বটেই, এমনকি দিনেও এই পাড়ার পথঘাটে চলাফেরা করতে গা-টা কেমন ছমছম করে। গুমখুন করবার জন্যই যেন এই পাড়াটি তৈরি করা হয়েছে—এমনই রহস্যময় পরিবেশ। কিন্তু ঠিক সেই কারণেই এই অঞ্চলটির একান্ত নিজস্ব এক আকর্ষণ আর ব্যক্তিত্ব আছে। মুখ বদলাবার জন্য অনাস্বাদিত খাদ্যের মতো, চোখ বদলাবার জন্য এমন আর একটি পাড়া গোটা কলকাতায় আর কোথাও নেই। মনে হয় এক নতুন দুনিয়ায় চলে এসেছি এবং মুখ বদলাবার জন্যও এখানে যেমন

ব্যবস্থা আছে, তার ওপর আর কথা নেই। ভোজনবিলাসী মাত্রেই বলবেন : চীনে খাবার যদি খেতে চাও তো নানকিং যাও। খাস নানকিং-এও না কি কলকাতার নানকিং-এর মতো খাস চীনে খাবার পাবে না।

আমার আগেই সেলিনা পৌঁছে গিয়েছিল। একটা কেবিনে একটা কোণে চুপচাপ বসেছিল। সেদিন আমার মেজাজ ছিল হালকা এমনকি পাতলা! একটু হেসেই জিগ্যেস করলাম : কতক্ষণ এসেছ? বহুক্ষণ বসে থাকতে হয় নি তো। খাওয়াবে কিন্তু তুমি। আমার পকেট শূন্য!

সেলিনা জবাব দিল : এইমাত্র এলাম। তোমার অন্তত পকেট আছে আমার যে তাও নেই।

—না, তা নেই বটে। কিন্তু তোমাদের সম্পদ তো আর পকেটে লুকানো থাকে না।

—তার মানে?

—মানে কিছু নেই!

সেলিনার পরনে পাতলা ফিনফিনে শাড়ি। অবগুণ্ঠনের অছিলায় উন্মোচনের কৌশল সে জানে।

সেলিনা বলে : এরা কিন্তু সার্ভ করতে অনেক সময় নেয়। তাড়াতাড়ি বলতে হবে কি খেতে চাও।

—কি খেতে চাই? প্রথমে বিয়ার, তারপর ছাউছাউ, নুডুলস আর সুইট এন্ড সাওয়ার পোর্ক।

—বিয়ার পোর্ক! তুমি খাবে বিয়ার আর শূয়ার।

—চমকে উঠলে যে। তুমি তো এত সহজেই চমকাবার পাত্রী নও।

—সে যাই বল, তোমাকে বিয়ার আর পোর্ক আমি খাওয়াতে পারব না। তোমার মুখে ওসব কথা মানায় না।

এ কথার পর কিছুতেই আমি হাসি রোধ করতে পারলাম না।

—হা হা হা। তোমার মুখে এ কথাটি কিন্তু সুন্দর মানিয়েছে তোমারই যোগ্য কথা।

সেলিনার মুখ মলিন হয়ে গেল। হবার জন্যই কথাগুলো বলা। তার মুখভাব একবার দেখে নিয়ে আমি আবার হাসতে শুরু করলাম। ইচ্ছাকৃত হাসি নয়, অপ্রতিরোধ্য হাসি।

লজ্জায় সেলিনার চিবুক তার বুকের ওপর নেবে এলো। পাশের কেবিনে ছুরি-কাঁটার শব্দ, মদের বোতল খুলবার শব্দ, আর অস্ফুট প্রেমালাপের শব্দ।

সেলিনা নিজের সঙ্গে লড়াই করছিল। এক সময় সে মনস্থির করে মাথা উঁচু করে বসল। বেল টিপে ওয়েটারকে ডেকে অর্ডার দিল : প্রথমে এক বোতল বিয়ার নিয়ে এসো। তারপর ছাউছাউ নুডুলস সুইট এন্ড সাওয়ার পোর্ক আর সুইট এন্ড সাওয়ার প্রন।

ওয়েটার তার নোট বইয়ে ফরমায়েশ টুকে নিয়ে বিদায় নিল। আমি তখনো একটু একটু হাসছি। বললাম : সুইট এন্ড সাওয়ার প্রন বুঝি তোমার জন্য।

সেলিনা নিরুত্তর থাকল। তার চোখ যেন একটু সিক্ত!

—কৈ জবাব দিলে না।

—হ্যাঁ আমার জন্য।

ওয়েটার বিয়ারের বোতল হাতে নিয়ে উপস্থিত হলো। আমি তাকে বললাম : ওয়েটার, পোর্ক লাগবে না শুধু প্রন নিয়ে এসো।

খোলা বিয়ারের বোতল থেকে গ্লাসের মধ্যে বিয়ার ঢেলে নিলাম। গ্লাসে একটা চুমুক দিলাম। সামনে টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকল অর্ধশূন্য অর্ধপূর্ণ বোতলটি।

এক ঢোকে অনেকটা খেয়ে নিয়ে গ্লাসটা টেবিলের ওপর নাবিয়ে রাখলাম। তারপর একটা সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসলাম। আমার চঞ্চল উত্তেজিত স্নায়ুগুলো শান্ত হয়ে এলো। একটা আরামের নিশ্বাস মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, আঃ।

সেলিনা আমার হাবভাব লক্ষ্য করছিল। সে প্রশ্ন করল : তুমি কি নিয়মিত বিয়ার খাও।

—না। আজই প্রথম।

—তবে আজই-বা কেন খেলে?

—সব কিছুরই একটা শুরু আছে, আগে খাই নি বলে এখন খাব না, এটা কোনো যুক্তি নয়।

এই বলে গেলাসটা আবার মুখের সামনে টেনে নিলাম। ঠোঁট মুছে এক গাল হাসি হেসে আবার বললাম : তুমিই কি খিদিরপুরে আবার গেছ।

তারপর হো-হো করে হেসে উঠলাম : সেলিনা দুই হাত দিয়ে বুক চেপে বসে থাকল।

হাসতে হাসতে আবার বললাম : তুমি পোর্ক খেতে চাও না কেন? জাহান্নামে যাবার ভয়?

সেলিনা দৃপ্ত কণ্ঠে জবাব দিল : হ্যাঁ তাই।

ঠাস করে গেলাসটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে হাসিতে ফেটে পড়লাম। হাসি থামলে বললাম : সত্যিই, তোমার ধর্মপরায়ণতায় আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। তোমার মতোটি আর কোনোদিন দেখব না।

—তুমি আমাকে ভয়ানক ঘৃণা কর, তাই না? কি ভাব তুমি আমার সম্বন্ধে?

—কি ভাবি? শুনবে কি ভাবি?

—হ্যাঁ

—তুমি King Lear পড়েছ?

—পড়েছি।

বিয়ারে লোক সহজে মাতাল হয় না। কিন্তু যে-পানরসিক প্রথম বিয়ার সেবন করছে তার মাথা সুস্থ-স্বাভাবিক থাকে না। আমারও মুখ দিয়ে হঙ্কার মতো তপ্ত শব্দগুলো বেরিয়ে এলো—

Down from the waist they are Centaurs,
Though women all above.
But to the girdle do the Gods inherit,
Beneath is all the fiend's
There's hell, there's darkness, there is the sulphurous pit, burning, scalding, stench, consumption.

সেলিনা অত্যন্ত অন্যমনস্ক ছিল। সে আমার কথা শুনল না, কি বুঝল জানি না; কিন্তু তার কোনো ভাবান্তর দেখলাম না।

এতক্ষণে ওয়েটার খাবার নিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে খাবারের ওপর ঝুঁকে পড়লাম। সেলিনা একটু যেন বিদ্রূপের ভঙ্গিতেই প্রশ্ন করল :

—আরো এক বোতল বিয়ার চলবে না কি!

ভোজ্যবস্তুগুলোর ওপর থেকে একবার চোখ তুলে নিয়ে আমিও ঠিক ততটাই বিদ্রূপের ভঙ্গিতে জবাব দিলাম : আলবাত চলবে!

ওয়েটার আরো এক বোতল বিয়ার নিয়ে এলো। পানির বদলে বিয়ার পান করতে লাগলাম।

খাচ্ছি, ছুরি-কাঁটা নাড়ছি, এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে এক-আধটা কথা হচ্ছে।

হঠাৎ সেলিনার মুখে হাসি দেখে জিগ্যেস করলাম : হাসছ কেন?

—এমনি। কোনো কারণ নেই।

—তা হতেই পারে না। বলতে হবে কেন।

—না, ভাবছিলাম, তুমি এখনো বাম হাতে ছুরি ধর কিনা? রাগ করলে?

আমি সজোরে হেসে উঠলাম।

এইভাবেই এক সময় সেলিনা আবার প্রশ্ন করল : আচ্ছা তোমার বয়স কত?

—কেন বলতো?

—এমনিই জিগ্যেস করছি। মানা আছে?

—বয়স? তা প্রায় উনিশ। তোমার কত?

—ছিঃ! মেয়েদের বয়স জানতে নেই। তুমি এখনো আমাকে ঘৃণা কর না তো!

—ঘৃণা! তুমি এত সুন্দর, তোমাকে ঘৃণা করতে পারি না!

—ভিতরটা তো আর সুন্দর নয়!

সে কথার জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করলাম : তুমি আজকে আমাকে এখানে ডাকলে কেন তাতো এখনো বললে না!

—তা বলছি। তার আগে একটা জবাব দাও। চিঠি দুটো ছিঁড়ে ফেলেছ তো?

—হ্যাঁ। সঙ্গে সঙ্গে। আমাকে ডাকলে কেন তাই বল।

—বলছি বাবা বলছি। যদি বলি এমনিতেই ডেকেছি, তোমার সঙ্গে দুদণ্ড কথা বলব বলে।

—যদি তা বলো আমি একেবারেই অবাক হব না।

—হবে না! বিশ্বাস করবে তো?

—বিশ্বাস করব? তোমার কথা?

—কিন্তু সত্যিই আমি তোমাকে ভালোবাসি।

—তামাসা করবার আর সময় পেলে না।

—তামাসা কেন হবে। কেন? আমি কি তোমাকে ভালোবাসতে পারি না?

আমার আর কথা কাটাকাটি করবার প্রবৃত্তি থাকল না। সেলিনার সঙ্গে প্রেমালাপ করবার চাইতে এক গেলাস বিয়ার খাওয়া ভালো। তাই গেলাসের ওপর আবার বোতল উপুড় করলাম। আমিই এক সময় জিগ্যেস করলাম : খিদিরপুরের লোকটি কোথায়?

—একটা অনুরোধ রাখবে? ঐ লোকটির নাম কোনোদিন আমার কাছে উচ্চারণ করবে না।

—নাম জানলে তো উচ্চারণ করব। সে যাই হোক, যে লোকটির সঙ্গে তোমার এত অন্তরঙ্গতা হঠাৎ তার প্রতি এত বিরূপ কেন?

সেলিনা আঙুলে আঁচল জড়াতে লাগল। জানালার বাইরে পথ দেখা যায়, সেলিনা সেদিকেই তাকিয়ে ছিল। এক সময় সে বললো : খিদিরপুরের ঘটনার জন্য তুমি আমাকেই দায়ী করেছ—তাই না?

—তুমি কি অন্য কাউকে দায়ী করতে চাও?

তারপর কঠিন হয়ে বললাম : দুশ্চরিত্রতা অত্যন্ত নিন্দনীয় সন্দেহ নেই। তবু মানুষের শরীর যখন ভুল করে বা পাপ করে তাও সহ্য হয়। সহ্য হয় না মনের ভীরুতা, মনের শঠতা। সহ্য হয় না কোদালকে কোদাল বলে ডাকতে তুমি যখন ভয় পাও। তোমার অধঃপতনকে কোনো প্রকার সাফাইয়ের পোশাক পরাতে চেষ্টা করো না। করলে তোমার চরিত্র আরো বিকৃত হবে।

সেলিনা আমার দিকে এগিয়ে এলো। পর্দার বাইরে কাছাকাছি কেউ আছে কিনা তাও দেখে নিল। তারপর আমার পাশের চেয়ারে বসে আমার মুখের ওপর সাপের মতো নিশ্বাস ফেলতে শুরু করল। তার চোখে মরুভূমির শুষ্কতা, মরুভূমির পিপাসা। সে আমার মাথা তার দুই হাতের মধ্যে টেনে আনল।

খানিক বাদে স্থির হয়ে দু'জন দু'দিকে যেমন বসেছিলাম, তেমনি বসে পড়লাম।

সেলিনা বললো : এখনকার এই ঘটনার জন্য আমি দায়ী। খিদিরপুরের ঘটনার জন্য দায়ী ছিল সে।

—কার কোথায় দায়িত্ব, এ কি তারই একটা মহড়া হয়ে গেল না কি।

—মনে কর তাই।

তুমি এক আশ্চর্য জীব।

—কি বললে?

আমি সে কথার আর কোনো জবাব দিলাম না। সে-ই আবার বললো : ওঠ এবার চলি। ফারপোতে গিয়ে আইস-ক্রিম খাব, কফি হাউসে কফি।

আমি সেলিনাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করলাম।

আইস-ক্রিম আর কফির পালা শেষ হলে আমরা লেকে এলাম। দু'বোতল বিয়ারের পর আমার মাথা ঝিমঝিম করছিল, আর বাঘের মতো ঘুম পাচ্ছিল। কফি খাবার পরও ঘুম-ভাব গেল না। লেকে সবুজ ঘাসের ওপর আমি শুয়ে পড়লাম। মাথার ওপর আর চারপাশে গাছপালা আমাদের আড়াল করে রাখল। সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘুমে অচেতন। যখন ঘুম ভাঙল তখন চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। সেলিনার কোলের ওপর আমার মাথা। বেশ লাগছিল। ঠোঁটের ওপর সেলিনার হাত টেনে আনলাম। হাতের ওপর একটা চুমুও দিলাম—যেভাবে খোকার কপালে মা চুমু দেয়। কেমন করে যে মনে হলো, সেলিনার অপরাধ যতই হোক, তাকে একা ছেড়ে দিতে পারি না। তার দায়িত্ব কিছুটা আমারও। তার আঙুলে হাত বুলাতে বুলাতে প্রশ্ন করলাম : সেদিন রাত্রে খিদিরপুরে কি হয়েছিল?

সেলিনা একটু নীরব থেকে তারপর জবাব দিল : তুমি বড় বেশি কল্পনা করছ। ইতরটা শক্ত করে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। তাইতেই আমি নিঃস্বের মতো উদ্‌ভ্রান্ত বোধ করছিলাম। ভুলে যেও না, আমি মুসলমানের মেয়ে, আমার অধঃপতনের একটা সীমা আছে।

আমি একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেলিনার দিকে তাকালাম। সেলিনা তার দৃষ্টি নত করে নিল।

সাতাশ

পরীক্ষা এসে পড়ল বলে। এ সময়টা একটু পড়াশোনা না করলে অলৌকিক প্রভাবেও পাশ করতে পারব না। তাই বই-পত্রগুলো এইবার একটু নাড়াচাড়া করতে লাগলাম, ক্লাসেও নিয়মিত হাজিরা দিতে শুরু করলাম। আমাদের ক্লাসেই ছাত্রের সংখ্যা এত বেশি যে ভালো করে পড়া শোনাই যেত না। স্কুলের বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র শেখরই কলেজে আমার সহপাঠী। সে ছাত্র ভালো—তার পড়াশোনা করবার কথা আরো বেশি। অথচ বেশ কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি, পড়াশোনায় তার মন তো নেই-ই, সে অত্যন্ত অন্যমনস্ক হয়ে ঘুরে বেড়ায়। বস্তুত কোনো জিনিসেই তার মন নেই। কলেজে আসে-যায়, কিন্তু কি যে পড়ানো হচ্ছে, কবে যে

পরীক্ষা এ সমস্ত বিষয়ে তার হুঁশ আছে বলেই মনে হয় না। তার মাথার চুল একটু একটু করে বড় হয়ে একেবারে ঝাঁকড়া হয়ে গেছে। মুখও মলিন; সবসময়ই কেমন নিরুৎসাহ ক্লান্ত।

একদিন তাকে জিগ্যেস করলাম—

—কিরে তোর হয়েছে কি বলত?

—কেন? —কিছুই না।

—কিছু না বললেই আমি শুনলাম আর কি। তোকে বলতেই হবে কি হয়েছে।

অনেক পীড়াপীড়ি করবার পর শেখর বললো—

—আমার বাবার চাকরি গেছে।

শেখরের বাবা কি চাকরি করতেন কোথায় থাকতেন সে-সব আমি কিছুই জানতাম না।

তাঁকে কোনোদিন আমি চোখেও দেখি নি; কিন্তু তাই বলে এই 'চাকরি চলে গেছে' কথাগুলোর অর্থ বুঝতে একটুও অসুবিধা হয় নি।

—তোদের এখন চলছে কি করে?

—চলছে আর কোথায়? একটি একটি করে মা-র যৎসামান্য গহনা যা ছিল তাও শেষ হয়েছে।

—বলিস কিরে। খাওয়া-পরা চলছে কিভাবে?

—চলছে না!

—দাঁড়া। যাচ্ছিস কোথায়?

এবার শেখরের চোখে চোখ রেখে আবার প্রশ্ন করি :

—একটি সত্য কথা বলবি? আজ তোর খাওয়া হয় নি, তাই না?

—না। চন্দ্রা, মা আমি কেউ খাই নি।

শেখরকে আর কিছুতেই ধরে রাখা গেল না।

আমি হতবুদ্ধি হয়ে বসে থাকলাম। বস্তুত আমাদের নিজের অবস্থা যে এর চাইতে বিশেষ কিছু ভালো তা নয়। তবু বাড়িতে এখনও হাঁড়ি চড়ে। আব্বার চাকরিও বজায় আছে। বন্ধুর জন্য কষ্ট হচ্ছিল খুব। কিন্তু আমি কতটুকুই করতে পারি, কিইবা করতে পারি। বারবার চন্দ্রার মুখ মনে পড়ছিল। সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখটির ওপর অনাহারের মালিন্য কল্পনা করে যারপরনাই ক্লেশ বোধ করছিলাম। তার সেই চওড়া লাল পেড়ে শাড়িটা কেমন করে যেন আগুনের মতো চোখের সামনে ভাসছিল। চন্দ্রার সঙ্গে সামান্য পরিচয়; কিন্তু স্থির জানতাম, এ মেয়েটি মুখ ফুটে কিছুই চাইবে না। এমনি করে ধীরে ধীরে শুকিয়ে মরবে, তবু চাইবে না কিছু। হয়তো জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তার চোখের কোণের উজ্জ্বল হাসিটুকু তেমনি অপরিম্লান থাকবে।

চন্দ্রা বলেছিল সে তার বিপদের দিনে আমাকে ডাকবে। কিন্তু সে এখনো আমাকে ডাকে নি। ডাকলেই-বা আমি কি করতে পারি। একটি ক্লাস শেষ হলো, ঘণ্টা পড়ল। বাড়ি ফিরে এলাম। মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল।

পরদিন কলেজে এসে দেখি শেখর তার নির্দিষ্ট জায়গাটিতে বসে আছে। তার মাথার চুল বেশ পরিপাটি করে সিঁথি করা। এমনকি গায়েও নতুন জামা-কাপড়। যা সবচাইতে আশ্চর্যের কথা, তার মুখে হাসি।

আমিও একটু হেসেই বললাম :

—কি হে শেখর কুমার। তোমাকে যে আজ চিনতেই পারছি না। ব্যাপারস্যাপার কি?

—তামাসা রাখ। কাল বাবা ফিরে এসেছেন।

—ফিরে এসেছেন। এতদিন ছিলেন না বুঝি?

—না। চাকরি যাবার পর যে ক'টা দিন হাতে টাকা-কড়ি ছিল, তিনি বাসাতেই থাকতেন। যেদিন মা-র হাত খালি হয়ে গেল, বাবাও নিরুদ্দেশ হলেন। কাল ফিরে এসেছেন। সলিল ধরে নিয়ে এসেছে।

—সলিল! সে আবার কোথা থেকে এলো।

—বাঃ সে-ই তো বাবাকে ধরে নিয়ে এলো। ছেলেটি সত্যিই দেবতুল্য। আমাদের জন্য অনেক করেছে।

আমি শেখরের উচ্ছ্বাসে বাধা দিলাম না। জানি সে নিজেই বলে যাবে।

শেখর বলে গেল :

—গতকাল সলিল কোথা থেকে এসে উপস্থিত। সঙ্গে বাবা। তারপর বাড়িঘরদোরের অবস্থা দেখে সলিল একেবারে ক্ষেপে গেল। রান্নাঘরটি পর্যন্ত তন্নতন্ন করে দেখে এলো। তারপর হঠাৎ উধাও। ঘণ্টাখানেক বাদে একটা ট্রাকে করে দু'মন চাল, চিনি, ময়দা, ডাল, কয়লা আরো টুকিটাকি কত জিনিস যে নিয়ে এলো। মা, চন্দ্রা আর আমার জন্য পরনের কাপড়টা পর্যন্ত ভুলে যায় নি। তাছাড়া বিছানার চাদর-গেলাফ কত কি। যাবার আগে মা-র হাতে একশ' টাকার একটা নোট গুঁজে দিয়ে বলে গেল : আপনাদের ভার আমার। আমি মাঝে মাঝে আসব, খোঁজ-খবর নেব। যখন যা দরকার চাইতে লজ্জা করবেন না।

তাছাড়া বাবার জন্য সে একটা চাকরিও ঠিক করে দেবে বলেছে। বলে কি না, যুদ্ধের বাজারে চাকরির অভাব!

দু'তিনদিন পর শেখরের মুখ আরও উজ্জ্বল দেখলাম। পাশে বসতেই আমার হাত ধরে বললো :

—এতদিনে ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। বাবার একটা চাকরি হয়েছে। তিনশ' টাকা মাইনে। সলিলদেরই ফার্মের কাজ। তবে বাবাকে সবসময়ই বেহালায় থাকতে হবে! সলিল এমনিতে খুব ভালো; কিন্তু কাজের বেলায় বড্ড কড়া লোক। বাবাকে কাজের কথা জানিয়ে বললো : কাকাবাবু কাজ তো হলো। কিন্তু কলকাতা থেকে যাতায়াত করলে তদারক করতে পারবেন না। আপনাকে বেহালাতেই থাকতে হবে। আপনি বরঞ্চ শনিবার রোববার বাড়ি আসবেন। এ কথাটা আপনাকে বলতেই হলো : ওয়ার্ক ইজ্ ওয়ার্ক!

বাবা শুনে বললেন :

এই তো চাই বাবা। এই রকম কর্তব্যনিষ্ঠা সকলের থাকে না বলেই বাঙালিরা ব্যবসা করতে শিখল না। বেশ তাই হবে, আমি বেহালাতেই থাকব। শেখরের সব কথা আমার কানে যাচ্ছিল না। মোটের ওপর তাদের অবস্থা ফিরেছে এইটুকু অবশ্য বুঝলাম। আমার ডান কানটা কদিন ধরেই ব্যথায় টনটন করছিল, হয়তো পেকেই গেছে। তাই একটু অন্যমনস্ক হয়েই জিগ্যেস করলাম :

—চন্দ্রা কেমন আছে?

—চন্দ্রা ভালোই আছে! একজোড়া নতুন শাড়ি পেয়ে তার আনন্দ আর ধরে না। সে এখন সারাদিন ধরে সলিলের জন্য উলের সোয়েটার বোনে। সেদিন সলিল এক পাউন্ড উল নিয়ে এসে উপস্থিত। মা-কে গিয়ে বললো : মাসিমা, আবার বড় সাধ হয় চন্দ্রা আমার জন্য একটা সোয়েটার বুনে দিক। মা বললেন : বেশ তো বাবা। সে আর অমন বড কথা কি!

সেদিন থেকেই চন্দ্রা দিন নেই রাত নেই কেবল সোয়েটার বুনছে।

আমার কানের ব্যথাটা বড়ই অসহ্য ঠেকছিল। আমি শেখরকে বাধা দিয়ে বললাম :

—আমার শরীরটা ভালো নেইরে। এই পিরিয়ডটা শেষ হলেই বাড়ি যাব।

ক'দিন কানের ব্যথায় খুব ভুগলাম। কিছুদিন কামাই করবার পর যেদিন কলেজে এলাম, সেদিন আবার যথাস্থানে শেখরকে বসে থাকতে দেখলাম। আজ আবার শেখরকে কিছুটা চিন্তিত মনে হচ্ছিল। সে বললো :

—ক'দিন আসিস নি কেন? কানের ব্যথা বেড়েছিল।

—হ্যাঁ। তোরা সব ভালো?

—না ভাই। পরশু রাতে একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে গেছে। আমাদের বাসার পাশেই এক ভদ্রলোক থাকেন, ইছাপুরে কাজ করেন... ভালো কথা। তুই তো তাঁকে চিনিস। আমি কালীবাবুর কথা বলছি। পরশু রাতে কি হয়েছে জানিস। রাত তখন এগারোটা হবে বোধ করি। মা বাড়ি ছিলেন একেবারে একা। বাবা বেহালায় থাকেন, সেতো তুই জানিস। কালীবাবু করেছেন কি, রাত এগারোটায় মদ খেয়ে এসে মা'র ঘরের দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিতে শুরু করে দিলেন। ভাগ্যিস, মা ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। সে কি ধাক্কা। দরজার অবস্থাটা একবার দেখলে তুইও অনুমান করতে পারবি। মনে হয় বাঘ যেন তার থাবা দিয়ে আঁচড় কেটেছে। চেঁচামেচিতে পাড়াসুদ্ধ লোক উঠে এলো। আর তুই শুনে অবাক হবি কালীবাবুকে কেউ বিশেষ কিছু বলল না। পাড়ার সব লোকই তার কাছে কোনো না কোনোভাবে ঋণী; এমন ছোটলোকদের পাড়া...। আমরা ভাবছি অন্য কোথাও উঠে যাব।

আমি সেসব কথার কোনো জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করলাম—

—তোর মা একা কেন। তুই আর চন্দ্রা ছিলি কোথায়?

—আমরা সলিলের সঙ্গে ন'টার শো-এ 'চিত্রায়' সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। কিছুতেই ছাড়ল না।

—ওঃ তাই বল।

—ভারি বিশ্রী ব্যাপারটা ঘটে গেল তাই না?

—হ্যাঁ তাতো বটেই। তোরা কেন বেহালায় তোর বাবার কাছে গিয়ে থাকিস্ না।

—হ্যাঁ তাই থাকব। কিন্তু বাড়ি পাওয়া যায় না। তাছাড়া বাবা প্রায়ই থাকেন না ; তাঁকে মফস্বলে ঘুরে বেড়াতে হয় কি না।

—চন্দ্রার সোয়েটার বোনা হলো?

—হ্যাঁ প্রায় শেষ করে এনেছে। এটা হয়ে গেলেই তোর জন্য একটা ধরবে। সেদিন বলছিল।

—আমি গরিব মানুষ। এক পাউন্ড উল পাব কোথা থেকে।

—দূর বোকা তোকে দিতে হবে না। চন্দ্রার হাতে অনেক টাকা।

—চন্দ্রার হাতে অনেক টাকা! সে টাকা পেল কোথায়?

—আর বলিস নে! ঐ সলিলটাই জবরদস্তি দিয়ে যায়। মার হাতেও জোর করে যখন-তখন টাকা গুঁজে দিয়ে যায়। বলে কি না, চন্দ্রা আমার খাজাঞ্চি!

—সে তো সলিলের গচ্ছিত টাকা। সে টাকা দিয়ে আমার জন্য উল কিনবে কি করে?

—সব কেন সলিলের টাকা হতে যাবে। চন্দ্রার টাকাও আছে।

অনেকক্ষণ দুইজনেই চুপচাপ বসে থাকি। বিপদের দিনে শেখররা সত্যকার দরদী বন্ধু পেয়েছে, এটা সৌভাগ্যের কথা। শেখরের প্রতিটি কথায় কৃতজ্ঞতার পরিচয় তো থাকবেই। না থাকলেই

বরং অত্যন্ত অন্যায় হতো। এক সময় জিগ্যেস করলাম—

চন্দ্রা সারাদিন কি করে?

—তুই চন্দ্রাকে খুব ভালোবাসিস্। তাই না? চন্দ্রাও যে তোকে কি চোখেই দেখেছে। সারাটা দিন কেবল তোর কথা। তোকে নিয়ে সলিলের সঙ্গে যে তার কতবার কথা কাটাকাটি হয়েছে— এমনকি রাগারাগি পর্যন্ত হয়েছে। সলিল কতদিন রাগ করে চলে গেছে।

আমি একটু হেসেই জবাব দিলাম—

—ছেলে মানুষ কি না।

—ঠিক বলেছিস। তাই কথার মাত্রা রাখতে পারে না।

হঠাৎ একটা কথা মনে হতে জিগ্যেস করলাম :

—সলিলের সঙ্গে চন্দ্রার বিয়ে হলে কিন্তু বেশ হয়, তাই না!

শেখর গম্ভীর হয়ে গেল। বললো :

বিয়ের কথা থাক। চন্দ্রার কতই-বা বয়স। এখুনি বিয়ে কিসের। তাছাড়া সলিলরা বামুন আর আমরা... শেখর কথা শেষ করল না।

বস্তুত হিন্দুদের জাতিপ্রথা সম্পর্কে আমার অজ্ঞতা অপরিসীম। তাছাড়া শেখরের হাবভাব দেখে মনে হলো চন্দ্রার বিবাহ প্রসঙ্গটা তার তেমন মনঃপূত নয়। তাই কথাটা শেষ করে দেয়ার জন্য বললাম —

—না এমনিই বলেছিলাম। কথাটা হঠাৎ মনে পড়ল তাই।

—তা বুঝেছি। কিন্তু এই দুনিয়ায় কি সবই হয়। এই মনে কর, তোর সঙ্গেই কি চন্দ্রার বিয়ে হতে পারে।

—কি যে বলিস তার কোনো ঠিক নেই। তা কি করে হয়। বাঃ তা কি করে হয়...এ প্রশ্নই উঠতে পারে না।

—আমিও তো তাই বলি। তা কি করে হয়।

এই বলে শেখর হনহন করে চলে গেল।

যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়, আমি সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকলাম।

সেদিন কলেজের ছুটির পর ভারি ইচ্ছে করতে লাগল, একবার গিয়ে চন্দ্রাকে দেখে আসি। কিন্তু সলিলের ঐশ্বর্যের পাশে আমাকে কেমন ম্লান দেখাবে, সেই কথা মনে করে আর গেলাম না।

বেশ ক'দিন কেটে গেছে। একদিন শেখর কলেজে আসে নি। তার কোনো অসুখ হলো কি না, অথবা বাড়িতেই কোনো বিপদ-আপদ হলো কি না এইসব কথা ভেবে বেশ চিন্তিতই ছিলাম। একবার এনটালিতে গিয়ে খোঁজ করব কি না সে কথাও ভেবে দেখেছি। কিন্তু সলিলের সঙ্গে তুলনায় আমি হেরে যাব, এই কথা মনে করে কিছুতেই সেদিকে পা উঠছিল না।

অথচ সেদিন কলেজের পর এই সলিলের সঙ্গেই দেখা হয়ে গেল। সলিল বেশ গম্ভীর, যা তার স্বভাববিরুদ্ধ। আমার হাত ধরে টেনে একটা রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেল। সে যে ওয়েটারকে ডেকে কি আনতে বললো তা পর্যন্ত কানে গেল না।

একবার শুধু বললো :

—হ্যারিসন রোডের এই 'মর্নিং বেল' রেস্টুরেন্টে মাটন কারিটা কিন্তু বেড় করে।

তারপর আবার গম্ভীর হয়ে গেল। বললো :

—শেখরের বাবার খবর শুনেছিস?

আমি কিছুই শুনি নি। অজ্ঞাত আশঙ্কায় মুখ শুকিয়ে গেল। মুখ দিয়ে সবচাইতে অশুভ কথাটাই সবচাইতে আগে বেরিয়ে এলো। জিগ্যেস করলাম :

—মারা গেছেন?

আমার কথা শুনে সলিল হো-হো করে হেসে উঠল। তার হাসি কিছুতেই থামতে চায় না। আমার আশঙ্কা দূর হলো। আর যাই হোক, শেখরের বাবা মরেন নি। মরলে সলিল ওভাবে হাসতে পারত না।

—না। ব্যাটা মরে নি। সে অত সহজে মরবার পাত্র নয়।

আমি চুপ করে বসে থাকলাম। না হয় সলিল চাকরি দিয়ে ভদ্রলোকের উপকারই করেছে। তাই বলে তাঁর সম্পর্কে এই অসৌজন্যমূলক সম্ভাষণ ভালো লাগল না।

সলিল আবার বললো —

—মাসে তিনশ' করে মাইনে পায়, কিন্তু বাড়িতে এক পয়সাও দেবে না। বাড়িতে একবার আসেও না। সারারাত মদ খেয়ে পড়ে থাকবে। ব্যাটাকে দিতাম তাড়িয়ে। কিন্তু কাজটা ভালো করে। মাথা আছে। সেদিন গভীর রাত্রে বেহালার একটা মেয়েমানুষ নিয়ে এসে সে কি বেলেল্লাপনা, আমরা পর্যন্ত হার মেনে যাই। তবে হ্যাঁ, মানতেই হবে। লোকটার রুচি আছে। মাগী ম্যাথরানী বটে; কিন্তু শরীর কি! একেবারে পেটা লোহার মতো

—তুই কার সম্বন্ধে কি বলছিস।

সলিল আবার হো-হো করে হেসে উঠল।

—কার সম্বন্ধে আবার। আমাদের পরম পূজনীয় শেখর-জনক সম্বন্ধেই বলছি। লোকটা এমন ইতর তা জানতাম না।

বিস্ময়ে আমার মুখ দিয়ে আর কথা সরে না। কেবল যে শেখরের বাবা বলেই অবাক হয়েছি তাই নয়, অবাক হওয়ার আরও কারণ ছিল। আমি শেখরের মা-কে দেখেছি।

তাঁর মতো সুন্দরী স্ত্রীলোক খুব কমই চোখে পড়ে। আর শেখরের বাবা কি না...

সলিলও সেই কথাই বললো। কিন্তু একটু অন্যভাবে বললো।

—আরে বাবা. যার বাড়িতে এমন লক্কা পায়রার মতো স্ত্রী, সে কেন অন্যদিকে নজর দেয়।

—সলিল তুই এত ইতর হয়ে গেছিস। যা মুখে আসে তাই বলিস।

—আরে থো তোর নীতি কথা। ঢের ঢের দেখা আছে। বাপ তো এই, ইদিকে মেয়ের সতিপনা দেখে বাঁচি না। সেদিন কলতলা থেকে গা ধুয়ে এসেছে। ভিজে কাপড়েই ঘরে ঢুকছিল। বুক তো নয়, সমুদ্রের ঢেউ যেন। সে যাই হোক, চন্দ্রা সেই যে আমার চোখের সুমুখ দিয়ে চলে গেল, আর সামনেই এলো না মাইরি। আমিও সলিল চাটুয্যে, দেখে নেব।

রাগে আমার শরীর কাঁপছিল। কিন্তু অসহায় ক্রোধে নিরুপায় হয়ে বসে থাকলাম। একবার ভাবলাম উঠে চলে যাই। কিন্তু কে যেন শিকল দিয়ে আমার হাত-পা বেঁধে রেখে দিয়েছে, কিছুতেই নড়তে পারলাম না। সলিল বলেই চললো।

—বেহালায় সেদিন রাত্রে শেখরের বাবা বলে কি জানিস। তোমাকে আর লজ্জা কি সলিল। ও দুটো জিনিস না হলেই নয়। আমিও বললাম : কাকাবাবু কারুর ব্যক্তিস্বাধীনতায় আমি হস্তক্ষেপ করবার পক্ষপাতী নই। এবার উঠি। দুপুরে মদের মাত্রাটা একটু বেশিই হয়ে গেছে। তবে একটা কথা ঠিক জানবি। শু বুড়ো শালা কিছুতেই বাড়ি ফিরবে না আর। আমিও আর কাঁহাতক ওদের দেখব। মরুক, সংসারসুদ্ধ সবাই শুকিয়ে মরুক। আমার কি!

এরই কিছুদিন পর খবর পেলাম শেখরের বাবা অফিসের ক্যাশ বাক্স ভেঙে পালিয়েছেন। সলিলও প্রতিজ্ঞা করেছে নেমকহারামটাকে জেলে না দিয়ে সে অন্য কাজে হাত দেবে না। চাকা বড় দ্রুত ঘুরতে লাগল।

কিছুদিন পরপর শেখর কলেজে আসে। আবার সেই আগেকার মতোই চিন্তিত মলিন শুষ্ক মুখে চুপচাপ বসে থাকে।

—তোর বাবার কোনো খোঁজখবর পেলি?

শেখর একটু বিরক্ত হয়ে আমার দিকে তাকালো। বললো :

—বারবার একই কথা জিগ্যেস করিস কেন? এলে খবর পাবি।

আজকাল প্রায়ই এইভাবে শেখরের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। হবারই কথা। তাদের ওপর দিয়ে যা যাচ্ছে, তা মাথা ঠাণ্ডা করে না। তাই তার কথায় আমি কিছু মনে করি না। তবু তাদের পরিবার সম্বন্ধে কৌতূহল কিছুতেই দমন করতে পারি না। ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করি :

—তোদের চলছে কিভাবে, ভাই?

—সলিলই চালাচ্ছে কোনোমতে। আর একট কথাও না। পড়া শোন! এইভাবে আরো দু'মাস কেটে গেল। এর মধ্যে একবারও শেখরদের বাড়ি যাই নি।

সেদিন রাত্রের কথা পরিষ্কার মনে আছে। যাকে বলে পুলকিত জ্যোৎস্না, মানুষের মাথা দালান-কোঠা, গাছপালা, সবকিছুর ওপর তারই বন্যা নেবে এসেছে। যুদ্ধের বাজার, তাই রাস্তার আলোগুলো 'লাইটিং রেশট্রিকশন' অনুসারে অর্ধ অবগুণ্ঠিত করা হয়েছে। তাই পূর্ণ চন্দ্রের সম্পূর্ণ রূপটাই আজ এভাবে চোখে ধরা পড়ল। পথে লোকজন চলাফেরা করছে, গাড়ি-ঘোড়াও নেহাৎ কম নয়, গাছপালাগুলোও কেমন যেন সলজ্জ সঙ্কোচে এক পাশে সরে দাঁড়িয়েছে। এসব কিছুই আমার চোখে স্বপ্নে দেখা দৃশ্যগুলোর মতোই অপার্থিব মনে হচ্ছিল। পৃথিবীতে যে এত শান্তি থাকতে পারে তা কল্পনাতীত। চতুর্দিকে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজ করছে কিন্তু তাও যেন কেমন অবাস্তব মনে হচ্ছিল।

হঠাৎ কি মনে হলো, শেখরদের বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়ে গেলাম। এ পথে কতদিন আসি নি, অথচ পথঘাট এতই চেনা যে মনে হচ্ছিল যেন প্রত্যহই এই পথে আনাগোনা করেছি। শেখরদের বাড়ির লাউগাছের তলায় গিয়ে দাঁড়ালেই চন্দ্রা এখুনি দোরগোড়ায় স্থির হয়ে অভিমানভরা দুটি চোখ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে। মনে মনে চন্দ্রার সঙ্গে এই ধরনের একটা সংলাপের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম।

—এতদিন আস নি যে।

আমি একটু হেসেই জবাব দিলাম।

—বাঃ, তুমি না আসতে বারণ করে দিয়েছিলে।

—বারণ করলেই তা শুনতে হবে বুঝি! মুখের একটা বারণ, সেটাই বড় হলো!

—বড় যে কি তা কি করে জানব বলো। আমি এসে গৃহবিবাদ লাগাতে চাই নি বলেই আসি নি।

—বেশ তো, গৃহবিবাদের যদি এতই আশঙ্কা তাহলে আজই-বা কি মনে করে এলে শুনি?

—আজ আমি ইচ্ছে করে আসি নি। কে যেন জোর করে আমাকে টেনে নিয়ে এসেছে। বোধ হয় ভূত।

—হ্যাঁ আমিই সেই ভূত। আমিই জোর করে তোমাকে টেনে নিয়ে এসেছি।

এই বলে চন্দ্রা হাসি গোপন করবে। তারপর একটু এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে বলবে :

ইস্। কি রোগাটাই হয়েছ। শরীরের একটু যত্নও বুঝি করতে নেই।

—যত্ন করব পরে। এখন আমার একটি বড় কাজ বাকি আছে।

—কি তোমার বড় কাজ একবার শুনি।

—তোমার জন্য বর দেখা।

—আমার বর!—সহাস্য কৌতুকে চন্দ্রা আমারই কথার প্রতিধ্বনি করবে। পর মুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে দড়াম করে আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে ভিতরে চলে যাবে। কখন যে সেই লাউগাছের তলাতেই এসে দাঁড়িয়েছি খেয়ালও করি নি। চারদিক কেবল আলো আর আলো—জ্যোৎস্নার আলো। শুধু শোবার ঘরটার এক কোণে একটা হারিকেন জ্বলছে। দোরগোড়ায় একটা চকচকে পেটেন্ট লেদারের পাম্প সু। দেখেই চিনলাম, এটি সলিলের। ভীত চকিত দৃষ্টি অত্যন্ত ধীরে ধীরে ঘোরতর অনিচ্ছায় শোবার ঘরে পৌঁছল। খাটের ওপর চন্দ্রা শায়িত। একটি হাত দিয়ে সে দুই চোখ ঢেকে পড়ে আছে। অন্য হাতটি সলিলের হাতে। সলিলের অপর হাতে একটি গেলাস। বোধ করি তার মধ্যে হুইস্কি।

এইবার রান্নাঘর চোখে পড়ল। শেখরের মা চা তৈরি করছেন। সামনে তিনটি পেয়ালা রাখা আছে। এক মুহূর্ত দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে কি ভাবলেন। আবার চা তৈরি করতে লাগলেন।

লাউগাছের তলায় দাঁড়িয়ে আমার হাঁটু ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। তবু কোনোমতে যেমন নিঃশব্দে এসেছিলাম, তেমনি নীরবেই বিদায় নিলাম।

দু'দিন কেবল সেই দৃশ্যটাই চোখের সামনে ভাসতে লাগল। কেমন করে বারবার মনে হচ্ছিল, এ দুটি চোখ যা দেখেছে তা ভুল, আমি যা কিছু বুঝেছি তাও ভুল। সবকিছুরই একটা সন্তোষজনক কৈফিয়ত আছে—চন্দ্রার সঙ্গে একবার কথা হলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। আরো একটা কথা বারবার মনে পড়তে লাগল। চন্দ্রা বলেছিল, আমার বিপদের দিনে ডাকলে আসবে তো? তার সেই বিপদের দিন তো সত্যিই এলো। এমনভাবে এমন দিক দিয়ে এলো যা আমাদের উভয়েরই অতি বড় দুঃস্বপ্নেরও অগোচর ছিল। কিন্তু কৈ, চন্দ্রা তো আমাকে একবারও ডাকল না। তাহলে কি চন্দ্রা স্বেচ্ছায় এই জীবনই বেছে নিয়েছে? এই জীবনই তার মনোনীত আর মনঃপূত? চন্দ্রার? অসম্ভব।

এর সবটাই একটা দুঃস্বপ্ন। চন্দ্রার সাথে একবার দেখা হওয়া দরকার। সবকিছুরই একটা শোভন ব্যাখ্যা আছে নিশ্চয়ই। সেই ব্যাখ্যাটা কি চন্দ্রার সাথে দেখা না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই জানতে পারব না। আর না জানা অবধি এতটুকু শান্তি নেই। চোখ যে পুড়ে গেল। বুক যে জ্বলে গেল। সবরকম বিশ্বাসের বুনিয়াদই যে ধসে গেল।

আজও জ্যোৎস্নার আলো আছে। আজও চারপাশ নিজঝুম। আজও শোবার ঘরে হারিকেন জ্বলছে। আজও দোরগোড়ায় পাম্প-সু রাখা আছে। তবে পেটেন্ট লেদারের নয়। আধ ময়লা আধ ছেঁড়া মোটা চামড়ার পাম্প-সু।

আজও লাউগাছের তলায় দাঁড়িয়ে দৃষ্টি দোর অতিক্রম করে শোবার ঘরের খাট পর্যন্ত অগ্রসর হলো। আর দেখল—

চন্দ্রার মা খাটে শুয়ে আছেন। তাঁরও একহাত দিয়ে দুই চোখ ঢাকা। কালীবাবুর কোলে তাঁর মাথা। শেখরের শিশু-ভ্রাতা এক কোণে একটা ছোট্ট খাটে শুয়ে আছে।

কখন যে আপনা থেকেই চোখ দুটো রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে এসেছে জানি না। সেখানে চন্দ্রা হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে আছে। সামনে চায়ের পেয়ালা—দুধ-চিনি। কিন্তু সে যেন

শান্ত সাগরের মতো স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। অতল চিন্তার ভারে তার মাথা নত! উনুনের পাশে একটা পিদিম জ্বলছে, উনুনের ওপর হাঁড়ি। চন্দ্রার পরনে সেই লাল পেড়ে শাড়ি। সন্ধ্যাকাশে একটিমাত্র নক্ষত্রের মতো নিঃসঙ্গ একাকীত্বে বসে আছে—এক বিন্দু অশ্রুর মতো।

ভেবেছিলাম আজও নিঃশব্দে বেরিয়ে যাব। কিন্তু সেই মুহূর্তেই চন্দ্রা চোখ তুলে তাকালো। এ কি চন্দ্রার চোখ? দু'চোখ ছাপিয়ে কি দুঃসহ ক্লান্তি। চোখাচোখি হতেই সাগরের বুকে যেন এক খণ্ড ক্ষুদ্র প্রস্তর পড়ল। নিমেষের জন্য চন্দ্রার সর্বশরীর একবার কেঁপে উঠল; কিন্তু নিমেষের জন্যই। তারপর তার অচেতন দেহ সেখানেই লুটিয়ে পড়ল। আমিও বেরিয়ে চলে এলাম।

আটাশ

আই.এ পরীক্ষাও পাস করলাম। শেখরের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ কথাবার্তা হয় খুবই কম। সেও আমাকে এড়িয়ে চলে। আমিও উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে যাই না। কিন্তু চরম অশান্ত সংসারে বাস করেও সে অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো। বস্তুত আমাদের স্কুলের দলটি বিভিন্ন কলেজ থেকে ভালো-মন্দ যেভাবে হোক সকলেই পাস করলাম। কিছুদিন পর সেলিনা-অনিমাদের পরীক্ষার ফলও বের হলো, তারাও সসম্মানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো।

বি.এ পড়বার জন্য আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলাম। সেলিনাও এম.এ কোর্সের জন্য বীটন কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটিতে এলো। কলেজের পথে ট্রামে-বাসে প্রায়ই সেলিনার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। অনেক সময় পাশাপাশি বসবারও সুযোগ হয়ে যায়। সেলিনার চূর্ণ কুন্তল আমাকে স্পর্শ করে।

খোদার দুনিয়ার এতদিকে এত রকম কাম্য বস্তু থাকা সত্ত্বেও, এই স্পর্শটুকু লাভ করবার সুখ আর আনন্দের মধ্যেই যেন আমি বাঁচবার সার্থকতা খুঁজে পেতাম। আমাদের উভয়ের সম্পর্ক অল্প কিছুদিনের ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে অতি সত্বর অতি নিবিড় হয়ে আসছিল। মাঝে উভয়েরই পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য বেশ কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। কেবল পরীক্ষার দুশ্চিন্তা আর কেবল পড়া। পরীক্ষার পর আবার যখন মুখোমুখি হলাম তখন দেখলাম, যত দ্রুত কাছে এসেছিলাম ঠিক ততটাই দ্রুতভাবে আমরা আবার বহু দূরে সরে গেছি। সেলিনাকে আবারও সেই আগেকার আত্মস্থ গম্ভীররূপে যেন অতি দূর ব্যবধান থেকে দেখলাম। আশ্চর্য এই পরীক্ষার মাঝখানকার দিনগুলো। দু'জনের মাঝখানে যেন বিরাট সমুদ্রের ব্যবধান সৃষ্টি করেছে।

অথচ এই কিছুদিন আগেও কতই না কাছাকাছি ছিলাম। সেলিনা ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে প্রসাধন করত। তার কণ্ঠে গুঞ্জরিত হতে থাকত কোনো একটি প্রিয় গানের কলি। স্খলিত আঁচলটি কোলের ওপর পড়ে থাকত। প্রসাধনের এই সময়টা আমি মনে মনে চিহ্নিত করে রেখেছিলাম। বেছে বেছে এই সময়টিতেই আমি সেলিনার কক্ষে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে প্রবেশ করতাম। এই কক্ষটিতে আমি যেন আরব্য উপন্যাসের পরিবেশ দেখতে পেতাম। তা কেবল এই কারণে নয় যে সেলিনাও অপরূপ সুন্দরী। তার এই কামরাটিতে এই সময়টায় অপরাহ্নের রাগে ঝিলিমিলি রোদ আর ছায়া পশ্চিম দিকের জানালা দিয়ে লুটিয়ে পড়ত। মাথার তেল,

দুর্লভ সেন্ট এবং সেলিনার শরীরের এক মিশ্র মদির গন্ধও এক অপার্থিব আবহাওয়া সৃষ্টি করত। প্রথম প্রথম চুপে চুপে ভয়ে ভয়ে, পরে অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত নির্ভয় পদক্ষেপে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়াতাম। আমার দুটি হাত দিয়ে তার দুটি চোখ টিপে ধরতাম। আয়নায় সে আমাকে দেখতে পেত, এবং সে যে দেখতে পেয়েছে, আমিও তো আয়নাতেই দেখতে পেতাম; তবু যেন আমার আগমন অনাবিষ্কৃতই আছে, সেইভাবে পিছনে গিয়ে দাঁড়াতাম আর চোখ টিপে ধরতাম। এই স্পর্শটুকুর প্রতিই লোভ। বাকিটা অছিলা মাত্র।

সেলিনা একটু একটু করে আমার হাত টিপে টিপে অনুভব করত, যেন চিনবার চেষ্টা করছে, যেন চিনতে কষ্ট হচ্ছে, যেন কিছুতেই চিনতে পারছে না। তারপর এক একটা করে দুনিয়ায় যত নাম আছে সব আউড়ে যেত, কেবল আমারটিই ছাড়া। আমি শুধু উঁহু উঁহু করে মুখ দিয়ে এক রকম আওয়াজ করে জানিয়ে দিতাম, সেলিনার সব কটি অনুমানই ভুল।

সেলিনা শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দেয়ার অভিনয় করত।

কেবল তখুনি আমি বলতাম : আমি।

—তু—মি!

সেলিনা যেন অবাক হয়ে গেছে, একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে।

—ওমা, তাই বলো, তুমি! আমি ভাবলাম কে বুঝি।

তারপর সে তার ঘাড় বাঁকিয়ে আমাকে একবার দেখে নিয়ে যেন তার সন্দেহ দূর করত, আমি সত্যিই আমি কি না। আবার স্থির হয়ে আগের মতোই চেয়ারে বসে থেকে, তার দুই কাঁধের দুই পাশ দিয়ে আমার দুটি হাত টেনে এনে তার মুঠির মধ্যে ধরে রাখত।

এই খেলা কত মিথ্যা, এর মধ্যে কত ছলনা, কত অভিনয় সবই আমি জানতাম। মাঝে মাঝে মনটাও বিরূপ হয়ে উঠত, এই বুনিয়াদহীন ইমারতটিকে ভেঙে ফেলে দিতে চাইত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সঙ্কল্প স্থির থাকত না। একটি স্ত্রীলোককে সেই প্রথম নারীরূপে দেখলাম, সেই প্রথম নারীরূপে তার পরিচয় লাভ করলাম। তাকে ত্যাগ করব আমার মন এতটা নির্লোভ নিষ্কাম ছিল না।

আরো একটি কারণে আমার মন গ্লানিতে ভরে যেত। সেটা হচ্ছে আমাদের বয়সের ব্যবধান। খুব বেশি না হলেও সেলিনা আমার চাইতে বয়সে বড়। তাছাড়া সে নানান দিক দিয়ে এত অভিজ্ঞ, তার বুদ্ধি এতই পরিণত, তার শরীর এতই পরিপূর্ণ, তার দৃষ্টি এতই নির্ভীক আর নিঃসঙ্কোচ যে তাকে তার বয়সের চাইতেও বড় মনে হতো। আমাদের এই সম্পর্ক কেবল যে আমার কাছে অবাস্তবই মনে হতো তাই নয়, মাঝে মাঝে অত্যন্ত অসুন্দরও মনে হতো। তাই কতবার মনে হতো, দূর ছাই, সব চুকিয়ে দি।

অথচ পরীক্ষার পর যখন দেখলাম, আপনা থেকেই সব চুকতে বসেছে, তখন কিন্তু সব হারাবার বিষণ্নতা আর ব্যর্থতায় সমস্ত মনটাই মুষড়ে গেল।

সেলিনার কামরায় আগের মতো যখন। তখন প্রবেশ করবার কথা চিন্তা করতেই পারি না। তার সঙ্গে যেন আবার নতুন করে পরিচয় হচ্ছে। তার হাবভাব মতিগতি ইচ্ছা-অনিচ্ছা সবকিছুই যেন অপরিচিত। তাই তার কক্ষে প্রবেশ করব অতটা স্বাধীনতার কথা ভাবতেও পারতাম না।

বেশ বুঝতে পারছিলাম, সেলিনাও আমার সমস্যার কথা বুঝতে পেরেছে কিন্তু সমস্যার কোনো সমাধানই তার দিক দিয়ে এলো না। বরঞ্চ সে তার আচরণের দ্বারা এই ব্যবধানটিকে সযত্নে সুরক্ষিত করে রাখল।

ট্রামে-বাসে দেখা হয়, কিন্তু কথা বড় একটা হয় না। প্রায়ই ট্রামে বসতাম পাশাপাশি, ট্রাম থেকে নাবতামও একই স্টপেজে, তবু বাক্য-বিনিময় বলতে গেলে হতোই না। চূর্ণ কুন্তলের স্পর্শ-লাভের কম্প্র-মুহূর্তগুলো ছাড়া, আমার জীবনের অবশিষ্ট সমস্ত সময়ই নিথর নিষ্প্রাণই থাকবে, এই রকম একটা অবস্থা মনে মনে মেনে নিয়েছিলাম।

বসন্ত-কেবিনে কখনো-বা আমি এক পেয়ালা চা আর এক টুকরা পুডিং দিয়ে সেলিনার আতিথেয়তা করতাম, কখনো সে আমার। কখনো সে আমার ট্রামের টিকিট করে দিত, কখনো আমি তার। সেই পর্যন্ত। হয়তো-বা কোনোদিন আমি তার দিকে দুটি প্রশ্নভরা চোখ তুলে ধরতাম; কিন্তু সে প্রশ্ন ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসত।

এই অসম প্রেম সম্বন্ধে মনে মনে একটা অপবাধবোধ ছিলই। তার ওপর আমাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টাটা সেলিনার দিক দিয়ে এতই সযত্ন-পরিকল্পিত যে আমিও মনে মনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাকে বাদ দিয়েই একটা পরিপূর্ণ জীবনের চিত্র কল্পনা করবার চেষ্টা করছিলাম—এবং ধীরে ধীরে সে চেষ্টা সার্থক হতে চলছিল।

কিন্তু তা আর হতে পারল কৈ!

ইউনিভার্সিটি-ইনস্টিটিউটে এক সাহিত্য-সভা ছিল। দুটি পিরিয়ডের পরই সেদিন আমার ছুটি। বেশ কিছুটা আগেই আমি সভাস্থলে এসে একাকী একটি আসনে বই খুলে বসে পড়লাম।

—পড়বার জন্য জায়গাটা ভালোই বেছেছ!

—ওঃ তুমি! কি মনে করে?

—ওঃ তুমি! এ ছাড়া বলবার আর কিছুই নেই না কি!

আমি সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে পাশের আসনটি দেখিয়ে বললাম :

—বোসো! আমি যে এখানে আছি তুমি জানলে কেমন করে?

—তোমার পিছু পিছু আসছি ছায়ার মতো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

—কি কথা?

—এখানে বলা যায় না।

—আবার খিদিরপুরে যাবার জন্য সঙ্গী চাও না কি?

সেলিনা কিন্তু তেমনি সপ্রতিভভাবেই উত্তর দিল :

—না। তেমন কিছু নয়। আমার বিয়ের কথা হচ্ছে।

—বিয়ে? তোমার?

—অবাক হলে যে? কেন, আমার কি বিয়ে হতে পারে না।

—সত্যই অবাক হয়েছি।

—শুধু কি অবাক? আর কিছুই নয়? একটু দুঃখিত কি ব্যথিত?

সেলিনা পরিহাস করছে কিনা ঠিক বুঝলাম না। এরপর সে যে প্রস্তাব করল তা শুনে আরো হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম।

—চলো আমরা পালিয়ে চলে যাই কোথাও।

মুহূর্তের জন্য আমারও মতিভ্রম হলো। বললাম : যাবে? সত্যি যাবে? এরপর সন্দেহ দূর হয়ে গেল। সেলিনা খিলখিল করে হেসে উঠল। পরক্ষণেই কিন্তু আবার গম্ভীর হয়ে বললো : যাব। সেই কথা বলতে এসেছি। কিন্তু এভাবে চলে গেলেই তো হলো না। ব্যবস্থা করতে হবে। তার জন্য তোমার সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন। তাছাড়া এক্ষুণি পালিয়ে যাওয়া হবে না।

খাবে কি? আমার বিয়ের জন্য গহনা তৈরি হচ্ছে। তাই নিয়ে পালাব আমরা। কিছুদিন তো চলবে। তারপর না হয় আমি 'দিল খুস-সভায়' কাজ নেব; কিন্তু সবার আগে তোমার সঙ্গে কথা হওয়া দরকার।

—কথা যদি কিছু থাকে তো এখানেই বলতে হবে। আর তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

—অপেক্ষা করতে হবে কেন?

—কলকাতায় না কি বোমা পড়বে। আমরা সকলেই তাই আব্বার কাছে মাদারীপুব চলে যাচ্ছি। কবে ফিরব কে জানে। কাল সকালেই যাচ্ছি।

—কাল সকালেই? তাহলে তো আজই তোমার সঙ্গে খোলাখুলি কথা হওয়া দরকার; কিন্তু এখন তো আর তা হতে পারে না। সন্ধ্যাবেলাও আমি ফ্রি নই। বন্ধুদের সঙ্গে ছ'টার শোতে সিনেমায় যাচ্ছি। কথা দিয়ে ফেলেছি। ফিরতে সেই রাত ন'টা। আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? রাত দশটায় তুমি আমার বাসায় এসো। সবাই হয়তো ঘুমিয়ে পড়বে; কিন্তু আমার ঘরের দরজা খোলা থাকবে। ঘর অন্ধকার দেখলে ফিরে যেও না। আমি জেগেই থাকব। তুমি সোজা ঘরের ভিতর চলে এসো।

কেউ দেখলে কি বলব?

—কি আর বলবে? সময়-অসময়ে তুমি তো কতই এসেছ।

—আমার কিন্তু ভয় করছে। ও আমি পারব না।

—পারবে না? এই সাহস নিয়ে তুমি পালাবার ফন্দি করছ? খুব তো দেখি বীরপুরুষ। এখন চলো আমাকে ভবানীপুর পৌঁছে দেবে। সাহিত্যের কচকচি শুনে কি হবে!

—চলো।

আমরা বেরিয়ে এলাম। এইভাবেই সেলিনার প্রবল ইচ্ছা-অনিচ্ছা আমাকে সমুদ্রের ঢেউয়ে মোচার খোলের মতো আছড়াতে লাগল। পথে নেবে সেলিনা বললো : চলো, আমরা একটা ফিটিন ভাড়া করি। বহু দিন ফিটিন চড়ি নি।

ফিটিন এগিয়ে চলল। কারো মুখে কোনো কথা নেই। দু'জনেই যেন নিঃশব্দ একাগ্রতায় ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনছিলাম। এক সময় সেলিনা এক বিচিত্র হাসি হেসে বললো : দু'পাশের লোকগুলো কি রকম অভদ্রের মতো তাকিয়ে থাকে। বল না কোচোয়ানকে ফিটিনের দু'পাশে পর্দা নাবিয়ে দেবে।

আমাকে কিছু বলতে হলো না। কোচোয়ান সেলিনার কথা শুনতে পেয়েছিল। সেই বললো : এই দিচ্ছি মেম সাহেব!

দু'পাশ দিয়ে পর্দা ঝপ করে নেবে এলো।

সেলিনা আরো কাছে সরে এলো। এতক্ষণ আমি দৃষ্টি নত করেই বসেছিলাম। এইবার চোখ তুলে সেলিনাকে দেখলাম। তার ডাগর দুটি চোখের পরিপূর্ণ দৃষ্টি স্থির হয়ে আমারই ওপর নিবদ্ধ। তার তপ্ত নিশ্বাস আমার বুকের মাঝখানটাই যেন দগ্ধ শলাকার মতো বিদ্ধ করছে। সেলিনা তার কোলের ওপর আমার হাত টেনে আনল।

সন্ধ্যার আগেই বাড়ি ফিরে এলাম।

হাতমুখ ধুয়ে, কাপড় ছেড়ে, মুখে এক্লটা কিছু দিয়ে,—পড়তে বসলাম। দ্বিপ্রহর এবং বৈকালের মানসিক উত্তেজনা ততক্ষণে স্তিমিত হয়ে এসেছে। সভাকক্ষে বসে যে দুঃসাহসিক প্রস্তাব

অনেকটা অবলীলায় কণ্ঠাগ্রে এসে পড়েছিল, এবং যা তখনকার সেই চঞ্চল মুহূর্তে অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত মনে হয় নি, সন্ধ্যার ঈষৎ শীতল হাওয়ার স্পর্শে এবং গৃহের সাংসারিক পরিবেশে, এখন তাই তার সত্যকার পরিপ্রেক্ষিতে মনের সামনে এসে দাঁড়ালো। "যাবে, সত্যি যাবে" সেলিনার ঘর ছাড়ার প্রস্তাবে আমি ব্যাকুল-আকুল অধীর আগ্রহে এই যে কথাগুলো বলেছিলাম, এখন তারই প্রতিধ্বনি ব্যঙ্গোক্তির মতোই কানে বাজতে লাগল। নিজের অসম সাহসিকতায় নিজেই হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম।

চৌবাচ্চার সামনেই আমার অকালবৃদ্ধ জননী পর্বতপ্রমাণ নোংরা কাপড় নিয়ে বসেছেন। এইগুলো ধোয়া হবে, সারারাত ধরে শুকোবে, তবে না কাল ছেলেরা ভদ্র সাজে মাদারীপুর যাত্রা করবে। কাপড় আছাড় দেয়ার শব্দ ছাড়া চারদিক নীরব। এই শব্দটুকু বারবার কানের ভিতর পর্যন্ত পৌঁছে আমার চিন্তার স্রোতকে সম্পূর্ণ ভিন্নপথে প্রবাহিত করে দিল। সেলিনা, তার জীবন, তার প্রস্তাব, সবকিছু যেন বহু দিন আগে স্বপ্নে দেখা ঘটনার মতোই অবাস্তব মনে হচ্ছিল। আমরা বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াই, বিশ্ব-সমস্যায় বিচলিত হই, নানা প্রকার ব্যক্তিগত সম্পর্কের জটিলগ্রন্থির মধ্যে শতপাকে জড়িয়ে পড়ি, এদিকে আম্মা বহির্জীবনের প্রতি আমাদের আকর্ষণকে খোদার অমোঘ বিধানের মতোই অনিবার্যরূপে স্বীকার করে নিয়ে নীরবে একহাতে সংসারের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। আম্মা এক সময় বললেন : স্টেশনে শুনছি বড্ড ভিড় হয়। সবাই কলকাতা ছেড়ে পালাচ্ছে। কি করে যে ভালোয় ভালোয় ট্রেনে গিয়ে উঠব এখন থেকে সে ভাবনাই হচ্ছে। তুই ছেলেমানুষ, সব দিক সামলাতে পারবি? সঙ্গে আবার আধ পাগলা ভাই থাকবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে আম্মা তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন। এই সময় অর্থ, বুদ্ধি ও সাহস নিয়ে পাশে এসে দাঁড়াতে পারতেন বড় ভাই। কিন্তু চাকরি পাবার পর থেকেই বাড়িতে তিনি বেশি থাকেন না। নার্গিস আপা আই. এ পরীক্ষা দেবেন। তাঁরই পড়া দেখে দেন। এই কিছুদিন হলো বড় ভাই ছুটি নিয়ে নার্গিস আপনাদের সঙ্গে দিল্লি বেড়াতে গেছেন। বেড়ানো হবে, বোমা থেকেও দূরে থাকা যাবে।

যাই হোক, আম্মার কথার জবাবে আমি বললাম : খুব পারব। তুমি চিন্তা করো না।

– চিন্তা করে আর কি করব বাবা। আমার নিজের শরীরটাও যদি একটু ভালো থাকত। তোর আব্বা যে কত চিন্তা করবেন। আমরা যতক্ষণ না পৌঁছাই, তিনি ভাবনা করবেন।

—কিচ্ছু ভেব না তুমি। ভিড় একটু হবেই। তবে তোমাকে জেনানাদের কামরায় তুলে দিতে পারব ঠিকই। এবার তুমি উঠে পড়তো। আর কাপড় ধুতে হবে না। উঠলে? না উঠলে আমিও কাপড় ধুতে বসব।

—উঠছি বাবা। এই কুর্তাটা দেখছিস, পকেটের কাছে ছিঁড়ে গেছে। তোর বড় ভাইয়ের ছিল। সেতো আর পরবে না! সেলাই করে মজলাটাকে পরতে দেব।

—বড় ভাইয়ের ওপর তোমার খুব রাগ, তাই না।

—রাগ! না রে পাগলা। বাপ আমার যেখানেই থাক, সুখে থাক। চিন্তা হয় কেবল মজলাটার জন্য। খোদা তাকে এমন মাথা দিলেন, অথচ সে মাথাই যাচ্ছে বিগড়ে। লেখাপড়ায় সে তোদের সকলের চাইতে তেজ ছিল। তাছাড়া তার দিলটাও খুব বড়। সে খুব সাধারণ ছেলে ছিল না রে। যেমন নেক তেমনি ঈমানদার। তাছাড়া বাপ-মা-ভাইদের জন্য জান দিতে পারে। আল্লাহ্‌র কি মর্জি আল্লাহ্‌ই জানেন। তারই মাথা কেন যে অমন গরম হয়ে গেল। দুঃখ হয়, তারই জন্য। যেদিন মরব, সেদিনও তারই জন্য চিন্তা নিয়ে মরব। কি যে তার গতি হবে।

তোরও খুব দুঃখ হয়, আমি সব বুঝি। তুই বড্ড চাপা। মুখ ফুটে কিছু বলতে চাস না। কিন্তু মার মনকে কি করে ফাঁদি দিবি বল! আমি মরে গেলে বদমেজাজ ভাইকে তোরা হয়তো কেউ সঙ্গে রাখতেই চাইবি না। তোরা চাইলেও তোদের বউ চাইবে না। বউদেরই-বা দোষ কি! শান্তি কে না চায়!

আমি সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে বললাম : আমার সবচাইতে দুঃখ হয় তোমার জন্য। জীবনে কোনোদিন যদি সুখের দিন দেখতে পারি, সেদিন তোমার কথা মনে করেই সবচাইতে দুঃখ হবে। সারাটা জীবন কি কষ্টটাই না করে যাচ্ছ।

—দূর পাগল! তুই ভাবিস, আমার বুঝি খুব কষ্ট? কিন্তু বিশ্বাস কর, আমার এতটুকু কষ্ট হয় না। তুই ভাবছিস, আমি বানিয়ে বলছি! একটুও না। যেদিন তোর ছেলেমেয়ে হবে সেদিন বুঝবি আমার কথা সত্য কি না।

—এবার তুমি উঠে পড়তো। ঠাণ্ডা লেগে জ্বর না আসে। এমনিতেই বলছ তোমার শরীর ভালো নেই। আমাকেও উঠতে হবে। তাড়াতাড়ি চারটে ডাল-ভাত যা আছে দাও।

—একটু সবুর কর। কাপড়গুলো নেড়ে দিয়েই আলু চটকাতে বসব। এই এলাম বলে। তুই বস!

ভেবেছিলাম যাব না। কিছুতেই যাব না। কিন্তু রাত দশটা বাজতেই কে যেন জোর করে আমাকে বিছানা থেকে তুলে দিল। আস্তে আস্তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। একেই যুদ্ধের বাজার, রাস্তায় আলো বড়ই কম। আজ কি কারণে জানি না, রাস্তা একেবারেই অন্ধকার। বোধ করি কোনোখানে ইলেকট্রিক তার বিগড়ে গেছে। এমনই নিকষ কালো অন্ধকার, দেখে মনে হলো, এই বুঝি প্রথম রাত্রির সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় হচ্ছে। এমন আলকাতরার মতো বীভৎস অন্ধকার আগে কখনো দেখি নি। রাত্রি দশটা কলকাতার নাগরিক জীবনের পক্ষে বেশি রাত নয়, এমনকি সেই যুদ্ধের সময়ও নয়। তবে ইদানীং বোমা পড়ার আতঙ্ক চতুর্দিক ছড়িয়ে পড়েছে। সেই যে রবিবার দিন সকালবেলা খিদিরপুরে বোমা পড়ল, তারপর থেকেই এই আতঙ্কের শুরু। পথে লোকজন নেই বললেই চলে। কেবল ভকত-এর পানের দোকানে লাইটিং-রেশট্রিকশন অনুসারে একটা হারিকেন লণ্ঠন অবগুণ্ঠিত হয়ে বিরল পথিককে পথের সন্ধান দেয়ার চেষ্টা করছে। ভকত হাত পা চোখ কান মাথা একটা সাদা কাঁথায় ঢেকে তার দোকানের খুপরিতে চুপচাপ বসে আছে। কড়ায়া রোডের দু-একজন নিশীথিনী শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণবর্ণের গাউন ঝুলিয়ে অলস পদক্ষেপে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হয়তো তাদের মন্দির তখনো শূন্য, তাই। তাদের ঠোঁটের জ্বলন্ত সিগারেট অন্ধকারে রক্তচক্ষুর মতো জ্বলছে। এই প্রেম-পসারিণীদের পাড়া থেকে তুলে দেয়ার জন্য ভদ্র প্রতিবেশীরা কয়েকবার আন্দোলনও করেছে; কিন্তু এখনো তার কোনো ফল পাওয়া যায় নি। হয়তো যুদ্ধের পর তাদের তুলে দেওয়া হবে।

তাদেরই পাশ কাটিয়ে আমি অভিসার শুরু করলাম। বেনিয়াপুকুর উপস্থিত হতে সময় খুব কম লাগল না। সেলিনাদের বাড়িও বাইরে থেকে অন্ধকার দেখাচ্ছে। আমি এগিয়ে গেলাম। এ রকম তো কতবারই এসেছি, কোনোদিন এতটুকু ইতস্তত করি নি। কিন্তু আজ কিছুতেই পা উঠতে চায় না। হাঁটুর কাছে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে। আগেই ঠিক করেছি, পালিয়ে-টালিয়ে যাওয়া হবে না। ওসব পাগলামি আমার দ্বারা হবে না। সেই কথাটি বলতেই কি এত রাত্রে সেলিনার শয়নকক্ষে একাকী এগিয়ে যাচ্ছি? যাবই না যদি, তাহলে একেবারে না এলেই-বা ক্ষতি কি ছিল? এগিয়েই গেলাম। ভেজানো কোলাপসিবল গেটটা এক হাত দিয়ে খুলতেই, দরজার মরচে-পড়া চাকাগুলো ক্যাঁচ করে শব্দ করে উঠল। শব্দ মাত্রই যখন আমাকে চমকিত

করে দিচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ই এই অপ্রত্যাশিত শব্দটা বুকের ভিতরটা পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিল। দমকা ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শে শরীরটা শিরশির করে উঠল। সভয়ে চারদিক দেখতে দেখতে এগিয়ে গেলাম, কেউ কোথাও দেখছে না তো। নাঃ। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত ক'টা হবে এখন? এতক্ষণে বোধ হয় এগারোটাই হবে। বাড়িটার পিছনেই ঘোড়ার একটা আস্তাবল। সেখান থেকে এক প্রকার অসহনীয় দুর্গন্ধ ভেসে আসছিল, মাঝে মাঝে ঘোড়ার অসন্তুষ্ট হ্রেস্বাধ্বনি রাত্রির শান্তি বিচলিত করছিল। ঘরের ভিতরকার এই খোলা মাঠটিতে অনেকগুলো চৌকি পাতা আছে, যেখানে গাড়ির কোচোয়ানরা চাদর মুড়ি দিয়ে গভীর নিদ্রায় অচেতন। তাদের সম্মিলিত নিশ্বাস এই জায়গাটির বাতাস বেশ কিছুটা তপ্ত করে তুলেছে। এইখানটায় এসে বেশ যেন আরাম বোধ করলাম। তাদের পাশ কাটিয়ে এগুলে সামনেই দরজা। খোলাই আছে। দরজার সামনেই একটা প্রস্তর নারী-মূর্তি। এই মূর্তিটিকেও পিছনে রেখে সেলিনার দরজার সম্মুখে এসে দাঁড়ালাম। সবাই কি ঘুমে অচেতন? এই তো সেলিনার কক্ষ? ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম। সেলিনাই কি খাটের ওপর ঐভাবে শুয়ে আছে। অন্ধকারে একটি শায়িত নারীর অস্পষ্ট রেখার তরঙ্গ যেন চোখে পড়ে। সেলিনা ছাড়া আর কে হবে? দরজা দুটি ভিতরের দিকে খোলে। দুই হাত দিয়ে বেশ জোরেই দরজা দুটি ভিতরের দিকে ঠেলে দিলাম। হাত পা বুক সবই থরথর করে কাঁপছিল। তবু সমস্ত শক্তি একত্র করে দরজা দুটি ঠেলে দিলাম।

তারপর এক মুহূর্তের মধ্যে কি যেন ঘটে গেল।

দরজার ও পাশেই একেবারে দরজার সঙ্গে ঘেঁষে পানি খাবার কাচের জগ আর গেলাস রাখা ছিল। অন্ধকারের বুক চিরে ঝনঝন করে শব্দ উঠল। তৎক্ষণাৎ সেলিনা বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে আলো জ্বালিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার "কে কোথায় আছ, তাড়াতাড়ি এসো। দেখ, শাকের এত রাত্রে আমার ঘরে কি করছে।" তখনো সুইচের ওপর তার হাত।

সেলিনার চিৎকারের কোনো প্রয়োজন ছিল না। ঘরের যেখানে যত আলো ছিল সব জ্বলে উঠল। পিছনে ক্ষিপ্র পদক্ষেপের শব্দ! নিমেষের মধ্যেই যেন এই ঘুমন্তপুরী এক বিরাট লম্ফ দিয়ে জেগে উঠেছে। অনেকগুলো চোখের আলো তখন দপদপ করে জ্বলছে। কে কে উঠে এলেন, কার হাতে লাঠি ছিল, কার হাতে আর কি ছিল, কিছুই তখন আমার চোখে পড়ে নি। কতগুলো ভাঙা ভাঙা বিস্ময়াহত উক্তি কেবল থেকে থেকে কানে বাজতে লাগল। শাকের! এখানে! এমন সময়!

তখন কিছুই ভালো করে আমার চোখে পড়ছে না, কানে বাজছে না। আমার দৃষ্টি একবারমাত্র মাতালের মতো টলতে টলতে সেলিনার ওপর এসে পড়ল। সে তখনো সেইভাবেই দাঁড়িয়ে। ঠোঁটের কোণে বিজয়িনীর হাসি, যে-হাসি আমি ছাড়া আর কারো চোখে পড়া অসম্ভব।

ঘণ্টা দেড়েক পর বাড়ি ফিরে এলাম। আম্মা তখনো জেগেই ছিলেন। ঘরে আলোও জ্বলছে। আমাকে দেখেই আম্মা চিৎকার করে উঠলেন : ও কি রে! তোর চোখে রক্ত কেন? কাঁপছিস কেন?

চোখের উপরকার রক্ত আর অশ্রুর আবরণ ভেদ করেও দেখতে পেলাম. আম্মার মুখও কাগজের মতো সাদা! তাঁর চোখ দুটিও লাল। নিশ্চয়ই বহুক্ষণ ধরে কাঁদছেন।

—আমি সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছি। তোমার কি হয়েছে' তোমার মুখ মড়ার মতো ফ্যাকাসে কেন?

আম্মা কোনোমতে আমার কাছ পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। হাত দুটি তাঁর তখনো কাঁপছে, থরথর করে কাঁপছে, কোনো শাসন মানছে না। সেই দুটি হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তেমনি কাঁপা গলায় বললেন : এই দ্যাখ টেলিগ্রাম!

সব রকম দুঃসংবাদের জন্যই তৈরি ছিলাম। কোনো রকম দুঃসংবাদই তখন আমাকে দুঃখ দিতে পারত না। তবু টেলিগ্রামটি যখন চোখের সামনে তুলে ধরলাম, চোখ দুটি তখন ভয়ে কাঁপছিল।

বড় ভাইয়ের টেলিগ্রাম। তিনি জানাচ্ছেন, নার্গিস আপার সঙ্গে দিল্লিতেই তাঁর বিয়ে হয়ে গেছে। আগে জানাতে পারেন নি বলে দুঃখিত। মামু অনেক ধুমধাম করেছিলেন, একমাত্র মেয়ের বিয়ে। আব্বা-আম্মার দোয়া চেয়েছেন।

আমি আর দাঁড়াতে পারছিলাম না। আম্মার সমস্ত শরীর কাঁপছিল। আমরা একে অপরকে ধরে সেখানেই বসে পড়লাম। ট্রেনে-স্টিমারে আম্মা একটি কথাও বলেন নি। এক মুহূর্ত ঘুমান নি। মুখে কিছু দেন নি।

মাদারীপুরে এক সময় পৌঁছলাম। বাংলোয় যখন উপস্থিত হলাম, দেখলাম আব্বা গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। সকলেই নিঃশব্দে ঘরের ভিতর প্রবেশ করলাম। আব্বাও কেমন ম্রিয়মাণ। একবার শুধু জিগ্যেস করলেন : আব্বাসের মা, পথে কোনো কষ্ট হয় নি তো!

আম্মা কোনো জবাব দিলেন না। একবার শুধু দুটি চোখ তুলে আব্বার দিকে তাকালেন। সে চোখের দৃষ্টি যে দেখে নি সে তার ভাষা বুঝবে না। আম্মা সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করলেন : খবর শুনেছেন?

আব্বা হাসলেন। এ হাসিরও একটা ভাষা ছিল। তারপর মৃদু কণ্ঠে বললেন : আব্বাসের বিয়ের কথা? হ্যাঁ। আমি কাল টেলিগ্রাম পেয়েছি। তাছাড়া শামসের কাল দিল্লি থেকেই এলো। সে বলছিল, খুব না কি ধুমধাম হয়েছিল। অনেক বড় বড় লোক সব এসেছিলেন। সেখানে গরিব বাপকে কি মানাত?

এই বলে আব্বা তেমনি করেই হাসলেন।

আম্মা আব্বার পায়ের কাছে বসে পড়লেন।

মেজ ভাই সারাটা পথ কোনো কথা বলেন নি, এখনো বললেন না।

উনত্রিশ

মাদারীপুর বেশি দিন ভালো লাগল না। কলকাতার ছেলে মহকুমা টাউনে এসে অল্প দিনেই হাঁফিয়ে পড়লাম। সময় কাটাবার জন্য নদীর তীর ছিল বটে। নদীটাও সুন্দর : অর্থাৎ নদীর নামটি—আড়িয়াল খাঁ। কিন্তু নদীর তীরে পলাতক বালকের মতো নিরুদ্দেশ হয়ে থাকতে বেশি দিন ভালো লাগল না। সেই রাত্রের ঘটনা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছিল না। গোটা ব্রহ্মাণ্ডের বুনিয়াদটাই যেন ধসে গেছে। কোথায় যেন একটা মস্ত প্রকাণ্ড ব্যাখ্যা লুকিয়ে আছে, সেটিকেই খুঁজে পাচ্ছি না। আমি ব্যক্তিগতভাবে লাঞ্ছিত হয়েছি, সেটাই যেন বড় কথা নয়। বড় কথা এই : সেলিনার পক্ষে কি করে এই সুপরিকল্পিত প্রবঞ্চনা সম্ভব? সে তো নারী। সে ভুল করতে পারে, সে চঞ্চলমতি হতে পারে, তার স্বভাব তাকে বিপথে নিয়ে যেতে পারে; কিন্তু এই শঠতা, অনুষ্ণ মস্তিষ্কের এই শীতল প্রবঞ্চনা তার দ্বারা কি করে সম্ভব হতে পারে? এই

হিসাবটাই আমি কিছুতেই মিলাতে পারছিলাম না।

তবু এ কথাও মনে হচ্ছিল, কোন হিসাবটাই-বা মিলেছে? চন্দ্রার? শুরুর সাথে চন্দ্রার শেষের কোনো মিল আছে? চন্দ্রা-জননীর মাতৃ-মূর্তির সাথে সেই অঙ্ক-শায়িনীর কোনো সাদৃশ্য আছে? সেলিনাই-বা তাহলে পৃথক হবে কি করে!

নারীর পরিচয় কি তাহলে এই? অসম্ভব! জীবনের প্রভাতেই অত্যন্ত স্বল্প অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এত বড় একটা প্রশ্নের উত্তর এত সহজে সেরে ফেলতে মন কিছুতেই রাজি হলো না। তবু দুর্ভাগ্যবশত যে অভিজ্ঞতাটুকু হলো, তারই ওপর নির্ভর করে ঢালাও অভিমত দেওয়া যতই অযৌক্তিক হোক, এই বিক্ষিপ্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাটুকুর কাছে কেতাবে-পড়া নারী মূর্তির ছবি নিতান্তই অবাস্তব মনে হচ্ছিল। মনের তখন এমনই সাংঘাতিক ও বিকারগ্রস্ত অবস্থা যে নারী সম্বন্ধে সলিলের যা বক্তব্য তারও মধ্যে কোথায় যেন যুক্তি আছে মনে হচ্ছিল।

আমার মনের এই অসুস্থ এবং নিতান্তই অশোভন বিকার থেকে মুক্ত হতে আমার সময় লেগেছিল।

যাই হোক একদিন আম্মাকে বলেই ফেললাম : এখানে একটুও ভালো লাগছে না। কলকাতায় ফিরে যেতাম; কিন্তু কোথায় গিয়ে উঠব?

—তুই আজকাল কেমন ধারা হয়ে গেছিস। কি হয়েছে রে!

—হবে আবার কি? কাদামাটি ভরা দেশে কতদিন ভালো লাগতে পারে।

—এই কাদামাটির দেশই সত্যকার দেশ। সে যাই হোক, সোনা দিয়ে মোড়া দেশে যেতে চাস!

—যেতে তো চাই; কিন্তু থাকব কোথায়?

—টালীগঞ্জে তোর এক দূর সম্পর্কের ফুপাত ভাই আছে। ফুপাত ভাই-ও ঠিক নয়। বাপ-মা মরা ছেলে, তোর ফুপু মানুষ করেছিল। সে কাঠের ব্যবসা করে। সেখানে গিয়ে থাকবি? তোর ভাবিও লোক খুব ভালো। দেখবি খুব আদর-যত্ন করবে। যাবি সেখানে?

—নতুন লোকের সঙ্গে থাকব, সে আমি পারব না। কেমন বাধ-বাধ ঠেকবে।

—তুই যাতো! মেয়েটিকে আমি কয়েকবার দেখেছি—আমাকে ভক্তিও করে খুব—অমন লক্ষ্মী মেয়ে হয় না। দেখবি মাথায় করে রাখবে। দু'দিনেই আপন করে নেবে।

তিরিশ

আম্মা ঠিকই বলেছিলেন। নিহার ভাবি দু'দিনেই একেবারে আপন করে নিলেন। আমার এমন এক আশ্চর্য সুন্দর লক্ষ্মী ভাবি আছেন এই কথা আমাকে আগে কেউ কখনো বলে নি মনে করে আমার ভারি অবাক লাগল।

কেবল স্বামী-স্ত্রীর সংসার। ছেলেপুলে হয় নি। বিয়ে হয়েছে বছর সাতেক। জমির ভাই কাঠের ব্যবসা করেন। অবস্থা রীতিমতো সচ্ছল। আমি ঘুম থেকে উঠবার আগেই তিনি বেরিয়ে পড়েন এবং রাত্রে আমি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়বার পর তিনি ফিরে আসেন। তাঁর সাথে দেখা-সাক্ষাৎই বড় একটা হয় না। ঘুম থেকে চোখ খুলতেই রোজ দেখি, নিহার ভাবি এক পেয়ালা গরম চা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকছেন। স্নান সারা, লম্বা ভেজা চুল পিঠের ওপর ছড়ানো, সারা মুখে প্রসন্ন হাসি, এবং হাতে গরম চা। সুতরাং অল্প দিনেই ভাবির সঙ্গে ভাব হয়ে গেল।

—আচ্ছা ভাবি, আপনি কি করে বুঝতে পারেন, আমি এই সময়টাই উঠব। রোজ তো আর একই সময় উঠি না। গরম চায়ের বাটি নিয়ে ঠিক সময় কি করে পৌঁছে যান?

—আমি যে হাত গুনতে জানি।

—না, ঠাট্টা নয়। সত্যি বলুন।

—পাগলা ছেলে! তুমি কি মনে কর আমি এইমাত্র এলাম। এর আগে কতবার এসে এসে ফিরে গেছি, প্রতিবারই দেখি খোকা ঘুমিয়ে আছে।

—প্রতিবারই চা নিয়ে এসেছেন?

—তা বই কি। আমি চা-বাগানের মালিক কি না!

—তাহলে?

—একবার এসে দেখি বাবু বেহুঁশ হয়ে নাক ডাকছেন। তখন জেনে যাই, তোমার রাত ভোর হতে অনেক বাকি আছে। তারপর এসে দেখি পাশ ফিরেছ। তখন বুঝে নি, মাঝে একবার নড়েছে। তারপর দেখি, অন্য পাশে মাথার ওপর হাত রেখে চোখ বন্ধ করে পড়ে আছ, পায়ের কাছ থেকে চাদরটা সরে গেছে। তখন বুঝতে পারি, তোমার ঘুম পাতলা হয়ে এসেছে। তারপর দেখি, চোখ দুটি বোজাই আছে; কিন্তু পা-টা যেন একটু একটু নড়ছে। তখন বুঝতে পারি, খোকা, এইবার উঠবে। তখন আমি চা তৈরি করতে যাই।

—আপনি কি সারাক্ষণ এই করেন? আপনার অন্য কাজ নেই?

কিই-বা আর কাজ।

অজান্তেই ভাবি যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

আমিই আবার বলি : সত্যি আপনি আমার জন্য অনেক করেছেন। মাঝে মাঝে মনে হয় চলে যাই, আপনাদের কষ্ট দিচ্ছি!

এমন ব্যগ্র হয়ে ভাবি আমার হাত দুটি চেপে ধরলেন যে আমি অবাক হয়ে তাকিয়েই থাকি।

—দোহাই তোমার। এই কথাটি মুখে এনো না।

তারপর চায়ের শূন্য পেয়ালাটা হাতে করে নিয়ে ভাবি ফিরে যান। একটু পরে আবার ফিরে আসেন। হাসতে হাসতে বলেন : আমার কেবলই ভয় হয় তুমি মামানির কাছে গিয়ে আমার বদনাম করবে, বলবে তোমার কোনো খেয়ালই করতে পারি নি। সত্যি, গরিবের বাড়িতে তোমার খু-উ-ব কষ্ট হচ্ছে।

—আপনি জানেন কথাটা কত মিথ্যা! আর গরিব বড়লোকের কথা বলছেন! আমাদের অবস্থার কথা তো ভালো করেই জানেন। নিহার ভাবি তেমনি হাসতে হাসতে বললেন : আমাদের যা কিছু আছে তোমাকে তার ভাগ দিয়ে যাব। না, ঠাট্টা নয়। আমাদের আর কে আছে বলো। আমার থাকবার মধ্যে আছে এক বোন। তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হলে কিন্তু আমি বড় খুশি হই। তুমি মনে করছ, আমার বোন আমারই মতো জংলি? তা কিন্তু মোটেই নয়। সে দার্জিলিং-এর স্কুলে পড়ে। দেখতেও খুব সুন্দর। মেয়েটি এমনিতেও খুব ভালো। নিজের বোন বলে বলছি না। বিয়ে করবে তাকে?

—পাগল না কি? আমার চাল নেই চুলো নেই, বিয়ে করব কি?

—কিচ্ছু লাগবে না। আমাদের মেলা আছে। তোমাকে কিছুই করতে হবে না। তোমার মতো ছেলে পেলে আমরা এক্ষুণি বিয়ে দি।

—খুব তো দাতা সাজছেন। আজ না হয় আপনাদের টাকা ভোগ করবার কেউ নেই। হতে

কতক্ষণ?

—থাক সে কথা।

ভাবি উঠে চলে গেলেন।

এইভাবেই দিনের পর দিন গড়িয়ে যেতে লাগল।

আর এক দিনের কথা।

সেদিন নিহার ভাবি বললেন : তুমি একটু বোসো। আমি কাজ সেরে এই আসছি।

মুখে একটা গান পুরে নিহার ভাবি উঠে চলে গেলেন।

পাশ থেকে বালিশটা টেনে নিয়ে বিছানাব ওপর গা এলিয়ে দিলাম। পাশেই কোনো বাড়িতে রেডিওতে গান হচ্ছে। শরতের নীল আকাশ গরাদহীন গবাক্ষ জুড়ে ফ্রেমে আঁটা ছবির মতো ঝুলছে। বালিশটাকে আঁকড়ে ধরে বিছানার ওপর এইভাবে পড়ে থাকতে বেশ লাগছে। মাঝে মাঝে বাতাস শরীর স্পর্শ করে যায়; তখন কেন জানি সবকিছু ফাঁকা মনে হয়।

ওদিকে রান্নাঘরে খুন্তি নাড়ার শব্দ হয়। চচ্চড়ি বা সেই জাতীয় কিছু একটা রান্না হচ্ছে। তেল-হলুদের গন্ধ নাকের কাছাকাছি এসে ফিরে ফিরে যায়। হাতের চুড়ির আওয়াজ নুড়ির মতো বাজতে থাকে।

—ওমা! তুমি যে শুয়েই পড়লে। অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি, তাই না!

—কোথায় আর অনেকক্ষণ! এই তো গেলেন!

—নাও নাও খেয়ে নাও। কটা গরম মাছ ভেজে আনলাম। বেশ লাগবে।

—বেশ লাগছে। নুন একটু বেশি হয়েছে।

—ভালোই তো! নেমকহারামি করতে পারবে না।

নিহার ভাবিও বিছানার ওপর বসে পড়লেন। মাথার চুল খোলা। কপালে নাকে আর দুই গালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। কাঁধের ওপর থেকে আঁচল টেনে এনে ঘাম মুছলেন। উদ্যত হাতের নিচেও ঘাম।

—এতও ঘামতে পারেন আপনি।

—আর বোলো না ভাই। যা মুটিয়ে যাচ্ছি। ঘামব না!

—যাঃ মোটা আর কোথায়!

—ওমা। মোটা নয়, তুমি বল কি!

এই বলে নিহার ভাবি তাঁর দুই হাত এগিয়ে দিলেন। পুষ্ট দুটি বাহুর ওপর থেকে আঁচল সরিয়ে দিলেন।

—তাও বলবে মোটা না। দেখ দিকি।

আমি সে কথার কোনো জবাব দিই না। দৃষ্টি নত করে নি। নিহার ভাবি অনেকটা আপন মনেই বলে গেলেন : মুটিয়ে যাব, তাতে আর আশ্চর্য কি! বয়স তো আর কম হলো না।

এই বলে নিহার ভাবি উঠে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ালেন। ঘাড়ে কপালে আর গলার ওপর ময়লা জমে আছে। ময়লার আর দোষ কি। উনুনের কাছে বসে সারাদিন কাজ কবলে খাঁজে খাঁজে ময়লা তো জমবেই। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিহার ভাবি ঘষে ঘষে গায়ের ময়লা তুলতে লাগলেন।

—দেখো দিকি, কি ময়লাটাই না জমেছে।

এই বলে তিনি এগিয়ে এলেন। মাথাটা উঁচু করে সারসের মতো লম্বা গলাটা আরো লম্বা

করলেন। ঘষে ঘষে গলাটিকে লাল করে ফেলেছেন।

—এবার চলি। বেলা হয়ে গেছে। অনেক কাজ পড়ে আছে।

কিন্তু ঠিক তক্ষুণি উঠে গেলেন না।

—ইস্। এক্কেবারে যে ভিজে গেছ। এই ঝড়-বাদলের মধ্যে বেরুতে আছে।

—বেরুতেই হলো। রেডিওতে স্ক্রিপ্ট দিয়ে এলাম।

—স্ক্রিপ্ট? কিসের স্ক্রিপ্ট?

—আজ রাত্রে রেডিওতে একটা গল্প পড়ব।

—ওমা, তুমি গল্প লেখ না কি। কৈ আমাকে তো কখনো বল নি!

—বলবার মতো কিছু নয়। ফ্যাসি-বিরোধী গল্প—জাপানি অত্যাচারের কাহিনী!

নিহার ভাবি ততক্ষণে একটা পরিষ্কার তোয়ালে নিয়ে এসেছেন। দুই হাত দিয়ে আমার মাথা মুছতে মুছতে বললেন : তোমার পেটে অনেক বিদ্যে আছে। আমাকে কিছুই জানতে দাও না। মূর্খ মানুষ! আমি বুঝিই-বা কি।

মাথার চুল যখন মরুভূমির মতো শুষ্ক করে ফেলেছেন, তখন ক্ষান্ত হয়ে তোয়ালেটা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে নিহার ভাবি বললেন : নাও নাও মাথাটা ভালো করে মুছে ফেল। এক্ষুণি সর্দি-কাশি শুরু হয়ে যাবে। আর এই লুঙ্গিটা পরে নাও।

—লুঙ্গি আমি পরি না।

—বাবুয়ানা পরে করো। এখন জান তো বাঁচাও। আমি ভুলে তোমার সব কটা পাজামা ধোপার বাড়ি দিয়ে দিয়েছি। বোসো। আমি এক্ষুণি গরম চা করে আনছি।

শুধু চা নয়। পাঁপর ভাজা আর গরম দালপুরিও এলো।

—এই অসময়ে এত সমারোহ করে দালপুরী খাওয়াচ্ছেন। ভাত খেতে দেবেন কবে?

—আজ কপালে ভাত নেই। মুখপোড়া বাবুর্চি বাজার থেকে গরুর গোস্ত নিয়ে এসেছে, তাতে আবার পোকা ভরা। হতভাগা আমাকে জানতেও দেয় নি। দিব্যি চুলোয় চড়িয়ে দিয়েছিল।

—দালপুরিটা কিন্তু একদম গরম। এইমাত্র করলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি জানতাম কি না, তুমি এক্ষুণি এসে পড়বে।

—যাঃ, তাও বুঝি কখনো হয়!

—হয় হয় খুব হয়। তুমি ছাই জান। ভালোবাসার পাত্র এলে মন বুঝতে পারে।

—কি যে বলেন! আমার লজ্জা করে।

—লজ্জা করে! সে কি গো!

নিহার ভাবি হেসেই আকুল।

হাসতে হাসতে যাকে বলে একেবারে খুন! এমন করে কেউ হাসে। মাথার কাপড় কোথায় খসে পড়ল ঠিক নেই, ব্লাউজের বোতাম খোলা সে সম্পর্কে কোনো হুঁশ নেই, কেবল ঢেউয়ের মতো ফুলে ফুলে হাসলেই হলো।

—অমন পাগলের মতো হাসছেন কেন?

হাসব না। তোমার কথা শুনলে যে মরামানুষও হেসে উঠবে।

এমন সময় বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল।

—দাঁড়াও দিকি বাবু। লোক এসেছে। তোমার ভাইয়ের খাবার পাঠাতে হবে।

নিহার ভাবি খানিক বাদেই ফিরে এলেন। বললেন : যাও তো সোনা আমার। একটু সাজগোজ

করে এসো।

—এই অসময়ে সাজতে যাব কোন দুঃখে?

—দুঃখে নয় রে পাগল, সুখে। আমি তোমার সঙ্গে পালাব।

—আমি খুব রাজি। কোথায় যেতে চান?

—নিউ মার্কেটে। কেনাকাটা করবার আছে।

—খাবেন না?

—আজ বাইরে কোনো হোটেলে চপ-কাটলেট খাব চলো। বেশ মজা হবে, তাই না!

—হ্যাঁ চলুন। আমি খুব রাজি।

—একটু অপেক্ষা করো, আমি ব্লাউজটা বদলে আসি। ঘামে কেমন ভিজে গেছে, একবার দেখেছ।

—দেখেছি।

পটপট করে ব্লাউজের বোতামগুলো খুলতে খুলতে নিহার ভাবি পাশের ঘরে কাপড় ছাড়তে চলে গেলেন। আমিও বাক্স থেকে প্যান্ট বের করবার জন্য অন্যদিকে চলে গেলাম।

মিনিট পাঁচেক পরই নিহার ভাবি আবার বেরিয়ে এলেন।

ঐ যাঃ দেখেছ। কি ভুলো মন! ফর্সা ব্লাউজ বের করতেই ভুলে গেছি।

নিহার ভাবি কোনোমতে গায়ের ওপর আঁচল জড়িয়ে বেরিয়ে এসেছেন।

—হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কি? এসো এসো বাক্সটা ধরে নাবাও।

দু'জনে ধরাধরি কবে বাক্সটা নাবালাম। তাড়াতাড়িতে মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে গেল।

—মাথা তো নয়, পাথর। এসো, আব একবার মাথা ঠুকে দাও। নইলে শিং বেরুবে।

এই বলে একটু হেসে তিনি আবার পাশেব ঘরে চলে গেলেন।

সাজগোজ করতে অবশ্য তাঁর সময় বেশি লাগে না। নিহার ভাবি অল্প পরই তৈরি হয়ে ফিরে এলেন। নিহার ভাবি সম্পর্কে সবচাইতে লক্ষ্য কববার বিষয় তাঁর সাজ-পোশাক। বাড়িতে থাকলে ব্লাউজ প্রায় পরতেনই না। এমনকি অনেক সময় পেটিকোটটা পর্যন্ত গায়ে রাখতেন না। আর সত্য কথা বলতে কি, লক্ষ্য করতামও। এ সম্বন্ধে কিছু বললে তিনি হেসে জবাব দিতেন : "আমরা বাপু গাঁয়ের মানুষ। বিয়ের পবই শহরে এসেছি। এখনো পুরোপুরি শহুরে হাত পারি নি। অত সব কাপড়-চোপড়েব বালাই হাঁফ ধরিয়ে দেয়। তাছাড়া বাড়িতে কেই-বা আছে!' যদি বলতাম . "কেন, আমি!" দুটি বড় বড় চোখ তুলে ভাবি একবার আমার দিকে তাকাতেন। যেন আমার কথাটা ভালো করে কানেই যায় নি। অথবা গেলেও, আমার বক্তব্য যেন তাঁর বোধগম্যই হচ্ছে না। তারপব শুধু বলতেন "তুমি!" আবার সেই হাসি। দুর্নিবার অপ্রতিরোধ্য হাসি। বস্তুত ভাবি বিয়ের আগে পর্যন্ত গ্রামেই ছিলেন। তার কথাবার্তায় পাকা বুদ্ধির পরিচয় থাকত, এমনকি একটা শিক্ষিত মনের স্বাক্ষর থাকত। তিনি কতদূর লেখাপড়া করেছেন সে কথা কোনোদিনই জিজ্ঞাসা করি নি। অথচ তাঁর আচবণ মোটের ওপর শালীন, রুচিসম্মত, যদিচ মাঝে মাঝে দুটি একটি কথা বা আচরণে গ্রামের মেয়েটি হঠাৎ উঁকি দিয়ে যেত।

তৈরি হয়ে এসে নিহার ভাবি কৌতুকভরে প্রশ্ন করলেন : "বল দেখি আমার সাজ-সজ্জা কেমন হয়েছে?"

তাঁর পরনে বগল পর্যন্ত কাটা চোলি; পেটের উপরের এবং কণ্ঠির নিচের মেদ অনেকটাই দেখা যায়। তাই আমিও বললাম : আপনার সাজ শয্যারই উপযোগী।

—চোপ ফাজিল কোথাকার। দিনে দিনে লায়েক হয়ে উঠেছ। কান মলে লাল করে দেব।

টালীগঞ্জের এক সুদূর প্রান্ত থেকে কলকাতা এলে আমরা বলতাম, শহরে যাচ্ছি। সেই শহর কলকাতায় এলাম। ট্রামে ভাবি অনর্গল কথা বলে চললেন। এমন বকবক করতে কাউকে শুনি নি। নিজের মনের আনন্দে কথা বলে চলেছেন। ঐ গাছটার নাম কি, ঐ ট্রামটা কোন দিকে যাবে, ঐ মেমটার পরনে ওটা কি, ইত্যাকার অবিরাম প্রশ্ন, এবং থেকে থেকে, "উঃ বড্ড খিদে পেয়েছে" এই কাতরোক্তি শুনে শুনে আমি অস্থির হয়ে গেলাম। এক সময় আমি প্রায় ধমকের সুরেই বললাম : আঃ থামুন তো! আপনি বড্ড বকবক করেন।

নিহার ভাবি মুখ ম্লান করে নীরব হলেন।

হোটেলে প্রবেশ করবার আগে আমরা ওয়াসেল মোল্লার দোকানে এলাম—ভাবিরই প্রয়োজনে।

—দেখতো, এই কামিজটা তোমার পছন্দ হয়?

—ভালোই তো! ভাইকে মানাবে ভালো।

—ভাইয়ের জন্য তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। তোমার পছন্দ কিনা, তা বলো!

—হ্যাঁ, পছন্দ!

ভাবি তৎক্ষণাৎ কামিজটা কিনে নিলেন।

—এই কামিজটা গায়ে দিয়ে রেডিও স্টেশনে যেও। ফর্সা মানুষ, বেশ মানাবে।

—বারে, আমি এটা নিতে যাব কেন?

—কেন, নিলে কি মানীর মান যাবে?

—যাবেই তো! আমি পুরুষ! বরঞ্চ আমিই আপনাকে দেব।

—দেখ, এই হাটসুদ্ধ লোকের মধ্যে তুমি আমাকে হাসিও না বাপু!

তারপর নিহার ভাবি আমাকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে সত্যিই হাসতে শুরু করে দিলেন।

—ওরে আমার পুরুষ রে! দেখে আর বাঁচিনে।

রিজেন্ট—রেস্টুরেন্টের একটা কেবিন বেছে নিয়ে আমরা আহার শুরু করে দিলাম। এক সময় ভাবি বললেন : বেয়ারাটাকে বলতো, এক বোতল টোমাটো সস নিয়ে আসবে।

—এক বোতল তো শেষ করলেন। আর কি দেবে!

—বাছা তুমি বলেই তো দেখ। দেবে না তো কি! পয়সাটা গুণে নেবে না?

পর্দার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ওয়েটার আমাদের তর্ক শুনছিল। সে কোনো কথা না বলে একটু হেসে চলে গেল। মিনিটখানেক বাদেই এক বোতল টোমাটো সস নিয়ে ফিরে এলো।

—দেখলে তো, দিলে কি না!

—আপনি কিন্তু বড্ড বেশি খাচ্ছেন।

—অমন নজর দিও না। তুমিও খাও না।

এই বলে তিনি চিকেন কাটলেটটা নিজের পাত থেকে তুলে আমার পাতে ঢেলে দিলেন।

আমি ব্যস্ত হয়ে দু'হাত দিয়ে তাঁর দুটি হাত চেপে ধরে বললাম :

—ও কি করছেন! দোহাই আপনার। ওটা পেটে গেলে আর বাঁচতেই হবে না!

—মরণ অত সহজে হয় না। চটপট খেয়ে নাও। আরো কাজ আছে।

—কিছুতেই পারব না।

—মাথা খাও ওটুকু খেয়ে নাও।

ওয়েটার বিল নিয়ে এলো। বকশিশ পেল। মিটিমিটি হাসতে লাগল।

—লোকটা ওভাবে হাসছে কেন? ব্যাটা ভাবল কি!

—কি জানি, জিগ্যেস করব?

—চোপ!

নিহার ভাবি হঠাৎ আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন। যেন আপন মনেই বলে গেলেন : আমাদের দেশটা এমন কেন বলতো?

—কেমন কেন?

—ছেলে আর মেয়েকে হেসে দুটি কথা বলতে দেখলেই যা তা মনে করে বসে। ঐ ওয়েটারটার কথাই ধরো না। তোমাকে আমাকে দেখে মুখ-পোড়া ওয়েটার কিভাবে হাসছিল। আমি বয়সে কত বড় তাও!

বহুক্ষণ নীরবেই পথ চললাম। নীরবতা ভঙ্গ হলো আমারই প্রশ্নে :

—আচ্ছা ভাবি আপনার বয়স কত?

—বয়স? বোকা ছেলে। মেয়েদের বয়স জিগ্যেস করতে নেই। এ তো তোমাদের শহরেরই শিক্ষা।

হঠাৎ সেলিনার কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল একদিন তাকেও এই প্রশ্ন করেছিলাম; আর আশ্চর্য, এই জবাবই পেয়েছিলাম।

অন্যমনস্কের মতোই বললাম : যে মেয়ের যৌবন গেছে সেই বয়স গোপন করে। আপনি তো আর বুড়ি নন।

—যে মেয়ের কি গেছে?

—যৌবন।

—তোমার মুখে যৌবন শব্দটি শুনে আমার যা হাসি পায়। সে যাই হোক, আমাকে কি মনে করো? ছুঁড়ি?

—অন্তত বুড়ি নয়!

—বয়স কত হলো জানো? তেত্রিশ!

—তেত্রিশ? আশ্চর্য!

—তুমি কি মনে করেছিলে?

—তেইশ কি চব্বিশ!

—সত্যি?

—সত্যি।

—তেইশ ছিলাম দশ বছর আগে। তোমার বয়সটা কত হলো শুনি?

—আমার? বিশ হবে।

—এবার পরীক্ষায় তোমাকে ফার্স্ট হতে হবে কিন্তু।

—ওরে বাবা, একেবারে ফার্স্ট! তা না হয় একটা কিছু হওয়া যাবে; কিন্তু হঠাৎ পরীক্ষার কথা এলো কোথা থেকে?

—মানুষের মন! কোথা থেকে কোথা যায়। ওর আর হঠাৎ বলে কিছু নেই। এমনিই মনে এলো। একবার বেরিয়েছি যখন তখন চলো একটা সিনেমা দেখে আসি। শহরে তো বড় একটা আসা হয় না।

—তা বেশ চলুন। আমার কাছে কিন্তু পয়সা নেই।

—থাক। তোমার আর পয়সা থেকে কাজ নেই।

ছবি শুরু হয়ে গেছে অল্পক্ষণ হলো। আঁধারে কোনোমতে দেখে দেখে সন্তর্পণে আসনের দিকে এগিয়ে গেলাম, অনেকগুলো লোকের আসন পার হয়ে স্বস্থানে আসতে হলো।

ভাবি গজরাতে লাগলেন।

—দেশের লোকগুলো এমন বাঁদর। দেখছে মেয়েমানুষ আঁধারে এগুচ্ছে। পা-টাও একটু সরাবে না। যেন কোল পেতে বসে আছে।

চেয়ারের একই হাতলের ওপর দু'জনের হাত। যাকে বলে লোমহর্ষক, ছবিটা সেই জাতের। উভয়েরই অত্যন্ত দ্রুত উত্তেজিত শ্বাস পড়ছিল। নিহার ভাবিব তপ্ত নিশ্বাস আমার হাত স্পর্শ করে যাচ্ছিল। আমি অনেকটা কাঠ হয়ে বসেছিলাম। একটু আগেই নিহার ভাবি বলেছিলেন, মানুষের মন, কখন কোন দিকে যায় আগে থেকে বুঝবার উপায় নেই। দেখলাম সত্যিই তাই। এই সময় আমার মনের মতিগতি লক্ষ্য করে আমারও সেই কথাই মনে হলো। নিহার ভাবি আনমনে ছবি দেখছেন। বিস্ময় আর কৌতূহলভরা দুটি চোখ পর্দার ওপর। ছবির গল্প সত্যই ভয়াবহ। হলসুদ্ধ লোক অধীর উৎকণ্ঠায় চঞ্চল উদ্‌গ্রীব। দৈত্যটি যখন সকলের অলক্ষ্যে পাশের জানালা দিয়ে একাকী প্রসাধনরতা তরুণীর কক্ষে প্রবেশ করল, তখন দর্শকদের মধ্যে একটা চিৎকার পড়ে গেল। বহু আগে থেকেই নিহার ভাবির নিশ্বাসের উত্থান-পতন বড্ড দ্রুত হচ্ছিল। এবার তিনিও সভয়ে চিৎকার করে সবেগে আমার দুটি হাত তাঁর মুঠির মধ্যে পুরলেন, যেন, এই বিপদের মুহূর্তে তাঁর একটা অবলম্বন আবশ্যক। একেবারে তাঁর কোলের ওপর আমার হাত লতার মতো নেবে এলো। তখনো নিহার ভাবির বুক ধড়ফড় করছিল, তারই আন্দোলন ছাড়া আমার হাতে আর কোনো স্পন্দন ছিল না। একটু পরই ছবি শেষ হলো।

—ইস! একেবারে আঁধার হয়ে গেছে। এবার পালাই।

—আমাকে তো রেডিও স্টেশন যেতে হবে। আপনি একা যেতে পারবেন?

—তুমি হাসালে। আমি কি একা চলাফেরা করি না?

—তাহলে আমি আসি।

—আচ্ছা ভাই এসো। ভালো কথা, ফিরবার সময় তোমার ভাইয়ের জন্য এক জোড়া 'সামার কুল' গেঞ্জি নিয়ে এসো। ভুলে যেও না। তখন তাড়াতাড়িতে কিনতে ভুলে গেলাম। এই নাও টাকা।

—রেডিও থেকে ফিরতে রাত হবে। অত রাতে আবার গেঞ্জি কিনতে যাব?

—রাত হোক। এটুকু কষ্ট তোমাকে করতেই হবে ভাই।

নিহার ভাবি একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়লেন।

আমি গোপনে ট্যাক্সির নম্বর টুকে রাখলাম। কিছুই বলা যায় না। যা দিনকাল।

ফিরতে আমার রাত হয়ে গেল। এসে দেখি জমির ভাই ফিরেছেন। অন্যদিনের তুলনায় বেশ সকালই ফিরেছেন। নিহার ভাবি আমাকে দেখেও কিছু বললেন না। তাঁর মুখ ভার ভার। ভাত বাড়া ছিল। নীরবে খেয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে উঠে দেখি পাশের টেবিলে চা ঢাকা আছে, কিন্তু অন্য দিনের মতো নিহার ভাবি উপস্থিত নেই। আমি হাত-মুখ ধুয়ে শুধু এক পেয়ালা চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। রেডিও থেকে চেক পেয়েছি, সেটাও ভাঙাতে হবে।

আবার যখন বাড়ি ফিরলাম তখন দুপুর হতে চলেছে।

—সকালে না বলে না কয়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছিলে? এদিকে আমি সারাটা সকাল না খেয়ে বসে আছি।

—কাজ ছিল।

—কি হাতি-ঘোড়া কাজ ছিল শুনি? একবাব বলে গেলে কি ক্ষতিটা হতো!

নিহার ভাবি সত্যিই রেগে আছেন।

আমার দুটি হাত পিছনের দিকে লুকানো দেখে বললেন :

—তোমাব হাতে কি?

—বলুন দেখি!

—তোমার ভাইয়ের গেঞ্জি।

—উঁহু' হলো না'

এবার নিহার ভাবি রীতিমতো অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন :

—গেঞ্জি আন নি। এত করে তোমাকে বলে দিলাম।

—এনেছি, কিন্তু আরো জিনিস আছে।

—তাই বলো।

আর কি জিনিস আছে সে সম্বন্ধে নিহার ভাবি কোনো কৌতূহল দেখালেন না। বস্তুত গত রাত থেকেই তাঁব ব্যবহারটা একটু ভিন্ন রকম। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই কোনো মনোমালিন্য হয়েছে। তাই অনুমান করে আমি আর সে সম্বন্ধ কোনো প্রশ্ন তুললাম না। বিস্ময়ে আর কৌতূহলে নিহার ভাবিকে একেবারে হতবাক করে দেব, মনে মনে এই রকম একটা পরিকল্পনা আর প্রত্যাশা ছিল; কিন্তু তার কোনো রকম লক্ষণই দেখতে না পেয়ে আমি বড়ই দমে গেলাম। একটু পর নিহার ভাবিই বললেন : আজ শরীরটা ভালো নেই। পেট খাবাপ!

—পেটে আবার হলো কি?

—পেটে আবাব হবে কি! কাল তুমি যেভাবে নজর লাগাচ্ছিলে। তাবপর কোনো মানুষের পেট ভালো থাকতে পারে!

—যত দোষ আমার নজরেব! আর আপনি যে বসে অতটা গিললেন, সে কিছু নয়?

—অতটা আর কোথায় গিললাম? ওতো রোজই খাই। আমি বাপু মেম সাহেব নই। সারাদিন গতর খাটাই, পেট পুবে না খেলে আমার চলে না। কাগজের মোড়কটায় কি আছে এবার খুলে দেখাও দিকি চটপট।

—আমার বয়ে গেছে। যার গবজ সেই খুলে দেখুক।

কাগজের মোড়কটা অবগুণ্ঠিত বিস্ময়েব প্রতীকের মতো সেইভাবেই বিছানার ওপর পড়ে থাকল।

শেষ পর্যন্ত নিহার ভাবিই হার মানলেন।

—ওমা! কি সুন্দর কাপড়! কার জন্য এনেছ গো?

—কার জন্য আবার। আপনার জন্য।

—সে কি। আমি নিতে যাব কেন?

—কেন? নিলে কি মানীর মান যাবে?

এবার দু'জনেই হেসে ফেললাম।

—কাপড তো আনলে। টাকা পেলে কোথায়?

—কেন? কাল না রেডিওতে 'টক' ছিল। বিশটা টাকা পেলাম। আপনার জন্য ব্লাউজের

'ছিট' নিয়ে এলাম।

—খুব কাজ করেছ। এভাবে টাকা নষ্ট করতে আছে।

—আমি কত সাধ করে নিয়ে এলাম। আপনি এতটুকু খুশি হলেন না।

—খুশি হই নি? খুব খুশি হয়েছি।

তারপর একটু হেসে যোগ করলেন : মেয়েদের একটু নখরা করতে হয়। তা না হলে ভালো দেখায় না; কিন্তু আমি ভাবছি, এই টাকা দিয়ে তুমি কত কাজের জিনিস কিনতে পারতে।

—আবার নখরা। এও তো একটা কাজ।

নিহার ভাবি ব্লাউজের ছিটটা হাতে নিয়ে আয়নার সামনে এগিয়ে এলেন।

—কাপড়টা এনেছ খুব সুন্দর। কিন্তু বড্ড ছোট। এতে ব্লাউজ হবে কি না কে জানে!

—হবে না!

—কোনোমতে করতেই হবে। তুমি যখন এনেছ। আমি নিজেই ছাঁটব আর সেলাই করব। না হয় পেট আর বুক খালিই থাকবে। কেমন? পছন্দ তো?

আমি সে কথার কোনো জবাব দিলাম না। বললাম : দোকানদার যে বললো হবে।

—দোকানদার আমাকে দেখল কোথায়?

—বারে, যেখান থেকে শার্ট কিনেছিলাম, সেখান থেকেই তো কিনে আনলাম।

—ওঃ তাই বলো; কিন্তু দোকানদার ব্যাটা আর কতটা দেখতে পায় বলো!

—তা বটে!

—নিহার ভাবি মুচকে মুচকে হাসতে লাগলেন। আবার বললেন : বাহারের ব্লাউজ হবে। পেট আর বুক অর্ধেক খোলাই থাকবে।

—তা আব মন্দ হবে কি।

—দূর ফাজিল কোথাকার।

এবার বেশ কিছুটা সময় উভয়েই নীরব থাকলাম। নিহার ভাবি কিন্তু ঘুরে-ফিরে ব্লাউজ পিসটা নাড়তে লাগলেন। তারপর তিনিই বললেন : তোমার চোখ আছে। এই রঙটা আমাকে মানাবে বেশ, তাই না?

—তা মানাবে; কিন্তু ব্লাউজ জিনিসটাই আমার পছন্দ নয়।

—ওমা কেন?

—তা না হলে আরো মানাত।

—আ—বা—র!

এরপর তিনি উঠে গেলেন। একটা বাসনে ভাত-তরকারি এবং একটি গেলাসে পানি নিয়ে তিনি আবার উপস্থিত হলেন।

—নাও খাও!

—আপনি খাবেন না।

—না। আমি গা ধুয়ে তারপর যা হোক একটু কিছু মুখে দেব। হঠাৎ জানালা দিয়ে রাস্তাব ওপর কি একটা দেখতে পেয়ে নিহার ভাবি চেঁচিয়ে ডাক দিলেন : জলদি এদিকে এসো। একটা মজা দেখতে পাবে।

তাড়াতাড়ি জানালার ধারে এসে দেখলাম পাশের বাড়ির ষোল সতের বছরের মেয়েটি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছে।

—মেয়েটা ওভাবে ছুটছে কেন?

—ওর নিশ্চয়ই জোরে পায়খানা লেগেছে। বলেই নিহার ভাবি খিলখিল করে হেসে উঠলেন।

—আপনি মাঝে মাঝে এমন বদ-রসিকতা করেন।

নিহার ভাবির মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। তাঁর দু'গালে হঠাৎ কে যেন চড় মেরেছে।

মুখে ভাত পুরে যথাসম্ভব গম্ভীর হতে চেষ্টা করলাম; কিন্তু কিছুতেই পারলাম না। হঠাৎ উদ্দাম হাসির চোটে মুখের ভাত প্রায় ছিটকে পড়বার উপক্রম হলো।

—হঠাৎ তোমার আবার হলো কি!

—আমার হাসি আরো অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠল। কোনোমতে বললাম : তা মেয়েটার রকমসকম দেখে মনে হয়, আপনি যা বললেন, তাহলেও হতে পারে।

এবার আর নিহার ভাবি কোনো শাসন মানলেন না। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লেন। এইভাবে একটি একটি করে দিনও গড়িয়ে যেতে লাগল।

চিঠি এসেছে, আম্মা-আব্বা সকলেই কলকাতা ফিরে আসবেন। আব্বা অসুস্থ। আমাকে ঢাকা যেতে হবে, তারপর তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে আসতে হবে। ইতিমধ্যে আব্বা মাদারীপুর থেকে ঢাকা বদলি হয়েছেন। চার দিন পরই আমি ঢাকা যাচ্ছি।

নিহার ভাবির অনর্গল কথা আর অবিরাম হাসির উৎস যেন শুকিয়ে গেছে। শীতের অপরাহ্নের মতো এক প্রকার বিধুরতা তাঁর চোখ-মুখ গতিবিধি কাজকর্ম সব কিছুতেই আচ্ছন্ন করে আছে।

সেদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ কালো চুলে তেল মাখাতে মাখাতে তিনি বললেন : তোমাকে পেয়ে আমি বেঁচে গিয়েছিলাম।

—কি রকম।

—এই নির্বান্ধব পাড়ায় নিঃসঙ্গ জীবন যে কিভাবে কাটত আমিই জানি।

—লোকজনের সঙ্গে আলাপ হয়েই যাবে।

—তা যাবে।

তিনি আর কিছু বললেন না। তাঁর চোখ দুটি সজল হয়ে এলো। আমারও। আমি বললাম : এখানকার এ ক'টি দিন আমি কোনোদিনই ভুলব না।

নিহার ভাবি এ কথার কোনো জবাব দিলেন না। বললেন : যাই এবার। গা ধুয়ে আসি।

কাঁধে তোয়ালে আর পাট করা ধোয়া শাড়ি ফেলে তিনি গোসলখানায় প্রবেশ করলেন।

আমার মনটাও ভারি খারাপ হয়ে গেল। নিহার ভাবি সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে আমার যত্ন করেছেন। অত বড় হৃদয়ও হয় না। সত্য কথা বলতে কি এতটা যত্ন কোনোদিনই পাই নি। বসবার ঘরে একটি চেয়ারে লম্বা হয়ে এইসবই ভাবছিলাম। এক সময় টেলিফোন করবার জন্য জানালার ধারে উঠে এলাম। সেখানেই একটা ছোট্ট টেবিলের ওপর টেলিফোন রাখা আছে।

এমন সময় দেখি নিহার ভাবিও গোসলখানা থেকে বেরিয়ে আসছেন। পরনে একটি মাত্র শাড়ি ছাড়া আর কিছুই নেই। বোধ করি কাপড় ধুচ্ছিলেন, শাড়ি স্থানে স্থানে ভেজা। চুল খোলা। দু'হাতে সাবানের ফেনা।

—আবার বেরিয়ে আসতে হলো। ময়লা তোয়ালেটা ধোব, নিতে ভুলে গেছি।

আমি যেখানে দাঁড়িয়ে টেলিফোনটা হাতে তুলে নিয়েছিলাম, তিনিও তার বিপরীত পার্শ্বে দুই

হাত দিয়ে গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

—কাকে টেলিফোন করছ?

মুহূর্তকাল জবাবের জন্য অপেক্ষা করে তিনি আবার তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। কোথায় যে টেলিফোন করব মনে করেছিলাম, ভুলে গেলাম।

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানার ওপর একটু গড়িয়ে না নিলে নিহার ভাবির শরীর ভালো থাকে না। সেদিনও তিনি বিছানায় গা এলিয়ে বিশ্রাম করছিলেন।

প্রকাণ্ড বিছানা। আমি পাশে এসে দাঁড়ালাম। শয্যাশায়িনীর বেশবাস অবিন্যস্ত।

—শোবে ভাই, শোও না। পাশে অনেক জায়গা আছে।

আমিও পাশের বালিশটায় মাথা রেখে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ঘুম কি কিছুতেই আসতে চায়! পাশে নিহার ভাবি পাশ ফিরে শুয়ে আছেন। মাঝখানে বেশ ব্যবধান। এবার তিনি আবার আমার দিকে পাশ ফিরলেন। আমার কিছুতেই ঘুম আসছিল না। দ্রুত নিশ্বাসের তালে তালে নিহার ভাবির বক্ষ ওঠানামা করছিল। নিহার ভাবি চোখ বন্ধ করে পড়ে আছেন, বোধ করি ঘুমিয়েই পড়েছেন।

আমি হঠাৎ বিছানার ওপর উঠে বসলাম। ততোধিক অকস্মাৎ শক্ত করে তাঁর হাত চেপে ধরলাম। নিহার ভাবি বিশ্বের বিস্ময়-ভরা দুটি তন্দ্রাজড়িত চোখ তুলে আমার দিকে তাকালেন। যেন দুঃস্বপ্ন দেখছেন, এমনই ভীত চকিত সন্ত্রস্ত এবং সর্বোপরি বিস্ময়াহত চোখ আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। আমাকে যেন তিনি চেনেন না—এই প্রথম দেখছেন।

একটি নিমেষ মাত্র। ধড়ফড় করে তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। যে দুটি হাত দিয়ে তাঁর হাত ধরেছিলাম, প্রবল বেগে সেটি দূরে সরিয়ে দিয়ে তিনি উঠে বসলেন। এক মুহূর্তের জন্য তিনি বিহ্বল হয়ে গেলেন। তারপর দুটি হাত দিয়ে দ্রুত সর্বাঙ্গ ভালো করে ঢেকে নিলেন, মাথায় ঘোমটা তুলে দিলেন, তারপর উঠে চলে গেলেন। যাবার আগে কেবল বললেন : তোমার মনে এই ছিল?

তাঁর কণ্ঠে যে কি ছিল আমি আজও বোঝাতে পারব না। বিস্ময় না বিরক্তি না বেদনা না তিরস্কার—না কি সব কিছুরই একটা মিশ্রিত ব্যঞ্জনা কে বলবে।

এরপর আরো তিনদিন সেখানে ছিলাম; কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও নিহার ভাবির দেখা পাই নি।

চতুর্থ দিন সকালে চলে যাব। বাইরে ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ভালো করে তখনও ফর্সা হয় নি। গাড়িতে সামান্য মালপত্র যা ছিল, তোলা হয়ে গেছে। আমি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছি, যাবার আগে একটিবার কি নিহার ভাবি সামনে আসবেন না। একটিবার!

জমির ভাইও পাশে এসে দাঁড়ালেন। আমরা উভয়েই বহুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকলাম, নিহার ভাবির অপেক্ষায়; কিন্তু তবু তাঁর দেখা নেই।

—নিহার! একটিবার বাইরে এসো। শাকের যাচ্ছে যে।... আসলে কি জান শাকের। আসতে চায় না কেঁদে ফেলবে বলে। তুমি জান না; কিন্তু আমি জানি, তোমাকে মায়ের পেটের ভাইয়ের চাইতেও ভালোবাসে।

এতক্ষণে দরজার কাছে ছায়া পড়ল। দেখলাম, নিহার ভাবি।

পরনে মোটা শাড়ি, মাথার ঘোমটায় কপালের অর্ধেকটা ঢাকা, গায়েরর পুরাহাতা ব্লাউজের আস্তিন হাতের কব্জি পর্যন্ত লম্বা। একেবারে গলা পর্যন্ত বোতাম লাগানো।

আমি এখনো যা করি নি আজ তাই করলাম।

এগিয়ে গিয়ে নত হয়ে পা ছুঁয়ে কদমবুসি করলাম। আমার চোখের এক ফোঁটা অশ্রু তাঁর পায়ের পাতার ওপর গড়িয়ে পড়ল। মুখ ফুটে যা বলতে পারলাম না, এক ফোঁটা অশ্রু তাই বলে দিল।

একত্রিশ

সারাটা সকাল দুপুর ও সন্ধ্যা কেটে গেল আমাদের কলকাতার বাড়ি যথাসাধ্য ঝাড়পোঁছ গোছগাছ করতে। রাত্রিবেলা আমার ট্রেন—ঢাকা মেল। ব্রড গেজের গাড়ি। ফার্স্ট আর সেকেন্ড ক্লাসের কামরাগুলো খাসা। চওড়া গদি লাগানো। রাত্রিবেলা পুরা আসনটাই একজন যাত্রীর দখলে। আশ্চর্য, ফার্স্ট সেকেন্ড ক্লাসের এত প্রকার স্বচ্ছন্দের আয়োজন তুচ্ছ করে, আমার কল্পনায় আগুন ধরিয়ে দেয় গদি আটা বেঞ্চির মাঝামাঝি জায়গাটি, যেখানে হাতের কাছে কাঠের দেয়ালের গায়ে সামান্য খোপের মতো করা হয়েছে— যেখানে সিগারেটের কৌটা, দিয়াশলাই, এমনকি শোবার আগে একটা বই পর্যন্ত রেখে দেয়া যায়। স্বাচ্ছন্দ্যের এই আয়োজনটিই আমার কাছে সবচাইতে লোভনীয় মনে হয়। বেশ দুলতে দুলতে, ঝাঁকানি দিতে দিতে, গর্জন করতে করতে, ফোঁস-ফোঁস করতে করতে, ধমক দিতে দিতে, ঊর্ধ্বশ্বাসে ট্রেন ছুটতে থাকে। মাথার ওপরের বার্থের লোকটি বাতি নিবিয়ে এতক্ষণে হয়তো শুয়েই পড়েছে। আমি হয়তো শিয়রের কাছের আলোটি জ্বালিয়ে একটি উপন্যাস পড়ছি আর থেকে থেকে আরাম করে সিগারেটে একটা লম্বা টান দিচ্ছি। মাথার কাছে খোলা জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আসে। এক একটি স্টেশনের আলোয় ছুটন্ত ট্রেনের ভিতর থেকে দেখি, সামনের অন্ধকার-মণ্ডিত গ্রামগুলো অবিচলিত শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে। ঝোপের মাঝখানে ঘন আঁধারে ঝিঁঝি ডাকছে, আর মাথার পাশের বগের মতো দপদপ করছে। হয়তো ফ্লাস্ক থেকে একটু গরম চা ঢেলে নিয়ে গলাটা একটু ভিজিয়ে নিলাম, ফস করে দিয়াশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট ধরালাম, বইটা মুড়ে রেখে দিলাম, খোলা জানালার ধারে বসে বাইরের অন্ধকার দেখতে লাগলাম, এইভাবে হুড়মুড় করে এগিয়ে যাওয়া ট্রেনের গতিবেগ আস্বাদন করতে করতে এগিয়ে চললাম।

কিন্তু এসবই স্বপ্ন।

যেতে হবে সেই যাকে বলে থার্ড ক্লাসে।

ট্রেন স্টেশনে ভিড়বার আগেই সেখানে উপস্থিত হলাম। আগে থেকে এসে একটুখানি জায়গা করে নেব, এই মতলব। কিন্তু দেখলাম, আমার মতো হুঁশিয়ার লোকের অভাব নেই। ট্রেন ধীরে ধীরে প্লাটফর্মে প্রবেশ করল; কিন্তু ট্রেন স্থির হয়ে দাঁড়াবার আগেই দেখলাম হুড়মুড় করে এগিয়ে গিয়ে যে পারল সেই খোলা দরজা দিয়ে, জানালার ভিতর দিয়ে মাথা গলিয়ে, আর একজনের পায়ের ফাঁক দিয়ে, বগলের নিচে দিয়ে, নানান বিচিত্র ভঙ্গির অন্যায় কৌশলে যে যেভাবে পারল ট্রেনে উঠে পড়ল। কে নারী কে শিশু কে বৃদ্ধ কে অথর্ব সে ভাবনা ভাববার মতো সময় কারো নেই। অশক্ত বৃদ্ধকে টেনে ফেলে দিয়ে, হাত-ধরা শিশুকে মাতৃ-সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী তাঁর আসনটি দখল করবার জন্য দ্রুত এগিয়ে গেলেন, ঊর্ধ্বশ্বাসে, অনেকে মুক্তকচ্ছ হয়ে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এই বিরাট দৈত্যের মতো ট্রেনের প্রতিটি তৃতীয় শ্রেণীর কক্ষই যাত্রীতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। বাঙাল চরিত্রে এতটা তৎপরতা আছে, থার্ড ক্লাসের যাত্রীদের এই সময় না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। আশ্চর্য এই যে, মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমিও একটি থার্ড ক্লাস কক্ষে উঠে পড়লাম। কোনো মতে পা দুটির ওপর দাঁড়িয়ে থাকবার জায়গাটুকু ছাড়া তিল ধারণের স্থান নেই। চোখের সামনেই দেখলাম দেয়ালের গায়ে বড় বড় হরফে লেখা আছে : বাইশজন বসিবেক। বসিবেক তো বুঝলাম, কিন্তু বাইশজন কেন, অন্তত দেড়শত যাত্রী বাইশজনের জন্য বরাদ্দ স্থানে কোনোমতে ঠাঁই করে নিয়েছে। নারীর পক্ষে স্পর্শ বাঁচাবার উপায় নেই, আব্রু রক্ষার এতটা সুযোগ নেই। একজন জোয়ান মদ্দের ঠিক চোখের সামনেই শিশুকে স্তন দিতে হচ্ছে। সারা রাত্রির সফর। পার্শ্বের অনাত্মীয় অপরিচিত পুরুষের ঠিক বুকের ওপর অনূঢ়া তরুণীর তন্দ্রা ভারাক্রান্ত মাথা বারবার নুয়ে নুয়ে পড়ছে; সামনের পুরুষটির কোলের পাশে তার পা জোড়া কোনোমতে একটুখানি জায়গা করে নিয়েছে। দুটি বেঞ্চির মাঝখানকার যে স্থানটুকু ট্রেন কর্তৃপক্ষ চলাফেরার জন্য খালি রেখেছেন, সেই জায়গাটুকু বাক্স প্যাটরা পুটলি বিছানা প্রভৃতি বাজ্যের জিনিসপত্র দিয়ে ভরে ফেলা হয়েছে—যাত্রীদের আসনের ব্যবস্থা করবার জন্য।

ট্রেন চলতে শুরু করেছে। এ-ওর গায়ে ছিটকে পড়ে, কিন্তু কারো মুখে নালিশ নেই। এরই মধ্যে কেউ হয়তো সঙ্গীত-চর্চা শুরু করে দেয়; কেউবা বংশের ব্যাখ্যান; কেউ করে স্বামীর পদমর্যাদা কীর্তন, কেউ-বা প্রেম আলাপন। শিশু কাঁদে, মা বকে, স্বামী ফরমায়েশ করে, স্ত্রী ক্ষিপ্তের মতো প্রতিবাদ করে— ট্রেন কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে এগিয়ে চলে। কেউ বিড়ি ফোঁকে, কেউ মোড়ক থেকে খাবার নেব করে খায়, কেউ পাশের লোকটিকে একটু সরে বসতে অনুরোধ করে, কেউ সম্মুখের রমণীটিকে দেখতে থাকে। কেউ-বা জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে পান কেনে, চা খায়।

বিড়ির ধোঁয়ায় আমার মাথা ধরে গিয়েছিল। তার ওপর ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে আমার পা দুটি অবশ হয়ে আসছিল। রানাঘাটে ট্রেন থামতেই প্লাটফর্মের ওপর নেবে পড়লাম। ফিরে গিয়ে আবার জায়গা পাই ভালো, না পাই ঝুলতে ঝুলতেই বাকিটা পথ যাব। মরি আর বাঁচি। এখন একটুখানি খোলা হাওয়ায় না দাঁড়ালে দমটাই বন্ধ হয়ে যাবে।

রাত তখন কটা জানি না। রানাঘাটে বেশ কিছুক্ষণ ট্রেন দাঁড়ায়। প্লাটফর্মের ওপর নেবে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। চারদিকের ব্যস্ততা দেখতে লাগলাম। উজ্জ্বল আলোর নিচে ব্যস্ত যাত্রীদের আনাগোনা। রসগোল্লা আর মিহিদানা মাথায় ছোট ছোট ছেলেদের চিৎকার : টাটকা মিষ্টি বাবু, খেলে পরে ভুলবেন না। চাই বাবু পান বিড়ি চাই। চা—গরম চা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই বিচিত্র শব্দ সমষ্টির সঙ্গীত শুনছিলাম। এমন সময় বইয়ের স্টলটির দিকে চোখ পড়ল।

কালো শাড়ি আর লাল ব্লাউজ পরা সেলিনা! একটা বই নাড়াচাড়া করে দেখছে। এক সময় সেও আমাকে দেখতে পেল। একটুখানি হাসলও। হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকল। আমিও মন্ত্রমুগ্ধের মতো যন্ত্রচালিতের মতো এগিয়ে গেলাম।

আমরা নির্বিবাদে দেখে একটি কোণে এসে দাঁড়ালাম—সেলিনাই আমাকে সেখানে নিয়ে এলো। ট্রেন ছাড়বার আর বেশি দেরি নেই। সেলিনা কোনোরকম ভূমিকা না করে বললো : সেদিন রাত্রের ব্যবহারে তুমি নিশ্চয়ই খু-উব অবাক হয়েছ, তাই না। সেই যেদিন তোমাকে ডেকে এনে ধরিয়ে দিলাম। খুবই অবাক হয়েছ, তাই না? কিন্তু তুমি আমার সম্বন্ধে বড় বেশি

জান। তাই তোমার কথা কেউ যাতে কোনোদিন বিশ্বাস করতে না পারে সেই জন্য আমাকে এই কৌশল করতে হয়েছিল। পারলে আমাকে মাফ করো। আবার দেখা হবে।

তারপরই দ্রুত পদে সে সম্মুখের একটি প্রথম শ্রেণীর কক্ষের দিকে এগিয়ে গেল।

ঢং ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়ল। এখুনি ট্রেন ছাড়বে!

ভিড় ঠেলে আমার কামরার দিকে এগিয়ে এলাম। দরজার হাতল ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম।

পান বিড়ি সিগারেট তখনো ফিরি হচ্ছে, তখনো গরম চা-অলা হেঁকে যাচ্ছে, রাস্তার ও-পাশের চায়ের দোকানে বিকট শব্দে রেকর্ডে গান বাজছে, তখনো যাত্রীরা ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে, গার্ড হুইসিল দিচ্ছে, সবুজ আলো দেখাচ্ছে—আর আমি তখনো ট্রেনের হাতল ধরে প্লাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে আছি।